সুকান্ত বিচিত্রা

বিশ্বনাথ দে
সম্পাদিত

সাহিত্যম্ | ১৮বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
১লা বৈশাখ। ১৩৬৫ ১৪ই এপ্রিল।

প্রকাশক
সাহিত্যম্
নির্মলকুমার সাহা
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ-শিল্পী
প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক-প্রচ্ছদ ও চিত্র মুদ্রণে
ন্যাশনাল হাফটোন কোম্পানী
৬৮, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর
শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ
শ্রীহরি প্রেস
১৩৫এ, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট
কলিকাতা-৭

দাম: ছয় টাকা

উৎসর্গ

দুই বাংলার সুকান্ত-অনুরাগীদের উদ্দেশ্যে-

বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত

'স্মৃতি' পর্যায়ে আমাদের অন্য বই

রবীন্দ্র-বিচিত্রা ৬·০০

বিবেকানন্দ-স্মৃতি ৬·০০

নিবেদিতা-স্মৃতি ৬·০০

শ্রীঅরবিন্দ-স্মৃতি ৬·০০

নজরুল-স্মৃতি ৬·০০

সুভাষ-স্মৃতি ৬·০০

শরৎ-স্মৃতি ৬·০০

মানিক-বিচিত্রা ৬·০০

একটি মহান কর্তব্য পালন প্রসঙ্গে

কলকাতার সবচেয়ে পুরানো রাজপথ দিয়ে ঝর ঝর করে দু'মুখো ট্রাম চলেছে, আর তারই লাগোয়া নতুনবাজারের বারান্দা ঘেরা দু'তলার ঘরে এসে বসেছি আমরা।

এটা ১৯৪৩-৪৪ সালের কথা।

নিচে, দু'পাশের বাসন-কোসন আর সাইনবোর্ড লেখার দোকান পেরিয়ে, পিছন দিকে, বাজারের মধ্যের ছানাপটির ছানার গন্ধ শুঁকতে-শুঁকতে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠে ডানদিকে ঘুরলেই আমাদের এই ঘরটিতে পৌঁছানো যায়। এ ঘরে নতুন যারা আসে, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমেই তাদের চোখে পড়ে সামনের সাদা দেওয়াল-জোড়া রক্তবর্ণ লাল তারাটির দিকে। যে লাল তারার মধ্যে দিয়ে ওপর দিকে ফুঁড়ে বেরিয়েছে এক বজ্রমুঠি কিশোর-হাত। আর তারও ওপরে বেড় দিয়ে গোল করে বড় বড় হরফে লেখা আছে আমাদের 'কিশোর বাহিনী'র আদর্শ-মন্ত্র: শিক্ষা-স্বাস্থ্য-সেবা-স্বাধীনতা।

এমন উজ্জ্বল লাল রঙ দিয়ে সেই দেওয়াল-চিত্রলিপি এঁকেছিলাম আমরা যে, সেদিকে তাকিয়ে আগন্তুককে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াতেই হতো।

এমনি থমকে দাঁড়িয়েছিলেন আমাদের 'কিশোর বাহিনী'র মূল-সংগঠক-পরিচালক সুকান্ত ভট্টাচার্যও, যেদিন প্রথম এসে ঢুকলেন আমাদের এই ঘরে। কিন্তু সে নিতান্তই এক মুহূর্ত। তারপরই একটি সুন্দর প্রসন্ন খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠেছিলো তাঁর অত্যন্ত সাধারণ চেহারাটি।

সেদিন, সেই বিকেলের নরম আলোয় আমার মতো আমাদের বাহিনীর অনেকেই তাঁকে প্রথম দেখলো। যে সুকান্ত ভট্টাচার্য তখন বাংলাদেশের বালক-কিশোরদের চিত্ত-শুদ্ধির কাজে মেতে উঠেছেন, যিনি 'কিশোর বাহিনী'র সংগঠকই শুধু নন, স্বাধীনতার 'কিশোর সভা'-র পরিচালকও—সেই সুকান্ত ভট্টাচার্যর নাম আমরা আমাদের বাহিনী-দপ্তরের বড়দের কাছে এতদিন কেবল শুনেই এসেছি। বড়রা বলতে তখনকার ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির ওই আঞ্চলিক দপ্তরের জনকয়েক কর্মীর কথাই আমি বলছি।

আমাদের বাহিনী-দপ্তরে শুধু বাহিনীর কাজই হতো না, আসলে ওটা ছিলো চিৎপুর-নতুনবাজার অঞ্চলের ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির অফিস। ওই ঘরে কমিউনিস্ট পার্টির কয়েকজন হোলটাইমারও থাকতেন ও রাত্রিবাস করতেন সে সময়ে।

সেদিন খুব বেশিক্ষণ সুকান্ত ছিলেন না। আলমারি খুলে আমাদের বাহিনী-পাঠাগারের বইগুলি দেখলেন। 'নতুন তারা' নামে আমাদের যে হাতে লেখা পত্রিকা ছিলো, তাও দেখলেন বেশ কৌতূহলী হয়ে। ওরই একটি পৃষ্ঠায় চার লাইন স্বরচিত কবিতাও লিখে দিলেন। সামনের বিডন স্কয়ারে—তখন বলতাম কোম্পানীর বাগান—আমরা ড্রিল-ব্যায়াম-খেলাধূলা করি, কিন্তু খুবই সন্তর্পণে; কারণ তখনও বাগান ভর্তি যুদ্ধের সময়কার জিকজ্যাক ট্রেঞ্চগুলো বোজানো হয়নি সব জায়গায়। সুকান্ত আমাদের এইসব অসুবিধার কথা শুনলেন। তারপর আরো দু'চারটে টুকিটাকি কথার পর, বড়দের সঙ্গে, পার্টির কর্মীদের সঙ্গে দু'চারটে কথা বলে চলে গেলেন তিনি।

এরপর আরো কয়েকবার সুকান্ত ভট্টাচার্যর সঙ্গে দেখা হয়েছে। কখনো নতুনবাজারের ওপর তলায় আমাদের 'কিশোর বাহিনী'র ঘরে, কখনো বৌবাজারের মোড়ে 'কিশোর বাহিনী'র কেন্দ্রীয় দপ্তরে, আবার কখনো দুপুর রোদে ট্রামে দু'পয়সার মিড্‌ডে-কনসেশন টিকিটে

এস্‌প্লানেডের মোড়ে এসে, ৮-ঈ, ডেকার্স লেনে 'স্বাধীনতা' অফিসের কাঠের সিঁড়ি পেরিয়ে ওপর তলায় 'কিশোর সভা'র ঘরে।

আমাদের 'কিশোর বাহিনী' পরিচালনা বিষয়ে সুকান্তর নিজের হাতে লেখা, সই করা নির্দেশ-লিপি কয়েকবারই আমাদের দপ্তরে এসেছিলো। কি ধরনের বই আমাদের পাঠাগারে রাখতে হবে, কি ভাবে আলাদা-আলাদা গ্রুপ করে আমরা খেলাধুলা করতে পারি—এই সব বিষয়েই আসতো তাঁর নির্দেশনামা। সেগুলি আজ থাকলে সুকান্ত-চরিত্রের কিশোর-সংগঠকের দিকটির ওপর অনেক নতুন আলোকপাত করা চলতো। কিন্তু ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি যখন বে-আইনি হয় তখন নতুনবাজার পার্টি-অফিস সার্চ করে ওঁদের সমস্ত কাগজপত্রের সঙ্গে পুলিশ আমাদের বাহিনী-দপ্তরের কাগজ-পত্রগুলিও নষ্ট করে দেয়। সুকান্তর হাতে লেখা সই করা নির্দেশনামা-গুলিও ওই সঙ্গে চলে যায়। এমন কি 'নতুন তারা'-র সেই হাতে লেখা পত্রিকার খাতাখানিও আমরা পরে গিয়ে আর ওই ঘরে খুঁজে পাইনি।

১৯৪৬ সালের কুখ্যাত দাঙ্গার পরে শুনলাম সুকান্ত অসুস্থ। আর তার পরের বছরেই জনতার সুকান্ত জনান্তিকে চিরবিদায় নিলেন।

সুকান্তকে সেই ক'বার মাত্র দেখার পর থেকে নানাভাবে তাঁকে জানবার, বোঝবার চেষ্টা আমি করেছি। তাঁর মৃত্যুর পর তেইশ-চব্বিশ বছর কেটে গেছে, এখনও আমার সে জানার বোঝার শেষ হয়নি। এখনও সেই ছেলেবেলার 'কিশোর বাহিনী'র সংগঠককে জানতে ও বুঝতে চাওয়ার অন্ত নেই আমার।

আর আমার সে জানা-বোঝার শরিক আরো অনেককে করে নিতে চাওয়ার জন্যেই এই 'সুকান্ত-বিচিত্রা' সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হলো। তবে বছর আড়াই আগে বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে স্ট্রীটে বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ 'ভারবি'-র ঘরে বসে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়

যদি এ বিষয়ে আমাকে উৎসাহ ও নিজের লেখা প্রকাশ করার অনুমতি না দিতেন, তবে হয়তো এত তাড়াতাড়ি এ কাজে আমি হাত দিতাম না। কিন্তু এটি প্রকাশ করে আজ আমি একটি মহান কর্তব্য পালন করতে পারলাম বলেই মনে করছি।

এই গ্রন্থের অধিকাংশ লেখায়, বিশেষ করে 'স্মৃতি-কথা' পর্যায়ে যে সব লেখা ছাপা হয়েছে, সেগুলিতে সুকান্ত-জীবনের বহু না-জানা কাহিনী, তার সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, জল্পনা-কল্পনার সহজ সুন্দর চিত্রলিপি আঁকা থাকতে দেখা যাবে।
সুকান্তর বৌদি সরযূ দেবী এবং তাঁর তিন দাদা শ্রীরাখাল ভট্টাচার্য, শ্রীমনোমোহন ভট্টাচার্য ও শ্রীমনোজ ভট্টাচার্যর লেখা থেকে জানা যাবে সুকান্ত-জীবনের অনেক ঘরোয়া গল্প। বিশেষ করে সুকান্ত-জীবনের শেষ দিনক'টির ঘটনা শ্রীরাখাল ভট্টাচার্যর লেখায় উন্মোচিত হয়েছে। এ ছাড়া সুকান্তর মাস্টারমশাই বেলেঘাটা দেশবন্ধু হাই স্কুলের শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দেবনাথের রচনায় জানা যাবে সুকান্তর বিদ্যালয় জীবনের অনেক কাহিনী, ওই পর্যায়ে তাঁর দুই সহপাঠী-বন্ধু শ্রীশৈলেন সরকার ও শ্রীমণিগোপাল বসুর লেখা দু'টির কথাও উল্লেখ করতে হয়।

এক সময় সুকান্তর বাবা ও জ্যাঠামশাই যৌথ ভাবে বাস করতেন বেলেঘাটার হরমোহন ঘোষ লেনে, সাম্প্রতিককালের মার্কসবাদী নেতা শ্রী কে. জি. বসু মহাশয়ের বাড়ীর পাশে। ওঁর সঙ্গেও ছিলো সুকান্তর বিশেষ অন্তরঙ্গতা। সেই অন্তরঙ্গতার কাহিনী তিনি অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও আমার সঙ্গে বসে বলেছেন ও লেখায় সাহায্য করেছেন। 'সুকান্ত-বিচিত্রা' প্রসঙ্গে তাঁর কাছে যে উৎসাহ আমি পেয়েছি তা কোনোদিনই ভুলবো না। এ সংকলনে শ্রী কে. জি. বসুর লেখাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই আমি উল্লেখ করছি। তাঁর মা

শ্রীনিভাননী বসু ও পত্নী শ্রীপারুল বসুর লেখা দুটিও এ গ্রন্থে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো তদানীন্তন ছাত্রনেতা ও সুকান্তর 'ফ্রেণ্ড-ফিলোজফার' শ্রীঅন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্যর লেখাটি। অন্নদাশঙ্করের লেখা ছাড়া সুকান্ত বিষয়ক কোনো সংকলন-গ্রন্থ হলে অনেকখানিই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই শ্রীভট্টাচার্যর লেখাটি এই সংকলনের গৌরব যে সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি করেছে, এ কথা আমি বলতে পারি। সুকান্তকে, কবি-কর্মী ও সংগঠক সুকান্ত করে গড়ে তোলার ব্যাপারে এই হাস্যময় বেঁটেখাটো মানুষটির হাতই ছিল সবচেয়ে বেশি। অথচ সবচেয়ে বড় কথা, সবচেয়ে অবাক হবার মতো কথা এই যে, সুকান্তর মৃত্যুর পর এই তেইশ-চব্বিশ বছরের মধ্যে অন্নদাশঙ্কর সুকান্ত বিষয়ে একেবারেই কিছু লেখেননি। এই সংকলনের লেখাটিই তাঁর সুকান্ত-প্রসঙ্গের একমাত্র ও অদ্বিতীয় রচনা, ভবিষ্যতে হয়তো উনি আর এ বিষয়ে লিখবেনও না। আর শুধু উনি কেন? ওপরে যাঁদের নাম উল্লেখ করেছি তাঁদের মধ্যেও কেউ এর আগে আর কোথাও সুকান্ত সম্পর্কে লেখেননি। তখনকার ছাত্র ফেডারেশন ও কমিউনিস্ট পার্টির আরো কয়েকজনের নাম উল্লেখ করতে পারি, যাঁরা সুকান্তর খুব অন্তরঙ্গ থাকা সত্ত্বেও এই সংকলনে লেখার আগে আর কোথাও তাঁর বিষয়ে লেখেননি। এঁদের মধ্যে আছেন: শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশ, শ্রীগৌতম চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনীহার দাশগুপ্ত, শ্রীঅনিলকুমার সিংহ, শ্রীশান্তিময় রায়, শ্রীমোহিত আইচ্, শ্রীহরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। ভবিষ্যতে কবি-সুকান্তর পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখার অনেক উপাদান যে এই সমস্ত রচনা লিখিয়ে এই গ্রন্থে আমি রেখে গেলাম একথা বললে তাই নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হবে না।

[প্রসঙ্গত বলি, সুকান্ত-ভ্রাতা অধ্যাপক শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য প্রথমে শ্রীঅনিলকুমার সিংহ সম্পাদিত 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকায় এবং পরে গ্রন্থকারে 'কবি সুকান্ত' নামে একটি অত্যন্ত তথ্যপূর্ণ ও প্রামাণ্য সুকান্ত-জীবনী রচনা করেছেন। আমার এই 'সুকান্ত-বিচিত্রা'র

প্রচেষ্টার বহু আগেই তিনি, সুকান্ত নিয়ে যে সমস্ত রোমান্টিক গল্প প্রচার হতে শুরু হয়েছিলো তার নিরসন করার কাজে হাত দিয়েছিলেন বলে এই সুযোগে তাঁকে আমি সারা বাঙলার সুকান্ত-অনুরাগীদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।]

'স্মৃতি-কথা' পর্যায়ে আরো যে সমস্ত লেখা আছে তার মধ্যে অধিকাংশই পুনঃমুদ্রিত হয়েছে এবং গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার নাম রচনার শেষে উল্লেখ করা আছে। শ্রদ্ধেয় জনাব মুজফ্ফর আহমদের লেখাটি আমার বেলুড় নিবাসী বন্ধু শ্রীরবি রায়ের 'শলাকা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো, সঠিক তারিখ না জানার জন্যে লেখার শেষে তা উল্লেখ করা যায়নি।

ব্যক্তি-সুকান্তকে জানবো বুঝবো ও আরো অনেককে জানাবো বোঝাবো এই উদ্দেশ্য নিয়ে 'সুকান্ত-বিচিত্রা'র কাজে হাত দিয়েছিলাম দু'বছর আগে। আমার আংশিক সফলতা নিয়ে আজ তা প্রকাশিত হলো। সুকান্তকে খুব কাছে থেকে দেখেছেন, মিশেছেন, এমন অন্ততঃ আরো দশজনের লেখা স্মৃতি-কথা এই সংকলনে দেবার ইচ্ছা আমার ছিলো কিন্তু এ সংস্করণে তা সম্ভব হলো না, পরবর্তী সংস্করণে সে লেখাগুলি দেবার চেষ্টা করবো।

সুকান্ত ভট্টাচার্যর একটি ভালোলাগা কবিতা প্রসঙ্গে বাঙলাদেশের একশোজন নবীন-প্রবীণ কবির ব্যক্তিগত রচনা নিয়ে অন্য একটি সংকলন-গ্রন্থ আমি করছি। সেই গ্রন্থের জন্য সংগৃহীত শ্রীসুশীল রায়, শ্রীজ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীশংকর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশিবশম্ভু পাল, শ্রীআনন্দ বাগচী, শ্রীঅমিতাভ দাশগুপ্ত, শ্রীসামসুল হক এবং শ্রীপবিত্র মুখোপাধ্যায়ের লেখাগুলি 'সুকান্ত-বিচিত্রা'র এই সংস্করণে ছাপা হলো, পরবর্তী সংস্করণে এগুলি এখানে না থেকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত হবে।

'সুকান্ত-বিচিত্রা'র শুরুতে 'কবি কণ্ঠ' পর্যায়ে সুকান্তর উদ্দেশ্যে নিবেদিত কয়েকটি কবিতা ছাপা হয়েছে এবং 'জীবন ও সাহিত্য'

পর্যায়ে দেওয়া হয়েছে তাঁর জীবন ও সাহিত্য প্রসঙ্গে লেখা রচনাগুলি।

মানুষের তৃপ্তির শেষ নেই। এতো নতুন ও তথ্যপূর্ণ লেখা দিয়েও আমার মনে হচ্ছে 'সুকান্ত-বিচিত্রা' ঠিক যেমন করে প্রকাশ করবো ভেবেছিলাম তা যেন হলো না। অত্যন্ত নিষ্ঠা নিয়ে কিছু করতে গেলে এই মনোভাব জাগা অস্বাভাবিক নয়।

'সুকান্ত বিচিত্রা'-র সংকলনের কাজে সবচেয়ে বেশি যিনি আমাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন, তিনি হলেন সুকান্তর অভিন্নহৃদয় বন্ধু কবি শ্রীঅরুণাচল বসু। তিনি নিজের ও তাঁর মা শ্রীসরলা বসুর লেখা দুটি এবং তাঁকে লেখা সুকান্তর একটি চিঠির হাতে লেখা প্রতিলিপি তাঁদের 'কবি-কিশোর সুকান্ত' বই থেকে এই সংকলনে প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছেন। সুকান্তর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত বিশেষ 'সুকান্ত সংখ্যা স্বাধীনতা' থেকে কয়েকটি লেখা নেওয়া হয়েছে। সেদিনের 'স্বাধীনতা'টিও পেয়েছি শ্রীঅরুণাচল বসুর সৌজন্যে। তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সুকান্তর অগ্রজ শ্রীমনোমোহন ভট্টাচার্যকে, যাঁর সৌজন্যে শ্রী কে. জি. বসু ও তাঁর পরিবারের লেখাগুলি আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি। সুকান্তর বাল্যকালের চিত্র ও তাঁদের পরিবারের গ্রুপ ফটোটি শ্রীভট্টাচার্যই আমাদের ছাপবার জন্য দিয়েছেন।
আরো সহযোগিতা করেছেন বেলুড়ের 'শলাকা' পত্রিকায় সম্পাদক শ্রীরবি রায় ও আমার সাহিত্যরসিক বন্ধু শ্রীসুবোধ রায়—ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে যাওয়ার সময় একাধিক দিন যিনি আমাকে সঙ্গদান করেছেন ও দু'একটি পুরানো লেখার হদিস বলে দিয়েছেন।

আমাদের ছেলেমেয়েরা আজ বড় হচ্ছে, বাড়ীর সামনে পার্কে ওরা খেলাধূলা করে, অনেক সময় করে না। ওদের দিকে তাকাই আর ভাবি, ওদের জন্যে একটা ভালো সংগঠন নেই আমাদের দেশে। যেমন আমাদের সময় ছিলো আমাদের 'কিশোর বাহিনী'। সুকান্ত 'কিশোর বাহিনী' গড়েছিলেন আমাদের জন্যে, তখনকার ছোটদের জন্যে, তিনি আজ নেই। কিন্তু আর একবার কি এখনকার ছোটদের জন্যে, আমাদের ছেলে-মেয়েদের জন্যে 'কিশোর বাহিনী' গড়ে তোলা যায় না? সুকান্ত না থাক, সুকান্তকে যিনি গড়েছিলেন সেই অন্নদাশঙ্কর তো আছেন।

এটি, আমি একটি প্রস্তাব রাখলাম সবিনয়ে।

বিশ্বনাথ দে

প্রসঙ্গত

'সুকান্ত বিচিত্রা-র দ্বিতীয় মুদ্রণ বেরুলো। কিন্তু অত্যন্ত দ্রুত ছাপা হওয়ার জন্য কিছু পরিবর্তন-পরিবর্ধন সম্ভব হলো না। এমন কি, আমার কবি ও সাহিত্যরসিক বন্ধু শ্রীসুবোধ রায় রচিত 'কিশোর সভার সুকান্ত' নামের মূল্যবান রচনাটি হাতে আসা সত্ত্বেও দেওয়া গেলো না, পরবর্তী সংস্করণে এটি দেখতে পাওয়া যাবে।

বিশ্বনাথ দে

সূচীপত্র

কবি-কণ্ঠ ঃ

স্মৃতি-কথা ঃ

জীবন ও সাহিত্য :

আমরা চাঁদা তুলে মারব সব কীট।
কবি ছাড়া আমাদের জয় বৃথা।
বুলেটের রক্তিম পঞ্চমে কে চিরবে
ঘাতকের মিথ্যা আকাশ?
কে গাইবে জয়গান?
বসন্তে কোকিল কেশে কেশে রক্ত তুলবে
সে কিসের বসন্ত!

—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

কি ভেবেছিল সুকান্ত?

অরুণ মিত্র

মৃত্যুর আগের দিন পড়ন্ত রোদের দিকে তাকিয়ে কি ভেবেছিল সুকান্ত? যে ছোট্ট বুকটা আর ছোট্ট মাথাটা অনবরত কবিতায় উথলে উঠত তাদের নিঃশব্দ শেষ ডাক শুনতে পাওয়া গেল না। আমি নিশ্চিত জানি, তা একদিন হঠাৎ চীৎকার করে উঠবে। যাদবপুর হাসপাতালের মাঠ বাড়ী পুকুর তার আওয়াজে গমগম করতে থাকবে। ভালোবাসার, আশার, নৈরাশ্যের, মৃত্যুর, আরোগ্যের, সংগ্রামের সেই তীব্র হারানো ভাষা যাদবপুরের রোগীদের বিছানা ছাড়িয়ে আমাদের সকলের ঘরে এসে তোলপাড় বাধিয়ে দেবে। কিন্তু ততদিন আমার মাঝে মাঝে মনে হবে, মৃত্যুর আগের দিন পড়ন্ত রোদের দিকে তাকিয়ে কি ভেবেছিল আমাদের সুকান্ত? রোদের একটা ঝলক যদি সুকান্তর অন্ধকার অন্ত্র আর ফুসফুসের মধ্যে ঢুকতে পারত!

কিশোর কবি — কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সর্বদা শঙ্কিত মন, ক্ষুদ্র স্বার্থ আস্ফালন করে,
কুণ্ডলী পাকানো সাপ ফণা তুলে প্রতি ঘরে-ঘরে।
মানুষের মনে নেই, কৃষ্ণচূড়া স্মরণ জাগায় ;
রক্তাক্ত শাণিত ছুরি ছিন্নভিন্ন করে জনতায়।

হঠাৎ খবর পাই, কোলাহল স্তব্ধ হয়ে আসে,
বৈশাখের দগ্ধ দিন কাঁপে যেন উত্তপ্ত বাতাসে।
যাদবপুরের মাঠে শিরিষের ছায়া দীর্ঘ হয়
বেলা পড়ে আসে, দেখি মেঘ আনে পরম বিস্ময়।

আজকে দাঙ্গার নীতি, কীটজীর্ণ বিবর্ণ জীবন,
কিশোর কবির মৃত্যু, দীর্ঘশ্বাসে ভরা প্রতিক্ষণ।
ক্লান্তি আর অবসাদ অন্ধকারে ঘোরে চতুর্দিকে
জীবন যৌবন সব রঙহীন অবাস্তব ফিকে।

অকস্মাৎ মনে হয় মেঘে মিশে নবধারাজলে
তোমার চিতার ছাই রাশি রাশি সোনার ফসলে
ঝরবে বাংলার ক্ষেতে, মজুরের কৃষকের গানে
আবার বাঁচবে তুমি এ-মাটির উদ্দাম আহ্বানে।

সুকান্ত-কে

মণীন্দ্র রায়

দেহ, তো, সবাই জানে,
কালের আহার ;
সময় চিবোয় নিত্য
মেদমজ্জা যতো উপচার।

কিন্তু কেউ কেউ থাকে
খায় যে সময় ;
কালের গরল বুকে
চিরায়ু সে, স্মৃতির সঞ্চয়।

তেমনি, সুকান্ত, তুমি
আমাদেরও ঘরে
চোখের আড়ালে চোখ,
স্পর্ধা তুমি মৃত্যুর শিয়রে

সুকান্ত

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সুকান্ত! তোমার গলা দিয়ে
রক্ত উঠতো। বুকের পাঁজর
মনে হ'তো ভেঙ্গে যাচ্ছে। গায়ে
দিনরাত লেগে থাকতো জ্বর,
নির্মম যক্ষ্মার মার। তবু
কোনোদিন তুমি অপ্রেমের,
ঈর্ষার জ্বালায় অচেতন
প্রলাপ বকো নি। আদর্শের
স্বপ্ন, সাধ, বিশ্বাস তোমাকে
প্রচণ্ড অসুখে নিরাময়
মনুষ্যত্ব দিয়েছিলো। তাই
মৃত্যুর হিংসা-কে তুমি জয়
করেছো কবিতা দিয়ে। তার
কথাগুলি আজো ঘুরে ফিরে
জীবনের জিজ্ঞাসা জ্বালায়
অন্ধ, খোজা, চোরের তিমিরে॥

সুকান্ত স্মরণে

হেমাঙ্গ বিশ্বাস

এ জীবনে দেখিলাম ভগ্নডানা কতো ভ্রষ্টনীড়
পালক-কোমল বুক বিঁধে গেলো কতো বিষতীর
মৃত্যুকীট কেটে খেলো তপ্তাজা কতো ফুসফুস্
সয়ে গেছি ক্ষয়ক্ষতি করিনিতো ব্যর্থ আপসোস।
তবু যদি দুর্বিসহ দুঃখভারে নুয়ে গেছে মাথা
ন্যুব্জ-দেহ ঋজু করে দিয়ে গেছে তোমার কবিতা।

কিন্তু কবি তুমি নেই মানবতার এ দুর্বিপাক
আজ তা কেমনে সই পাঞ্চজন্য নিজে স্তব্ধবাক।
অগ্নিঝড়ে দগ্ধপ্রাণ-বিহঙ্গম কিশোর শহীদ
আজিকার সৃষ্টিযজ্ঞে করে গেলে নিজেরে সমিধ।
নতুনের নচিকেতা মৃত্যুলোকে জীবন সাধনা
শীতের সুমেরু দেশে করে গেছ সূর্যের বন্দনা,
গোষ্পদের মীনে তুমি শুনায়েছ সাগর-কল্লোল
অঙ্কুরিত বীজে জাগায়েছ বনস্পতির হিল্লোল।
স্মৃতিস্তম্ভ গড়িব না, প্রহসন 'স্মৃতির ভাণ্ডার'
অর্থগৃধ্নু সমাজের তুমি নও কবি গীতিকার,
তুমি বেঁচে রবে নিত্য মাঠে মাঠে সোনালী ফসলে
তোমার স্মৃতির হাওয়া দিবে দোলা জীবনের পালে;
বেঁচে রবে চিরদিন জনতার জয়-কলরবে
প্রত্যাসন্ন প্রভাতের রৌদ্রোজ্জ্বল নবান্ন উৎসবে,
আগন্তুক কিশোরের স্বপ্নচোখে আঁকা তব ছবি
বুকে বেঁধে নেবে সূর্য-স্বয়ম্বরা আগামী পৃথিবী।

সুকান্ত-কে

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ঘুমন্ত এই প্রান্তরে কেউ গান
শোনায়নি, তাই বিষণ্ণ নিঃঝুম
সবাই যেন ঘুমিয়েছিলাম ; ঘুম
ভাঙলে তুমি গানের ঢেউয়ে প্রাণ
ছড়িয়ে দিয়ে। আমরা সবাই শোক
ভুলতে গিয়ে ঘুমিয়েছিলাম ; আজ
চোখের থেকে ঘুমের সে নির্মোক
খসিয়ে দিলে সুকান্ত ভট্‌চায।

ঘুমন্ত এই রাত্রে আলোর টিপ
পরিয়ে, গানের দুরন্ত রোশনাই
সবার প্রাণে ছড়িয়ে কিশোর-ভাই
তুমিই আছো ঘুমিয়ে, বুঝি আজ
নিজের প্রদীপ নিবিয়ে কোটি দীপ
জ্বালিয়ে গেলে সুকান্ত ভট্‌চায।

সুকান্তকে : কবিকে সাথীকে

সিদ্ধেশ্বর সেন

যে তীব্রতায় জ্বলে উঠেছিলে তুমি সুকান্ত,
সে তীব্রতা আমারো,
যে প্রতিজ্ঞায় আজো বাঁচো তুমি, সুকান্ত,
সে প্রতিজ্ঞা আমারো,
সুকান্ত, আমাকে তোমার সাথী করো।

আমি শীতে কুঁকড়ানো মা-বাপ হারানো ছেলে,
সাঁৎসেঁতে ঘরে একা রাত জাগি
সূর্যকে তবু ছিনিয়ে আনবো বলে ;
সুকান্ত আমাকে তুমি পথ বলো।
সুকান্ত, তোমাকে আমি ভালোবাসি ;
আমি ক্ষেত খোয়ানো মন্বন্তরে মরা নিরন্ন এক চাষী,
তবু ধান কাটার রোমাঞ্চকর দিনগুলির
প্রতীক্ষা নিয়ে থাকি।

সুকান্ত তুমি আমার সাথে চলো।
সুকান্ত আমাকে তুমি গান শোনাও।
আমি চটকলের লোহাকলের ধর্মঘটী ভাই,
ভুখা আছি, তবু উঁচু মাথা না নোয়াই,
শত্রুকে চিনেছি ঠিক ;
তুমি শুধু হেঁকে বলো,
সুকান্ত, তুমি আমার আগে দাঁড়াও।

আমি এক কবি আছি শহরে ও গ্রামে ;
আমার চোখে তোমার সেই খবর পরী নামে,
আমি দিকে দিকে শুনি দৃঢ় পদধ্বনি,
আমি তোমার মতো করে প্রতি প্রহর গনি
সুকান্ত, তুমি আমার হাত ধরো।

যে তীব্রতায় জ্বলে উঠেছিলে তুমি সুকান্ত,
সে তীব্রতা আমারো,
যে প্রতিজ্ঞায় আজো বাঁচো তুমি, সুকান্ত,
সে প্রতিজ্ঞা আমারো,
সুকান্ত, আমাকে তোমার সাথী করো।

যাই।
সূর্যঝরা আকাশ যদি, চোখে অগাধ অন্ধকার
যাই।
আলোয় আলো দিন পিছনে, গান রহিলো, গান।

সেই যে গান রইলো গান রইলো, গান
মাটির শুনে শুনেই কান মজেছে গান পেয়েছি, গান
মাটিরই, সেই ব্যাকুল এলোমেলো শিকড়ে অন্ধকার
কঠিন টান
গুঁড়িতে উঁকিঝুঁকি লতায় পাতায় পাতাবাহারে ঘোর
সবুজ টান
টান গোলাপে লাল রজনীগন্ধা টানে শাদায় শুধু
সবুজ সুর শিরায়, সুর
শিখায়, সুর ঝিরঝিরিয়ে বন্যা রস বন্ধহীন
টান মাটির টান : সেই তো গান।

আমার গান।
জন্মেছিলো ঝড়, ঝড়ের
ঝন্‌ঝন্‌ এই গান গভীর
বাজ বাজলো মাদল ঢেউ রুদ্র ঢেউ তুললো বুক
টললো যুগ অহল্যার ঘুম টললো
ভাঙলো বাঁধ

ভাসলো দিকচিহ্নহীন জলে জীর্ণ সময়, বাসি
সময় শেষ
পচা পাতায়,
পায়ের নিচে তবু মাটির চাপ দু'পায়ে-মাটিকে ধরা
মাটিতে ধরা
পায়ের নিচে তবু ঘাসের শিষ কি শিখা,
শিরশিরিয়ে
শরীরে সেই আগুন—সুর
ঘনায় গান ঘনায়
গান মাটির গান মাটিরই মাজা
উঠোনে বাঁধা বেড়ায় ঘেরা
দাওয়ায় তকতকে নিকনো
মাটির গান মনের গান মনের ঘর বাঁধার।

যাই।
যদিও ঘর গড়ার কাজে হাত লাগানো
বাঁধ বাঁধানো
বুকে, বুকের ভিত্ গাঁথার গান
ধরেছি সবে সমেই, কথাগাঁথা হৃদয়ে টান
ধরেছে সবে মাটির, মাঠমাতানো এই ধান
সবে সবুজ-হলুদ, হায় সবে শুনেছি গান
মাটির—ধরা মাটিতে তবু যেতেই হ'লো
যাই।

যখন অনেক রাত

রাম বসু

যখন অনেক রাত হিম হিম হৃদয় শরীর
রুদ্ধ মনে ক্ষুব্ধ শ্বাস স্বপ্নের বিদ্রোহ নেই, শান্তি নেই
শাপগ্রস্ত মাঠে গ্রহণের ঘরে, মৃত্যুভয়ে মরে
আমার পদ্মার চর, সোনামুখী ধানী নদী
উদ্‌গ্রীব বোবা-ব্যর্থ ডাকে ; ঘরছাড়া চলে যায়
নিজের খেতের পাশ দিয়ে বাপের ভিটের পাশ দিয়ে
অন্ধকারে ডুবে যায় অভাগার শুকনো সাগরে।

তখন তন্ময় শুনি হে মহামানব একবার ফিরে চাও
কাকচক্ষু দীঘি-জলে ঘরে মনে আকাশে ফসলে, ফিরে চাও।

যখন অনেক রাত ভয় লাগে ঘরে ফিরে যেতে
ছায়ারা প্রহার করে নৈমিত্তিক আত্মবলিদান
বিমর্ষ বিবর্ণ ক্লান্ত আরম্ভের আশ্চর্য সকাল
হত্যার রক্তের স্রোতে, শিশুর কান্নার স্রোতে মুহ্যমান

তখন বিপুল আশা মায়ের বাহুর মত ব্যগ্র ঘিরে ধরে
প্রার্থীর আকাশ, তখন কামনা শঙ্খচূড় শিখা হয়ে
জ্বলে দূর দূরান্তরে, জনতার প্রাণে জ্বলে, জ্বলে মন্ত্রমুগ্ধ
ঐক্যধারে

যখন অনেক রাত ঘুম নেই দেহমন মাটির আবেগে

একটা প্রশ্নের মত একটা গানের মত প্রতিদ্বন্দ্বী বজ্র হয়ে
জ্বলে
অহর্নিশ বিদীর্ণ জীবনে অন্তহীন অরাজক ঘৃণার গভীরে
কারাগার এই দেশে রৌদ্র ঝড়ে রুদ্র ক্রোধে ক্ষোভে
অক্ষৌহিনী দৃঢ় জ্বলে কান্নার গহ্বর থেকে পরিখার পাড়ে
তখন একটা ভূমিষ্ঠের প্রকাশের তীব্র অধিকার
আমাকে সতর্ক করে পূর্ণ কর দৃঢ় অঙ্গীকার।

কোন লোকান্তরিত কবি-কে

কৃষ্ণ ধর

আজকে তোমার নামে
আমি এক অখ্যাতের কবি
নিরন্ন কলমে আঁকি ফসলের ভাবি প্রতিচ্ছবি।

শোষণের রক্তমেঘ
দিগন্তেতে হয়েছে যে জড়ো,
আমার লেখনী তাই প্রতিবাদে থরো থরো।
বিবর্ণ আকাশে
জমে অন্যায়ের ক্রুর আঁধিয়ার
প্রতিরোধে তুলে ধরি আমার কলম হাতিয়ার।

ভুলিনি এখনো বন্ধু
তোমার সে নবজাতক
যাহার প্রতিষ্ঠা লাগি পৃথিবীকে সূর্য-স্নাতক
করিতেছি আমি কবি :
নিয়ে এসো হে কবি কিশোর,
বিদ্রোহীর ছাড়পত্র : সীমান্তের স্বপ্ন-বিভোর
সৈনিকের অগ্রযাত্রা,
আগামীর দৃপ্ত পদধ্বনি ;
নতুন পৃথিবী লাগি প্রতীক্ষায় আমি কাল গুনি

জনগণেশের বুকে
প্রত্যাঘাত আসে কণ্ঠরোধ
স্থবিরের ক্ষীণহস্তে। শিবিরেতে তারি অবরোধ
গড়ে তোলে সহস্র যৌবন।

তুলে ধরে যাত্রীর মশাল
নিরন্ধ্র রাত্রির বুকে : বন্যা আনে দুরন্ত সকাল
সূর্য-দীপ্ত নতুন প্রাণের।

অগ্নি-গর্ভ পৃথিবীতে বসে
আমি তারি গান গাই। মৃত্যুঞ্জয়ী আমার এ দেশে
আসিবে পীড়ন-বন্যা
কুচক্রীর আঘাত শাসন :
আমরা নির্বাক হয়ে শোষণেরে সহিনা কখন।

হে বন্ধু, একথা জেনো,
অন্যায়েরে করে না সেলাম
প্রতিবাদী যে কলমে তোমার কবিতা লিখিলাম॥

চন্দ্রো

বুধাখালি

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

(সুকান্ত-কে)

সুকান্ত, আমারো চোখে ঘুম নেই আজ
কাকদ্বীপে কান্না শুনি নবজাতকের :
পিশাচেরা কেড়ে নেয় মুঠি মুঠি ধান—
বুলেটে হয়েছে বিদ্ধ তাজা তাজা প্রাণ
মাটি হয়ে ওঠে লাল রক্তে রক্তে মৃত শহীদের
সেখানে হাজারো তুমি, কার্তিক-শিশির-ভরদ্বাজ।

জমাট বিক্ষোভ ওঠে মনে মনে জেগে
লাখো লাখো ধমনীতে—শিরায় শিরায়
বড়া ও কমলাপুরে, চন্দনপিঁড়ির বুকে
বিপ্লবী জনতা ওঠে রুখে।
উজ্জীবিত অগ্নিমন্ত্রে শপথ ছড়ায়
কতো তীব্র বিস্ফোরণ ধ্বনি তোলে বজ্রগর্ভ মেঘে।
কোটি কোটি হাতে আজ মুক্তি সংগ্রামের আলো জ্বালি
আমাদের ক্রান্তিপথে অক্লান্ত সৈনিক তেলেঙ্গানা।
সন্তানের রক্ত দেখে কাকদ্বীপে মা-বোনেরা কাঁদে
আবার তাদের চোখে সুষুপ্ত আগামী বাঁধে দানা
স্বেচ্ছাচারীতার প্রতিবাদে
বুক বাঁধে ক্ষুব্ধ বুধাখালি॥

সনেট ও তিনটি লাইন

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

(সুকান্ত ভট্টাচার্য-কে নিবেদিত)

বন্ধুগণ, কিছু লেখা স্বাভাবিক লিখুন আপনারা
অন্তত সামান্য কিছু রচনায় মানুষ আসুক।
কেবল বিকৃত বাঁকা ঘুণে-ধরা ব্যক্তির চেহারা
সেটাই কি মৌলিক অর্থে সামাজিক মানুষের মুখ ?
অথবা লাগাম-ছেঁড়া সাময়িক ভাষার ফোয়ারা
ফোটালে বিপ্লব হয় ? ধরা যায় আসল অসুখ ?
মদের সমুদ্রে এ তো খুঁজে পাওয়া শৌখিন সাহারা।
এ যেন আদুরে রাগ, হাতে নিয়ে ফুলের চাবুক।

ইচ্ছা হয়, ক'টি সৎ কবি লেখকের নাম করি
(সাম্প্রতিক সাহিত্যকবিতা আর পড়ি বা না পড়ি
কানে আসে এরা সব মালিকানাশর্তের খাতিরে
যথেষ্ট দায়িত্বহীন)—মানিক, জীবনানন্দ দাশ
আজ নেই, বাকী যাঁরা—ম্রিয়মান নিজেরই গভীরে,
অথচ এ-ক'টি নাম বাঙলার উজ্জ্বল ইতিহাস।

সমস্ত সমাজে কাঁপে যুদ্ধরত মানুষের, মাঠের নিঃশ্বাস
বন্ধুগণ সাড়া দিন, এখনো আসুন এই উদ্বেল তিমিরে।

সুকান্ত আপনার কথা, আপনার সেই কলমের কথা মনে পড়ে

সুকান্তর চেহারায় বৈশিষ্ট্য ছিলো, ব্যঞ্জনা ছিলো, কবিজনোচিত বলতে যা মনে আসে সে জলুস ছিলো না। নিভৃত নিরাপদ আশ্রয়ের নিশ্চিন্ত আরাম কৈশোরের লাবণ্য মসৃণ মোলায়েম করে তোলেনি, জীবনযুদ্ধের সৈনিকোচিত রুক্ষশ্রী এসে মিশেছিলো।

লাজুক মুখচোরা বলে সে পরিচিত ছিলো, আমি তার ভেতরের হলকা মাঝে মাঝে অনুভব করতাম তার শান্ত স্বল্প কথায়, তার কবিতায়।

সুকান্তর কবিতার সহজ সরলতা অনেককে আশ্চর্য ও মুগ্ধ করেছে, সেই সরলতার সমগ্র তাৎপর্য সকলের কাছে ধরা পড়েছিলো কিনা জানি না।

জীবনে যেমন, কাব্য-সাহিত্যেও সরলতা বিশেষণটিতে রিক্ততার ইঙ্গিতটাই আমাদের কাছে বড় বেশী জোরালো। গভীরতা, ব্যপ্তি, তীব্রতা, ভাবৈশ্বর্য ইত্যাদি সবকিছুর ধারক ও বাহক হিসাবে সাদামাটা স্পষ্টভাষী সার্থক কবিতা কল্পনা করতে আমরা অপটু ছিলাম, আমাদের অভিজ্ঞতা ও স্বীকৃতি গীতি-কবিতা পর্যন্ত। সুকান্তর কবিতায় তাই বাংলা কাব্য-সাহিত্যের নবজন্মের সূচনা ছিলো।

রবীন্দ্রোত্তর বৈপ্লবিক ভাবধারাকে সমসাময়িক করে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারেন নি, নতুন চেতনা যাদের স্মৃতির প্রেরণা তাঁরাও খুঁজে পান নি আত্মপ্রকাশের পথ ও পদ্ধতি। বাংলা গদ্য-সাহিত্যের অগ্রগতির সঙ্গে পিছিয়ে পড়া কাব্য-সাহিত্যের মন্থরগতি মিলিয়ে দেখলে, আন্তরিক পরীক্ষা গবেষণাদির সীমার বহু বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে মৌলিক কবিতার দৈন্য বিচার করলে আমরা এক শোচনীয় সিদ্ধান্তে

আসি, কিশোর কবি সুকান্তের অকালমৃত্যু যার মর্মান্তিক বাস্তব পরিচয়। কাব্য-সাহিত্যে নতুন যুগকে প্রাণ দিতে আজ কবির যে অভিজ্ঞতা ও সাধনা দরকার তার পুরস্কার মৃত্যু, সুকান্ত এই ভয়ানক সত্য ও কাব্য-সাহিত্যের চরম সাফল্যকে, আমাদের সমস্যাকে স্পষ্ট করে দিয়ে গেছে।

প্রতিভার অকালমৃত্যু বাংলায় বা জগতে এই প্রথম নয়, কিন্তু গত যুগেও কবির পক্ষে সমাজের সঙ্গে বেঁচে থাকার মতো একটা আপোষ করা সম্ভব ছিল যা তার কাব্য-সাধনাকে ব্যাহত করতো না। যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আজ কবির পক্ষে অপরিহার্য, তখন তা পরোক্ষ হলেও চলতো।

আজ সেটুকু আপোষের সুযোগও শেষ হয়ে গেছে কবির পক্ষে। কোনো জীবিকার জন্য প্রস্তুতি তার নিজেকে অপচয় করা, কোনো জীবিকা গ্রহণ তার কাব্য-সাধনার সুনিশ্চিত ব্যর্থতা।

শৈশব থেকেই কবি প্রতিভা আজ এই সঙ্কটের সম্মুখীন, চাষী মজুর বা ভদ্রঘরে যেখানেই তার আবির্ভাব হোক, মানুষের বাঁচার ব্যবস্থা এমনি দেশে যে কোনো মতে বেঁচে থাকার উপায়টুকু আয়ত্ত করতে গেলেও অন্তর্দৃষ্টিকে ঝাপসা হয়ে যেতে দিতে হবে।

গদ্য-সাহিত্যের সাধকও যে এ অভিশাপ থেকে একেবারে মুক্ত তা নয়, কিন্তু কবির সঙ্গে তুলনায় সে অনেক ভাগ্যবান। গদ্য-সাহিত্যের যেটুকু উর্বরতা দেখি, সাহিত্য-বিচারকের আসনে বসে এই নতুন প্রাণ সঞ্চারের মতো জটিল ও পরোক্ষ কারণই আবিষ্কার করি, মূল কারণ ওই। কাব্য-সাহিত্যের অনুর্বরতাও এই জন্য যে কবিতা লেখার মজুরীতে কবি বাঁচে না। নতুন যুগের অলঙ্ঘ্য নির্দেশে তাকে আজ দেহমনে চব্বিশ ঘণ্টার সাহচার্য বরণ করে নিতে হয় তার যে উলঙ্গ ছেলেরা আজ বুলেট খেয়ে মরছে তাদের, কাব্যচর্চা আর জীবিকাচর্চার শোষণে সে ক্ষয় হয়ে যায়। নয়তো বাধ্য হয় আপোষ করে নিজেকে গুটিয়ে এনে সীমাবদ্ধ জীবনের কল্পনা দিয়ে নতুন যুগের

পরীক্ষামূলক কবিতা রচনা করতে। কতো সস্তায় মেলে কবির প্রাণ, যে প্রাণ কিনবার ক্ষমতাটুকুও কাব্যলক্ষ্মীর নেই।

সুকান্ত তা মানতে চায়নি, আপোষ করেনি।

সে বুঝি টের পেয়েছিলো চলতি অবস্থা অব্যবস্থা উলটে দিতে কবিরও শহীদ হবার প্রয়োজন আছে।

ছোট গল্পে ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে তরুণ লেখককে প্রশংসা করেছি, উৎসাহ দিয়েছি; সুকান্তকে কবিতার প্রশংসা শোনানোর সম্পর্কে সতর্ক ছিলাম। কাব্য সমালোচনার সঠিক পদ্ধতি আমার জানা নেই, বিচার বিশ্লেষণ বাদ দিয়ে খানিকটা হাওয়ার তারিফ শোনাতে ইচ্ছা হতো না। তা ছাড়া, নিজে থেকে সে যে কঠিন্ সংগ্রাম গ্রহণ করেছিলো, যে বিস্ময়কর দ্রুততার সঙ্গে বিকাশলাভ করছিল তার প্রতিভা, তাতে তাকে উৎসাহ দেবার প্রয়োজনও ছিলো না কিছুমাত্র। বরং স্বীকার করি যে একটু আশঙ্কা আমার ছিলো তার সম্পর্কে; বয়স তার কম, বড় তাড়াতাড়ি তার খ্যাতি বাড়ছিল, এতে তার ক্ষতি না হয়। কে জানতো, তার লেখনীই এমন হঠাৎ চিরতরে থেমে যাবে।

আজ আপশোষ করছি, তার ক্ষতির মিথ্যা আশঙ্কায় প্রাণ খুলে তার প্রতিভাকে অভিনন্দন জানাইনি, যক্ষ্মা হয়ে সে হাসপাতালে গেছে খবর পাওয়া পর্যন্ত আমার এ বিশ্বাস ঘোষণা করা স্থগিত রেখেছিলাম বলে যে, "বাঁচা গেলো, কবিও পেয়ে গেছে নতুন যুগ।"

'স্বাধীনতা'কে সুকান্ত বড় ভালোবাসতো। সুকান্ত কবি ছিলো তাদের, 'স্বাধীনতা' যাদের কাগজ। 'পরিচয়ে' সুকান্তর কবিতা সাগ্রহে ছাপা হতো। সুকান্তকে স্মরণ করে আমি 'স্বাধীনতা'র আর্থিক স্বচ্ছলতা যতোদিন না হবে ততোদিন 'পরিচয়ে' লেখার জন্য যা মজুরি পাই 'স্বাধীনতা' তহবিলে জমা দেবো।

স্বাধীনতা। ১৮ই মে ১৯৪৭

নিজেকে ক্ষমা করিনি — মুজফ্‌ফর আহমদ

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের সেদিন চল্লিশ বছরের জন্ম-বার্ষিকী হয়ে গেল। বিশ বছর আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

বিশ বছরেরও অনেক আগে কবি নজরুল ইসলাম বোবা হয়ে গিয়েছিলেন। কবি সুকান্ত ছিলেন আমাদের আশা ও ভরসার স্থল। তাঁকেও আমরা হারালাম।

তখন ডেকার্স লেনে কমিউনিস্ট পার্টির অফিস।

একদিন দেখলাম, দোতলা হতে সুকান্ত নামতে যাচ্ছেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'খবর কি?'

বললেন, 'স্বাধীনতায় একটা কিশোরদের বিভাগ খুলতে যাচ্ছি।'

তারপর সুকান্তকে আর দেখতে পাচ্ছিলাম না। মাঝে মাঝে মনে প্রশ্ন জাগে—কোথায় গেলেন সুকান্ত? কিন্তু কাউকে জিজ্ঞাসা করতে ভুলে যাই।

এভাবে ক'মাস যে কেটে গিয়েছিল তা এখন আমার মনে নেই।

একদিন ঢাকার শামসুদ্দীন আহমদ আমার বাসায় এলেন।

বললেন, 'আমি সুকান্ত ভট্টাচার্যের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। দেখলাম সে যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হয়েছে। আমার পকেটে পাঁচটি টাকা ছিল। তাই আমি তাঁকে দিয়ে এসেছি।'

আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। একি অঘটন ঘটে গেল! আমি কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা। কমিউনিস্ট পার্টির বৃদ্ধ লোক আমি। আমার বয়স তখন ৫৭ বছর। ঢাকা হতে শামসুদ্দীন আহমদ এসে কিনা আমাকে সুকান্তের অসুখের খবর দিলেন!

ভাবলাম আমার এই যে বিচ্যুতি হয়েছে তার জন্যে আমি নিজেকে কি ক্ষমা করতে পারব কোনদিন? আমি কেন সুকান্তের খোঁজ নিলাম না।

ত্রুটি আমার যাই হোক না কেন, এখন চিকিৎসা করানোই হচ্ছে আসল কথা। আমি কমরেড সুনীলকুমার বসুকে অনুরোধ জানালাম যে, এ ব্যবস্থাটি তাঁকেই করতে হবে। তিনি অভিজ্ঞ ব্যক্তি। এক সময়ে নিজে টি. বি. রোগী ছিলেন। কবি সুকান্তের যক্ষ্মা রোগ হয়েছে শুনে তিনি আগ্রহ সহকারে এ কাজে এগিয়ে গেলেন। তখন খুব তাড়াতাড়ি এক সঙ্গে অনেক ব্যবস্থা হয়ে গেল।

সুকান্তের জ্যেঠতুত দাদা শ্রীরাখাল ভট্টাচার্য এসে সুকান্তকে পূর্ব কলকাতা হতে শ্যামবাজারে তাঁর নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। ডক্টর তাপসকুমার বসু এম. ডি. দয়া করে চিকিৎসার ভার নিলেন। অল্প চেষ্টায় যাদবপুর টিউবারকিউলোসিস্ হস্‌পিটালে ক্যাবিনও পাওয়া গেল। সেখানেই ভর্তি করানো হলো সুকান্তকে।

হস্‌পিটালে যাওয়ার পরে অসুখটা ভালোর দিকে না গিয়ে বাড়াবাড়ি রূপ নিল। রোগ বহু দূর এগিয়ে গিয়েছিল। আজ-কালকার মতো ঔষধও আবিষ্কার হয়নি তখনকার দিনে।

বাড়াবাড়ি অসুখের খবর পেয়ে আমরা একদিন সকাল বেলাতেই হস্‌পিটালে গেলাম। সঙ্গে ছিলেন শ্রীরাখাল ভট্টাচার্য। তিনি খুব দ্রুত হেঁটে গিয়ে আমাদের আগেই সুকান্তের ক্যাবিনে ঢুকলেন। আমরা ক্যাবিনে প্রবেশ করে দেখলাম কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য আর নেই।

তাঁকে হস্‌পিটালে নিয়ে যাওয়ার সময়ে তাঁর গাড়ী ডেকার্স লেনের ভিতর দিয়ে গিয়েছিল। আমরা গেটে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। সুকান্ত অনেকক্ষণ আমার হাত চেপে ধরে থাকলেন। হয়তো তিনি ভেবেছিলেন আর যদি দেখা না হয়।

আমার অনুশোচনার আর শেষ নেই। কেন আমি আগে খবর পেলাম না? কেন ঢাকা হতে এসে শামসুদ্দীন আহমদকে আমায় সুকান্তের অসুখের খবর দিতে হলো!

এই জন্যে আমি কখনও নিজেকে ক্ষমা করিনি।

বন্ধুমহলে নাম শুনেছিলুম আগেই ; চোখে দেখলুম লেক-লগ্ন একটি ক্লাবের বাইশে শ্রাবণের অনুষ্ঠানে। উজ্জ্বল আলোয়, সুবেশ, চিক্কণ এবং সাধারণত কাব্য সম্বন্ধে উদাসীন মেয়ে পুরুষের ভিড়ের মধ্যে কালো একটি ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে, বেশ চেঁচিয়ে, বেশ স্পষ্ট ক'রে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে নিজের লেখা একটি কবিতা পড়লো। পড়াটা ভালো লাগলো আমার, কবিতাটিও মন্দ না। সভার শেষে একটু আলাপ করলুম ছেলেটির সঙ্গে।

এর পরে সুকান্ত একদিন এলো আমার কাছে। কালোকেলো শক্তপোক্ত চেহারা, ছোটো ক'রে ছাঁটা রুক্ষ চুল, আধ-ময়লা মোটা জামাকাপড়, পায়ে (খুব সম্ভব) জুতো নেই। তার বড়ো-বড়ো মজবুত হাত-পায়ের দিকে তাকিয়ে মনে হ'লো, তার রক্তের আত্মীয়তা সেই কৃষক-মজুরেরই সঙ্গে, যাদের কথা লিখতে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। গর্কীর মতো, তার চেহারাই যেন চিরাচরিতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। কানে একটু কম শোনে, কথা বেশি বলে না, দেখামাত্র প্রেমে পড়ার মতো কিছু নয়, কিন্তু হাসিটি মধুর, ঠোঁট দুটি সরল।

পাঁচ বছরে বোধহয় পাঁচবারও সুকান্তকে চোখে দেখিনি আমি। বছরে দু-একবার চিঠি লিখতো সে—কিংবা 'কবিতা'র জন্য কবিতা পাঠাতো—ব্যক্তিগতভাবে এটুকুই ছিলো তার সঙ্গে আমার সংযোগ। কিন্তু ব্যক্তিগতর বাইরে অন্য যে-জগৎ আছে আমাদের, সেখানে সে তো সহযাত্রী, নিত্যসঙ্গী আমাদের ; সুকান্তকে আমি ভালোবেসেছিলুম, যেমন ক'রে প্রৌঢ় কবি তরুণ কবিকে ভালোবাসে ; দূর থেকে লক্ষ করেছি তাকে, সে একটি ভালো লাইন লিখলে উৎসাহ পেয়েছি নিজের কাজে। আর ভালো লাইন সে মাঝে মাঝেই লিখেছে ; ছন্দে

* লেখক-কর্তৃক ঈষৎ পরিমার্জিত।

ভুল নেই, হাতের লেখা সুন্দর, যা বলতে চায় স্পষ্ট ক'রেই বলে। এত তরুণ একটি ছেলের পক্ষে এর প্রত্যেকটিই উল্লেখযোগ্য। মনে-মনে আমি তাকে মার্কা দিয়ে রেখেছিলুম জাত-কবিদের ক্লাশে; উঁচু পর্দায় আশা বেঁধেছিলুম তাকে নিয়ে। কিন্তু আশা তো বিশ্বাসঘাতিকা? সুকান্তর অল্প কয়েকটি প্রাথমিক রচনা প'ড়েই বুঝেছিলুম যে সুভাষের সঙ্গে তার মিল শুধু নামের আদ্যক্ষরে নয়; কী প্রসঙ্গে, কী আঙ্গিকে, কী অঙ্গীকারে, 'পদাতিক'-এর একান্ত অনুগামী সে। কিন্তু সুভাষ তো কাব্যের ক্ষেত্রে আর-কিছু করলো না*; এরও যদি তা-ই হয়? আশাভঙ্গের দূত এলো অন্য দিক থেকে। কয়েক মাস আগে—শীতকাল তখন—সুভাষ হঠাৎ রাত ক'রে এলো এই খবর দিতে যে সুকান্তর যক্ষ্মা হয়েছে। যক্ষ্মা!···ক-দিন পরে আবার শুনলুম ডাক্তার বলেছেন রোগ এগিয়ে গেছে অনেক দূর।···তারপর ভরা গ্রীষ্মের একটি দিনে এসে পৌঁছলো বর্তমানের তরুণতম বাঙালি কবির মৃত্যু-সংবাদ। খবরটার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে ছিলুম, কিন্তু তাই ব'লে দুঃখ কি কম?

২

যক্ষ্মার খবরের অল্পদিন আগে সুকান্তর একটি পোস্টকার্ড পেয়েছিলুম। নিজের দুটি লাইন তুলে দিয়ে জিগেস করেছে: ছন্দ ঠিক আছে কি? বন্ধুরা সংশয় প্রকাশ করেছে। আমি তাকে জানিয়েছিলুম যে ছন্দে তার দোষ হয়নি, আর সেই সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলুম আদর্শ-বিশ্বাসীর গর্বপ্রসূত এই কথা: 'রাজনৈতিক পদ্য লিখে শক্তির অপচয় করছো তুমি; তোমার জন্য দুঃখ হয়।' সমগ্রভাবে সুকান্তর কবিতা সম্বন্ধে এটুকুই আমার বক্তব্য। তার কবিতা প'ড়ে মোটের উপর এ-কথাই মনে হয় যে তার কিশোর-হৃদয়ের স্বাভাবিক উন্মুখতার সঙ্গে পদে-পদে দাঙ্গা বাধিয়ে দিয়েছে একটি কঠিন, সংকীর্ণ তথাকথিত বৈজ্ঞানিক

* এই প্রবন্ধের রচনাকাল ১৯৪৭; সে-সময়ে আমার তা-ই মনে হয়েছিলো, কিন্তু আজকের দিনে (১৯৭০) এ-কথা আর গ্রাহ্য নয়। —লেখকের পাদটীকা।

মতবাদ। কবিতাগুলি যেন সেই মতবাদের চিত্রণ মাত্র; জোর গলায় চেঁচিয়ে বলা, কবিতা না-হ'য়ে খবরকাগজের প্যারাগ্রাফ হ'লেই যেন মানাতো। 'পদাতিক' লেখবার সময় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের যে-স্বাধীনতা ছিলো, যার জন্য একই মতবাদ সম্বন্ধে মুগ্ধতা সত্ত্বেও ঐ ক্ষীণ বইখানার কাব্যের মর্যাদা পাওয়া সম্ভব হয়েছে, সুকান্ত ভট্টাচার্যে সে-স্বাধীনতার কিছুই তো বর্তালো না। কেন বর্তালো না, এ-প্রশ্নের কি উত্তর দিতে হবে? যুদ্ধকালীন উদ্‌ভ্রান্তির সুযোগে দেশের রাজনৈতিক দলগুলি সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক একটি ফ্রন্ট খুললেন, আর আমাদের নবীন লেখকেরা যৌবনের ত্যাগ-প্রবণতায় অধীর হ'য়ে উঠলেন নিজেদের বিকিয়ে দিতে। 'পদাতিকে' যা ছিলো মুগ্ধতার আবেগ, সুকান্তর ক্ষেত্রে তা হ'য়ে উঠেছিলো সুচিন্তিত দাসত্ব। তা-ই যদি না হবে, তাহ'লে যে-ছেলে দেয়ালে পেনসিল দিয়ে লিখেছিলে :

দেয়ালে দেয়ালে মনের খেয়ালে
লিখি কথা
আমি যে বেকার, পেয়েছি লেখার
স্বাধীনতা।

কি

হে রাজকন্যে
তোমার জন্যে
এ-জনারণ্যে
নেইকো ঠাঁই
জানাই তাই।

এমনকি

সকালে বিকালে মনের খেয়ালে
ইঁদারায়
দাঁড়িয়ে থাকলে অর্থটা তার
কী দাঁড়ায়?

আর লেখার পরে ফিরেও তাকায়নি, সে কী ক'রে নিম্নোদ্ধৃত ডামাডোলকে কবিতা ব'লে ভুল করতে পেরেছিলো ?—

এখন এই তো সময়—
কই ? কোথায় ? বেরিয়ে এসো ধর্মঘট-ভাঙা দালালরা ;
সেই সব দালালরা—
ছেলেদের চোখের মতো যাদের ভোল বদলায়,
বেরিয়ে এসো,
জাহান্নমে যাওয়া মূর্খের দল,
বিচ্ছিন্ন, তিক্ত, দুর্বোধ্য—

কিংবা ধরা যাক :

হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়
এবার কঠিন কঠোর আঘাত আনো,
পদলালিত্য ঝংকার মুছে যাক
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো।
প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা—
কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় :
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

এখানে ঘোষিত মতের সঙ্গে অভ্যাসের সুস্পষ্ট বিরোধ ঘটিয়ে যে-ছেলে কবিতা লিখে কবিতাকে ছুটি দিচ্ছে, গদ্যের হাতুড়িকে আহ্বান করছে ললিত পদাবলিতে, সে কী ক'রে এত দূর আত্মবিস্মৃত হ'তে পেরেছিলো যে :

সহসা নেতারা রুদ্ধ—দেশ জুড়ে
'দেশপ্রেমিক' উদিত ভুঁই ফুঁড়ে
প্রথম তাদের অন্ধ বীর মদে
মেতেছি এবং ঠকেছি প্রতি পদে—

এই আধুনিক সম্ভাবশতক লিখতেও তার কলমে আটকায়নি ? বস্তুত, ধনিকের দ্বারা শ্রমিকের রক্তশোষণ সুকান্তর রীতিমতো

একটা ম্যানিয়া হ'য়ে উঠেছিলো ; সর্বত্রই সে যেন বিভীষিকা দেখছে, আর তা থেকে পালাতে গিয়ে বার-বার ডুব দিচ্ছে ভাবালুতায়। সূর্যকে সে বলছে—'হে সূর্য, তুমি তো জানো আমাদের গরম কাপড়ের কতো অভাব !' সে দেখছে, অসহায় সিঁড়িকে পা দিয়ে পিষে মারছে 'গর্বোদ্ধত অত্যাচারী', 'মৌন-মূক শব্দহীন' কলমকে দিয়ে কলঙ্কময় দাসত্ব করিয়ে নিচ্ছে হৃদয়হীন লেখক ; সে উত্তেজিত করছে সিগারেটকে 'হঠাৎ জ্ব'লে উঠে বাড়িসুদ্ধ পুড়িয়ে' মারতে, 'যেমন ক'রে তোমরা আমাদের পুড়িয়ে মেরেছো এতোকাল' ; সে কাঁদছে ডাকঘরের রানারের দুঃখে—'পিঠেতে টাকার বোঝা, তবু এই টাকাকে যাবে না ছোঁয়া' ! (ছুঁতে পারলে কি ভালো হ'তো ?)
বালকের ভাবালুতা ব'লে এ-সব উড়িয়ে দিতে পারতুম, যদি না সুকান্তর সহজাত কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে শ্রদ্ধা থাকতো আমার। এর চেয়ে ভালো কবিতা তার আমি দেখেছিলুম ; আর আভাস পেয়েছিলুম নেপথ্যবর্তী আরো বড়ো সম্ভাবনার। কিন্তু সম্প্রতি এ-ধরনের লেখাই বেশি বেরোচ্ছিলো তার কলম থেকে, তার কারণ হয়তো এই যে রাজনৈতিকের বিচারে এগুলোই ভালো কবিতা। বাংলা সাহিত্যের বৃহৎ দুর্ভাগ্য আজ এইটেই যে এর অনেকটা অংশই হ'য়ে উঠেছে বিভিন্ন শিবিরবাসী সৈনিকদের যান্ত্রিক কুচকাওয়াজ মাত্র। আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে এ-সব রচনা সুকান্তর স্বাধীন স্বচ্ছন্দ কর্মপ্রসূত। সৈনিকপঙক্তিতে বন্দী হ'লে, কোনো মতবাদের দাসত্ব স্বীকার করলে, কবিত্বশক্তির স্বাভাবিক বিকাশ কী-ভাবে অবরুদ্ধ হয়, তারই উদাহরণ সুকান্ত। ছেলেমানুষ ব'লে অসম্মান করবো না তাকে, কেননা উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে স্মরণীয় কবিতা লিখেছেন স্বদেশের ও বিদেশের অনেক কবি। সুকান্ত কেন পারলো না ? অথবা তার স্মরণীয় কবিতা এত অল্প কেন, যদিও তার রচনাস্রোত ছিলো স্বচ্ছন্দ, আর প্রতিভা তর্কাতীত ? সে মৃত ব'লে এই প্রশ্ন কি আমরা এড়িয়ে যাবো ? কবির কায়িক মৃত্যু যত দুঃখের, তার মানসিক পক্ষাঘাত কি

তার চেয়ে কম? স্বেচ্ছায় আত্মবিলোপ করেছিলো সুকান্ত; শেষ পর্যন্ত নিজের লুপ্তি দ্বারা রচনা ক'রে গেলো সমসাময়িক আর পরবর্তী নবীন লেখকদের জন্য সাবধানী বাণী।

৩

সুকান্তর নিজের দিক থেকে মহৎ এই ত্যাগ। স্বল্প পরিসরের মধ্যে দ্বিধাহীন খেদহীন, নির্মল, সম্পূর্ণ তার জীবন। যে-প্রতিজ্ঞা সে নিয়েছিলো, তার দায়িত্ব নিঃশেষে পালন ক'রে গেছে সে। সে তো জানতো না যে দেশের ও বিদেশের বীভৎস নৈরাজ্য থেকে যে-মতবাদে নিশ্চিন্ত আশ্রয় সে খুঁজেছিলো, তারও ক্রিয়াকর্ম নৈরাজ্যাভিমুখী; সে তো জানতো না যে 'বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারদিকে' ব'লে ক্রমাগত চীৎকার করতে থাকলে শেষ পর্যন্ত শুধু যে রেল-লাইন ওপড়ানো আর পোস্টাপিশ পোড়ানো হবে তা নয়, শুধু যে কলকাতার রাস্তা হত্যার প্রকাশ্য রঙ্গালয় হ'য়ে উঠবে, তাও নয়;—আরো অনেক কিছু হবে: পরীক্ষা দিতে এসে ছেলেরা চেয়ার-টেবিল ভেঙে বেরিয়ে যাবে, পড়া না-পারলেই ধর্মঘট করবে স্কুলের ছাত্র—তারপর একদিন নম্বর-বিতরণে ঘোরতর অসাম্যের অন্যায় আর যদি সহ্য না হয়, যদি বিদ্যার্থী-বঞ্চিতেরা পাশ-করা পুঁজিওলাদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করে—তাহ'লেই বা কী বলবার আছে?...কিন্তু এই সর্বনাশী পরিণাম সম্বন্ধে অচেতন থেকেও কাব্যশক্তির বিকাশ তো সম্ভব, যদি কবির আত্মচেতনা থাকে। তাও উৎসর্গ ক'রে দিয়েছিলো সুকান্ত, কিছু হাতে রাখেনি, যূথের কাছে ব্যক্তির সর্বস্বসমর্পণের সমীকরণে তার কবিত্বে কুঁড়ি ধরেই ঝ'রে গেলো। যে-চিলকে সে ব্যঙ্গ করেছিলো, সে জানতো না সে নিজেই সেই চিল; লোভী নয়, দস্যু নয়, গর্বিত নিঃসঙ্গ আকাশচারী, স্খলিত হ'য়ে পড়লো ফুটপাতের ভিড়ে, আর উড়তে পারলো না, অথবা সময় পেলো না। কবি হবার জন্যই জন্মেছিলো সুকান্ত, কবি হ'তে পারার আগে তার মৃত্যু হ'লো। তার জন্য দ্বিগুণ আমাদের দুঃখ।

কবিতা। আষাঢ় ১৩৫৪

ঘরোয়া স্মৃতি

সরযূ দেবী

বাংলা ১৯৩৯ সালের শ্রাবণ মাসে সুকান্তর বড়দাদা শ্রীযুক্ত মনোমোহন ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার বিবাহ হয়।

সুকান্তর বয়স তখন মাত্র ছ'বছর। খুব কালো আর রোগা ছিলো সে। ওদের ভাইয়েরা আর কেউ অতো কালো ছিলো না।

তাই আমি প্রায়ই বাড়ীর সকলকে বলতাম, ওর নাম 'কালাচাঁদ' রাখোনি কেন?

সুকান্ত আমাদের বড় আদরের ছিলো। খুব লাজুক ছিলো সে। কথাও কম বলতো। ওর জ্যাঠামশাই অর্থাৎ আমার জেঠ-শ্বশুর ওকে, সোনা, সোনা, সোনামাখানো ছেলে—বলে ডাকতেন আদর করে।

সুকান্তর সেই শৈশবকালে পড়াশোনায় হাতেখড়ি হয়েছিলো আমার কাছে। আমি প্রথম তাকে অক্ষর-পরিচয় করাই।

আমার নিজেরও তখন খুব গল্পের বই পড়ার সখ ছিলো।

তা সে সব বই তো সুকান্তকে পড়ে শোনানো চলতো না—তাই তার ফরমাস মতো ছোটদের গল্পের বই, ছড়ার বই—এই সব আনাতে হতো আমাকে।

ও তখনও পড়তে শেখেনি ভালোমতো।

তাই আমাকে বলতো, বৌদি, তুমি চেঁচিয়ে পড়, আমি শুনবো।

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'খুকুমণির ছড়া' বইটা আমি আনিয়েছিলাম ওর জন্যে। সে বই থেকে জোরে জোরে ছড়া পড়তাম আর সুকান্ত সেই সব ছড়া শুনে শুনেই মুখস্ত করে নিতো। তারপর তা শোনাতো বাড়ীর সকলকে।

এক এক সময়ে আমি বিরক্ত হয়ে বলতাম, তুই নিজে নিজে পড়তে শেখ্। আমি আর পড়ে পড়ে শোনাতে পারবো না।

সুকান্ত ভারী অভিমানী ছিলো। তাই আমার ওই একটি কথাই যথেষ্ট হলো তার পক্ষে। অভিমান করে ক'দিন এলো না আমার কাছে। দূরে দূরে ঘুরতে লাগলো। মাথায় একরাশ চুল এলোমেলো, অবিন্যস্ত।: মুখখানা ভার-ভার। ওর এই চেহারা দেখে আমি আবার থাকতে পারলাম না। ও ছাড়া আমারও যেন এক মুহূর্ত চলতো না। তাই নিজেই তাকে টেনে এনে জোর করে খাওয়ালাম।

সুকান্ত খেলাধুলো বড় একটা করতো না। ঘুড়ি ওড়ানো কি বল খেলা এসব ওর একেবারেই ছিলো না। আমাদের তখন নতুন একটা রেডিও কেনা হয়েছিলো। সুকান্ত সেই রেডিওর কাছে কান দিয়ে দিন রাত বসে থাকতো। ওর সেই বসে থাকার ভঙ্গীটি এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত বড় ভালোবাসতো সুকান্ত। সে সময়, এখনকার মতো রেডিওতে রবীন্দ্রনাথের গানকে 'রবীন্দ্র-সঙ্গীত' বলে ঘোষণা করা হতো না। বলা হতো 'কাব্য-সঙ্গীত'। রেডিওতে রবীন্দ্রনাথের এই 'কাব্য-সঙ্গীত' বড় প্রিয় ছিলো সুকান্তর।

ও যখন স্কুলে ভর্তি হলো, তখন কোনো কোনো দিন একেবারে খালি গায়েই স্কুলে চলে যেতো। এমনি ছিলো আপনভোলা।

ওকে প্রথমে কমলা বিদ্যামন্দিরে ভর্তি করে দেওয়া হয়।

সুকান্ত করতো কি; স্কুলে গিয়ে প্রথম ভাগের ছবির পাতাগুলো ছিঁড়ে ক্লাশের ছেলেদের বিলিয়ে দিয়ে বাড়ী চলে আসতো। আর দুম্-দাম্ করে বাড়ী এসে, রান্নাঘরের সামনে বই শ্লেট ফেলে দিয়ে বলতো, বৌদি কি আছে দাও, বড্ড খিদে পেয়েছে।

রোজই ওকে খেতে দিয়ে ওর বই-পত্তর গুছিয়ে রাখতে হতো আমাকে। ছেঁড়া-খোঁড়া বইয়ের অবস্থা দেখে হয়তো বললাম, কিরে, তোর বইয়ের পাতা আর সব কি হলো?

সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর কণ্ঠে জবাব এলো, জানি না যাও—

এর পরে, বইয়ের অক্ষর চেনা আর লিখতে শেখার সঙ্গে সঙ্গে ছন্দের

জ্ঞানও সুকান্তর ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিলো। তখন থেকেই সে অক্ষর মিলিয়ে মিলিয়ে কবিতা বানেতে পারতো।

আমার শ্বশুরমশায়ের বইয়ের দোকান ছিলো। এখনও আছে সে দোকান, আমার দেওররা দেখাশোনা করেন। তা তখনকার দিনে ওই দোকানে একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিলেন, নাম কালীরতন ভট্টাচার্য। তিনি খুব নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। খেতে বসে কথা বলতেন না। তাঁর মাথায় একটি মস্ত টিকি ছিলো। সুকান্ত দুষ্টুমি করে সেই টিকিটি জানলার পাশ থেকে কাঠি দিয়ে নাড়া দিতো। আবার কোনদিন বা রবিবার দুপুরে কালীরতনদা তাঁর সিঁজের ঘরটিতে শুয়ে ঘুমুচ্ছেন, অমনি সুকান্ত এসে তাঁর টিকিটি বেঁধে রেখে গেছে কোনো কিছুর সঙ্গে।

একদিন হয়েছে কি, কালীরতনদা যেখানে খেতে বসতেন, সেই ঘরের দেওয়ালে কালীরতনদার একটি মুখ এঁকে তার নিচে রঙিন পেনসিল দিয়ে ছড়া লিখে দিলো সে :

খাঁদু খালি কলা গেলে
আর কালীরতনদা তাই দেখে ভোলে।

খাঁদু মানে সুকান্তর ছোটো ভাই, যার ভালো নাম প্রশান্ত ভট্টাচার্য। ছোটবেলায় প্রশান্ত খুব শান্ত ছিলো, খুব বাধ্য ছিলো কালীরতনদার। তাই প্রশান্ত আর কালীরতনদার ওপর রাগ করেই এই ব্যঙ্গ কবিতা তৈরী করেছিলো সুকান্ত।

সে যাই হোক, কিন্তু এই কবিতা আর ছবি দেখে কী রাগ কালীরতনদা আর প্রশান্তর !

সেই বয়সে পড়াশোনার দিকে বিশেষ মনোযোগ না থাকলেও, দুষ্টুমি আর দুরন্তপনার নতুন নতুন বুদ্ধি সব সময়েই আবিষ্কার করতে পারতো সুকান্ত।

একদিন আমার শাশুড়ী [সুকান্তর মা সুনীতি দেবী] কাপড়

শুকোতে দিয়েছেন, ভিজে কাপড়ের আঁচলে একটি আনি বাঁধা ছিলো। উনি বললেন, বৌমা, আনিটা খুলে নিয়ে এসো তো। আমি আনি আনতে দিয়ে দেখি, ওমা, আনি আবার কোথায়? তার বদলে একটা ছোটো কাগজের চিরকুট বাঁধা রয়েছে শুধু। কাগজটা এনে শাশুড়ীর হাতে দিতেই উনি খুলে দেখেন, তাতে লেখা আছে, 'মা, তুমি সুশীলকে ভালোবাসা বেশী, আমাকে ভালোবাসো না। আমাকে দাঁত খিঁচিয়ে তুমি কথা বলো।'

সুকান্তকে খোঁজা হলো। কিন্তু কোথায় সুকান্ত? সে তখন বাড়ী ছেড়ে, পাড়া ছেড়ে উধাও। তখনও ওর বছর এগারো বয়স। তখনও কোনো বন্ধু ছিলো না ওর যে পালিয়ে তাদের বাড়ী যাবে! আমার জেঠ-শ্বশুরের বাড়ী খবর নিয়ে জানা গেলো সুকান্ত সেখানেও যায়নি। তাহলে? এবার সত্যিই ভাববার কথা। কোথায় গেলো সুকান্ত?

ওদিকে সে তখন কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে সারস্বত লাইব্রেরীর সামনে ঘোরাঘুরি পায়চারী করছে।

দোকানের ভেতর থেকে কালীরতনদা ওকে দেখতে পেয়ে বুঝলেন একটা কিছু অঘটন ঘটিয়ে এসেছে বাবু। এখন দোকানের সামনে এসে সুবোধ ছেলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কালীরতনদা ওর কান ধরে দোকানে টেনে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখলেন। শেষে ওঁদের সঙ্গেই রাত্রে বাড়ী এলো সুকান্ত। বাড়ী আসবার পর আমি সকলকে বারণ করলাম, যাতে ওকে কিছু না বলা হয়।

এই সব কারণে, সুকান্তকে আমি অত্যধিক স্নেহ করতাম বলে বাড়ীর সকলে অনুযোগ করতেন। বলতেন, তুমিই ওর মাথাটা খেলে। তা এতো মানুষের এতো অনুযোগ অভিযোগ সত্ত্বেও সুকান্তকে আমি স্নেহ না করে, ভালো না বেসে পারতাম না।

একদিন সুকান্তকে বললাম, তুই আর এমন দুষ্টুমি করিস্‌নি, তোর

জন্যে আমাকে সকলের কাছে কথা শুনতে হয়—তা জানিস্? এখন থেকে ভালো হ, শান্ত হয়ে থাক্।

ও তার জবাবে গম্ভীর হয়ে বললো, বুঝেছি, বুঝেছি, আমাকে বাড়ীর সবাই কি ভাবে। আমাকে নিয়েই সকলের মাথা-ব্যথা। এই বলে হুম্ হুম্ করে চলে গেলো সে।

তখন আমাদের বাড়ীতে আমাদের গুরুবংশের এক পুরোহিত থাকতেন। তিনি ভারী সুন্দর করে কথা বলতে পারতেন।

একদিন আমি রান্না করছি, আর আমার ছেলে রান্নাঘরের সামনে বসে মুঠো মুঠো করে কয়লার গুঁড়ো নিয়ে খেলা করছে। এই সময় পুরোহিতমশাই সুর করে আমার ছেলেকে বললেন :

ইয়ারে আইছ্ কি কারণ?

সুকান্ত কাছেই কোথায় ছিলো। পুরোহিতমশায়ের সামনে এগিয়ে এসে সঙ্গে সঙ্গে একই সুরে সুর মিলিয়ে জবাব দিলো :

ধাঁই কিরি কিরি ধাঁই কিরি কিরি
চলো বৃন্দাবন—

সেই থেকে ওই কথাটা আমাদের মধ্যে চালু হয়ে গেলো। মাঝে মাঝে ঠাট্টা চলতো ওই কথা নিয়ে।

একবার বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে আমাদের একটি নিমন্ত্রণ ছিলো, আমাদের পাড়ায় বিখ্যাত প্রকাশক উপেন্দ্রনাথ দাসের বাড়ীতে। বাড়ীর ছেলেরা সকলেই সেই নিমন্ত্রণে গেলো। কিন্তু সুকান্ত গেলো না।

বললাম, কি রে, তুই যাবি না? সবাই তো গেলো—

জবাব হলো, যাকগে সবাই, আমি যাবো না। আমাকে যদি ওরা ডাকতে আসে, তাহলে যেতে পারি।

বাড়ীর ছেলেরা, যারা খেয়ে এলো, তারা নানা কথায় সুকান্তকে শুনিয়ে শুনিয়ে লোভ দেখিয়ে বলতে লাগলো ফলাও করে, নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে কি কি রান্না হয়েছে। এতে ও আরো রেগে যেতে

লাগলো মনে মনে। আর অস্থিরভাবে ঘরময় পায়চারী করতে লাগলো

সে এক ভারী মজার দৃশ্য!

সুকান্ত ঘরময় পায়চারী করছে আর হাত মুঠো করে অস্থিরভাবে বিড় বিড় করে বলছে, এখনও আমাকে ডাকতে আসছে না—এখনও আমাকে ডাকতে আসছে না—না ডাকতে এলে ভস্ম করে দেবো উপেন দাসেদের সকলকে।

সত্যিই, অস্থির হবারই তো কথা! এতো ভালো ভালো রান্না হয়েছে উপেন দাসেদের বাড়ী—অথচ না ডাকলে সুকান্ত যেতে পারছে না। অন্তত একবারও যদি এসে তাকে ডাকে, তাহলে মান-সম্মান বজায় রেখে নেমন্তন্ন খেতে যেতে পারে সে।

শেষে ও-বাড়ী থেকে আমাদের মেয়েদের যখন ডাকতে এলো, তখন সুকান্ত গেলো আমার সঙ্গে-সঙ্গে।

ও-বাড়ীর মেয়েরা ওকে আমার সঙ্গে যেতে দেখে বলতে লাগলেন, এই এসেছে বৌদির আঁচল ধরে!

সুকান্তর ওই 'না ডাকতে এলে ভস্ম করে দেওয়ার' ব্যাপারটা ওঁরাও শুনেছিলেন। সেজন্যে ও-বাড়ীর সকলে ওর নাম দিয়েছিলেন 'ভস্মকারী ঠাকুর'।

উপেন দাস মশাই আমার শ্বশুর মশায়ের যজমান ছিলেন! সেই জন্যেই এই 'ঠাকুর' কথাটা যোগ করা হয়েছিলো।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই আমি আমার সংসার নিয়ে আলাদা হয়ে যাই। পাশের বাড়ীটি ছিলো প্রাক্তন এম. এল. এ. কে. জি. বসুর বাড়ী। আমরা ওই বাড়ীতেই উঠে গেলাম।

এর কিছুদিন পরেই আমার শাশুড়ী মারা যান।

মা মারা যাবার পর অবলম্বন হিসাবে আমি ছাড়া সুকান্তর আর কেউই রইলো না। তাই সব সময়েই প্রায় আমার কাছে থাকতো সে। এমনও সময় গেছে, সুকান্ত চার-পাঁচদিন বাড়ী না যাওয়ার

পরও ও-বাড়ী থেকে তার খোঁজ করা হতো না। ও আমাদের বাড়ীতে থাকার সময় হয়তো ওকে জোর করে বসালাম পড়ার বইয়ের সামনে, তা ও করতো কি—সঙ্গে সঙ্গে রেডিওটি খুলে তার সামনে কান দিয়ে বসে থাকতো।

কানে কম শুনতো সুকান্ত। তাই একেবারে রেডিওর কাছে না বসলে ওর পোষোতো না। ওর ওই পড়ার বই সামনে রেখে রেডিওয় কান দিয়ে বসে থাকা দেখে মাসীমা (কে. কি. বসুর মা) এসে আমাকে বলতেন, এই জন্যেই তোমার শ্বশুর আর সুশীল বকে। এমন করে কি প্রশ্রয় দিতে আছে?

আমি এই শুনে রেডিও বন্ধ করে দিয়ে বই পড়ার জন্যে বকাবকি করতাম ওকে। বলতাম, না পড়লে পাশ করবি কি করে, ক্লাশে উঠবি কি করে?

সুকান্ত তার জবাবে হাসি মুখে বলতো, পাশ করে কি হবে, ক্লাশে উঠবো—এই তো? ক্লাশে উঠে উঠে ডিগ্রী নেবো! কিন্তু ডিগ্রী নিয়ে কি হবে? আমি যদি ডিগ্রী না নিয়ে আরো বেশী পড়ি? লোকে তো আমাকে বাজালেই বুঝতে পারবে খালি কলসি কি ভর্তি কলসি! এই বলে সে পড়ার বই মুড়ে রেখে আলমারি খুলে গল্পের বই নিয়ে বসতো।

আমার তখন এক আলমারি বই ছিলো। বহু প্রাচীন পত্রিকা আর দুষ্প্রাপ্য গল্পের বই থাকতো তার মধ্যে। সে সব বই সুকান্ত খুব মন দিয়ে পড়তো। শরৎচন্দ্রের সমস্ত বই আমার ওই আলমারি থেকে নিয়ে নিয়ে পড়ে শেষ করেছিলো সে। তা ছাড়া আমার বাবা, মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ কাব্য', টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' আর 'কথা-সরিৎ-সাগরের' একটি বড় সংস্করণ আমাকে এনে দিয়েছিলেন। সুকান্তকে আমি সেই সব বই আগ্রহের সঙ্গে পড়তে দেখেছিলাম।

আমিই প্রথম ওকে জোর করে মহাভারত পড়িয়েছিলাম।

মহাভারতখানা. পড়ার পর ও আমাকে শ্বশুর মশায়ের সারস্বত লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত একখানি রামায়ণ এনে দিয়েছিলো। বইয়ের সমস্ত ছাপা ফর্মা বাড়ীতেই থাকতো। ও তার থেকেই একটি বই নিয়ে আসে।

বইটিতে লিখেছিলো ঃ

'বৌদিকে দান করলাম

ইতি সুকান্ত—'

ছেলে মানুষের বুদ্ধি তো! এর থেকে বেশী আর কি লিখবে?

ওর দেওয়া সেই রামায়ণ বইটি এখনও আমার কাছে আছে।

সুকান্তর খুব ইচ্ছা ছিলো, পৈতের সময় একটা আংটি দিই ওকে। কেন না, ওর ওপরের ভাই সুশীলের পৈতের সময়েও তাকে একটা আংটি দিয়েছিলাম। সেই থেকে সুকান্ত কেবলই বলতো, আমাকেও ওই রকম একটা আংটি দিতে হবে। নাম লেখা আংটি।

তা আমি ওর পৈতের সময় আংটি দিতে পারিনি।

সেজন্যে সুকান্ত অভিমান করে প্রায়ই বলতো, বৌদি, তুমি আমাকেই ফাঁকি দিলে।

আমি আদর করে ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলতাম, ওরে না, না, আমি কি মরে যাচ্ছি, পরে দেবো তোকে আংটি।

এ কথা মনে পড়লে আজও দুঃখ হয়। আমি আজও মরিনি বটে, কিন্তু সুকান্ত আমার দেওয়া নাম লেখা আংটি নেবার জন্যে আজ আর নেই।

পৈতের আগের দিন সুকান্ত আমার কাছে আসতেই তার হাতে একটি টাকা দিলাম। বললাম, এটা তুই নে। যা খাবার ইচ্ছে হয় খেগে যা। তা তখন ওর মুখ চোখের অবস্থা যদি কেউ দেখতো! দু'আনা চার আনা নয়, একেবারে পুরো একটা টাকা! এক টাকায় তখন ছোটোরা রাজ্য কিনতে পারে! সুকান্ত কিন্তু সে টাকায় কিছু খায়নি। মাথার চুল বড় যত্নের ছিলো তার। পৈতের সময়

তো মাথা কামিয়ে নেড়া হতে হবে! তাই চুলের স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখার জন্যে সেই টাকাটিতে ক'খানা ছবি তুলেছিলো সুকান্ত।'

এখন ওই যে গালে হাত দেওয়া ছবিটা ওর দেখতে পাওয়া যায়, ওটা সেই ছবিগুলিরই একটি।

ওর বড় দাদার চেষ্টায় সে সময় রেডিওর 'গল্প দাদুর আসরে' একটি কবিতা আবৃত্তি করার প্রোগ্রাম পেয়েছিলো সুকান্ত। তা যেদিন আবৃত্তি করতে যাবার কথা, তার আগেই ওর পৈতে হয়ে গেছে। মাথা নেড়া। বললো, নেড়া মাথায় কি করে রেডিও অফিসে যাই বলোতো? তুমি আমাকে একটা গান্ধী ক্যাপ্ তৈরী করে দাও। সারা দুপুর ধরে আমার কাছে বসে থেকে টুপি তৈরী করালো। তারপর বিকেলে ধুতি পাঞ্জাবী গান্ধী টুপী পরে চললো রেডিও অফিসে! যাবার সময় আবার কী বিড়ম্বনা! পাড়ার একটি ছেলেকে আমার পাহারায় রেখে গেলো। বললো, এই দেখবি তো, বৌদি রেডিও খুলে আমার আবৃত্তি শোনে কি না।

আমি ওকে রাগাবার জন্যে বলেছিলাম এক সময়, তুই আমাকে এতো জ্বালাচ্ছিস, যা আমি তোর আবৃত্তি শুনবো না।

সেই জন্যেই এই পাহারার ব্যবস্থা!

'গল্প দাদুর আসর'এ স্বর্গীয় নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় তখন 'দাদুমণি'। তিনি সময়মত সুকান্ত ভট্টাচার্যর নাম ঘোষণা করলেন।

সুকান্ত রেডিওতে আবৃত্তি করলো রবীন্দ্রনাথের 'শীতের আহ্বান' কবিতাটি।

বাড়ী এসেই আগে আমার কাছে ছুটে এলো, বৌদি শুনেছো। আমার আবৃত্তি?

বললাম, হ্যাঁ শুনেছি। কিন্তু ও কি রে, এখন তো মাঘ মাস— এই মাঘ মাসে শীতের আহ্বান কি রে? এখন তো শীত চলে যাচ্ছে!

বেচারী মুখ কাচুমাচু করে বললো, হ্যাঁ ঠিকই বলেছো, আমি

অনেকদিন আগে অডিসন্ দিয়েছিলাম তো, দিন আসতে আসতে দেরী হয়ে গেলো।

এই রেডিওর কথায় মনে পড়লো, সুকান্তর যতো কাজই থাক প্রতি রবিবার সকালবেলায় এসে ও ঠিক রেডিও খুলে বসে থাকতো। আজকালকার মতো তখনকার দিনেও রবিবার সকালে রেডিওতে পঙ্কজকুমার মল্লিকের রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষার আসর বসতো। সুকান্ত নিবিষ্ট মনে শুনতো সেই প্রোগ্রাম। অনেক সময় আবার গভীর ভাবনায় মাথা ঘামাতে লেগে যেতো। বলতো, আচ্ছা বৌদি, যখন পঙ্কজ মল্লিক থাকবেন না, তখন কে রেডিওতে গান শেখাবে বলোতো ?

পঙ্কজকুমার ওর খুব প্রিয় গায়ক। অনেক সময় তাঁর মতো গলা করে সুকান্ত রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইতো। তবে এই গায়কদের বিষয়ে একটা উল্লেখযোগ্য খবর হলো, সুকান্ত সে সময় রেডিওর যে কণ্ঠ-সঙ্গীত শিল্পীকে মোটেই পছন্দ করতো না তিনি হলেন হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়। এ কথা শুনলে আজকের দিনে নিশ্চয়ই সকলে খুব অবাক হবেন। কিন্তু কথাটা একেবারেই মিথ্যে নয়।

হেমন্তকুমার তখন নতুন শিল্পী। সবে রেডিওতে গান গাইছেন। তাঁর নরম নিচু কণ্ঠস্বর মোটেই পছন্দ হতো না সুকান্তর। হেমন্তর প্রোগ্রামের আগেই সে বলতো, বৌদি, এবার একজন ভদ্রমহিলা গান গাইবেন। শুনবে তো এসো।

আজ হেমন্তকুমার এ কথা শুনলে নিজেও নিশ্চয়ই হাসবেন। সে সময় সুকান্ত তাঁকে পছন্দ না করলেও পরবর্তীকালে তিনিই সুকান্তর গান গেয়ে তাকে সাধারণ মানুষের কাছে অনেকখানি জনপ্রিয় করে তুলতে পেরেছিলেন। যা সুকান্ত দেখে যেতে পারেনি। সুকান্তর পৈতের ক'দিন পরেই ঢাকা মেল দুর্ঘটনা হয়েছিলো। বহু মানুষ তাতে মারা যায়। আর তার ক'দিন পরে-পরেই আমার এক সম্পর্কীয়া ননোদের বিয়ে হয়।

বিয়ের দিন সন্ধ্যাবেলা বর আসতে সারা বাড়ীতে হৈ-চৈ। সুকান্ত এরই মধ্যে ছুটতে ছুটতে আমার কাছে এসে কানের কাছে মুখ এনে বললো, বৌদি সাবধান, বর কিন্তু ঢাকা মেল দুর্ঘটনা!

বললাম, সে কিরে, তার মানে?

—দেখতেই পাবে ঠিক সময়ে।

বিয়ের সময় উঠোনে বরকে বরণ করতে গিয়ে দেখি, তার মুখের একদিক সামান্য বাঁকা। সুকান্তর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ও আমাকে ইশারা করলো, ভালো করে দেখে নাও!

এই রকম দুষ্টুমীর ঘটনা ওর আরো আছে।

একবার বৃষ্টির সময় রান্নাঘরে বসে আমি রান্না করছি। ওদিকের বড় ঘরে সুকান্ত কি করছিলো যেন। দেখলাম দরজা দিয়ে হাওয়া আর বৃষ্টির ছাঁট আসছে। ওকে বললাম, সুকান্ত, দরজাটা দে।

দু'একবার বলাতে সুকান্ত কথাটা গ্রাহ্য করলো না। এই দেখে ভারী রাগ হলো আমার। বৃষ্টির জলে ঘর ভিজে যাচ্ছে, বাচ্চারা শুয়ে, হাওয়ায় ঠাণ্ডা লাগবে—বলছি, তবু কথা গ্রাহ্য করছে না! তাই এবার চেঁচিয়ে বললাম, সুকান্ত কথাটা কানে যাচ্ছে না? দরজাটা দে—

সুকান্ত করলো কি, দরজাটা দু'চারবার টেনে ধরে হতাশ ভঙ্গী করে বললো, বৌদি, তোমার কথা রাখতে পারলাম না। দরজাটা তুমি চাইছো, কিন্তু আমি দিতে পারছি না। এটা বড্ড ভারী!

তখন আমি কোন রকমে রাগ চেপে গম্ভীর গলায় বললাম, দরজাটা বন্ধ কর—

ও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো, তাই বলো, ব্যাকরণ শুদ্ধ করে বলবে তো? দরজা দিতে বলছো—দরজা কি দেওয়া যায়?

আমি বললাম, বাঁদর—

সুকান্ত সঙ্গে সঙ্গে মুখ কাচুমাচু করে জবাব দিলো, না বৌদি, তোমার দিক ভুল হলো, ওটা বাঁ-দোর নয়, ডান দোর।

এর পরে কি আর থাকা যায় রাগ করে ?

সন্ধ্যার সময় আমি যখন রান্নাঘরে বসে জলখাবার তৈরী করতাম, তখন রান্না ঘরের চৌকাঠে বসেই সুকান্তর মনের কথা বলবার সময় হতো যেন। আমাকে বলতো, আমি আর ইস্কুলে যাবো না। এতক্ষণ পর্যন্ত মাস্টারদের শাসনের মধ্যে থাকতে পারবো না। তারচেয়ে তুমি আমাকে এই রকম করে তেলেভাজা ভেজে দেবে ভেতর থেকে, আমি একটা দোকান করে এই সব বিক্রি করবো।

আমি দই পাত্‌তাম। সুকান্ত সেই দই খেতে খেতে ওটাও বিক্রির তালিকার সঙ্গে জুড়ে দিতো। বলতো, বাঃ, বেশ দই তো! আমি দইও বিক্রি করবো।

সেই শৈশবকাল থেকেই স্কুলের প্রতি সুকান্তর একটা বিতৃষ্ণার ভাব জেগে উঠেছিলো। বিশেষ করে স্কুলের নিয়ম শৃঙ্খলা আর মাস্টারদের অত্যধিক শাসনের ওপর। টিফিনের পর বাড়ী এসে প্রায়ই সে আর স্কুলে যেতো না। এই স্কুলে না যাওয়ার জন্যে আমি আর মাসীমা (কে. জি. বসুর মা) ওকে বকাবকি করতাম যথেষ্ট।

সুকান্ত ইতিহাসে বড্ড কাঁচা ছিলো। প্রায়ই ইতিহাসে সে ফেল করতো। সেজন্যে আমি ওকে নিজে জোর করে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত পড়িয়েছিলাম। বলেছিলাম, গল্পের বই মনে করেই মহাভারতখানা পড়্‌। তাহলে ওই ইতিহাসও আর কঠিন লাগবে না—ঠিক পাশ করতে পারবি।

পরে অবশ্য সুকান্ত ইতিহাসে পাকা হয়ে উঠেছিলো।

এর পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ের ঘটনা। তখন ছোটো বড়ো সকলের মুখেই 'জাপান এলে রুখতে হবে'—এই শ্লোগান। এখানে ওখানে দল তৈরী হচ্ছে। সুকান্তও পাড়ার ওই রকম একটি দলে যোগ দিয়েছিলো। আমি জানতে পেরে বললাম, ওসব আবার কি রে? বাড়ীতে পুলিশের হামলা হবে শেষে—

সুকান্ত গম্ভীর ভারিক্কী চালে বললো, ওসব তুমি বুঝবে না।

আমাদের ওই অঞ্চলে, বর্তমানে যেখানে সুকান্তর ভাইয়েরা বাস করে, ঐ সময়ে সুভাষচন্দ্র বসু এসেছিলেন। এসেছিলেনই শুধু নয়, সাতদিন একটি মাঠে তাঁবু খাটিয়ে ছিলেনও। কারণ, সে সময় ওখানে ধাঙড়-মেথরদের ধর্মঘট চলছিলো। সেই সমস্ত ব্যাপারেই সুভাষচন্দ্র আসেন ও থাকেন ক'দিন।

পাড়ার ওই সমস্ত ব্যাপারে ভলেন্টিয়ারী করতে সুকান্তর কী উৎসাহ! পথ-ঘাট নর্দমা পরিষ্কার করার কাজেও সে যোগ দিয়েছিলো পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে। সুভাষচন্দ্র আসা আর ভলেন্টিয়ারের দল তৈরী করে পাড়ায় জনহিতকর এই সব কাজ করা—এর থেকেই সুকান্ত পরবর্তীকালে রাজনৈতিক দলে আত্ম-নিয়োগ করার অনুপ্রেরণা পায়—এ কথা বলা চলে। এর পর থেকে সে নিয়মিত রোজ সকালে খবরের কাগজ পড়তো, আর রেডিওর খবর শুনতো আগ্রহের সঙ্গে।

ওকে রাগাবার জন্যে বলতাম, কি রে, 'জাপান এলে রুখতে হবে' করবি, না 'বন্দেমাতরম্' করবি ?

ও তার জবাবে গম্ভীর হয়ে বলতো, দেখি কি করি।

একটি উপসর্গ বাড়লো।

ওর ফরমাস মতো 'যুগান্তর' কাগজ রোজ নিতে হতো আমাদের।

ওই সময়ে পাড়ার ক'জন ছেলের সঙ্গে মিলেমিশে সুকান্ত একটা লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেছিলো। আমার এক আলমারি ভর্তি সখের বইগুলো সব নিয়ে গেলো সে সেই লাইব্রেরীতে। আমি প্রথমে দিতে চাইনি, কিন্তু এমনভাবে কাকুতি মিনতি করতে লাগলো যে, ওর মুখ চোখের অবস্থা দেখে না দিয়ে পারলাম না।

ছেলেমানুষ সুকান্ত আমাকে লোভ দেখাবার জন্যে বললে, দাও, দাও বৌদি, সব বইতে তোমার নাম লেখা থাকবে, তুমি বই দিয়েছো বলে কতো সুনাম হবে তোমার, দেখবে—এই বলে আলমারি খালি করে বইগুলো সব নিয়ে গেলো। বেচারী জানতো না তো, আমি

আমার সুনাম হবার লোভে বইগুলো দিইনি, দিয়েছিলাম আমার সুকান্তর মুখের হাসি দেখবার জন্যে!

ওই যুদ্ধের মধ্যেই আমাদের বেলেঘাটার পৈতৃক বাড়ী বিক্রি হয়ে গেলো। সুকান্ত আমার শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে বেলেঘাটার দুই রেলব্রীজের মাঝামাঝি ২০ নম্বর নারকেলডাঙা মেন রোডের বাড়ীতে চলে গেলো। আর আমি কে. জি. বসুর বাড়ী থেকে আমার সংসার তুলে নিয়ে সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের একটি বাড়ীতে চলে এলাম।

এই ছাড়াছাড়ি হবার মাস দু'য়েক আগে সুকান্ত এমনভাবে পাড়ার দলে মিশে রিলিফ ইত্যাদির কাজে লেগে গেলো যে, সুকান্তর ওপরের ভাই সুশীল বিরক্ত হয়ে আমাকেই এর জন্যে দোষারোপ করলো। সকলের কাছে বলতে লাগলো, বৌদিই সুকান্তর মাথাটা খেয়েছে।

ক্রমাগত এই কথা শুনে শুনে বিরক্ত হয়ে সুকান্তকে ডেকে খুব ভর্ৎসনা করলাম একদিন। সুকান্তর অভিমান আর আত্মসম্মান বোধ ছিল খুব বেশী।

আমার কাছে এই বকুনি খেয়ে রাগে দুঃখে অভিমানে আমার সঙ্গে আর দেখা করলো না ক'দিন।

যেদিন আমরা হরমোহন ঘোষ লেনে কে. জি. বসুর বাড়ী ছেড়ে চলে আসি সেদিন ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকারে মা-হারা সুকান্ত আমার চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো গোঁজ হয়ে। তবু এমন অভিমানী যে একবার বললো না পর্যন্ত, বৌদি—তুমি যেও না। যাও তো আমাকেও নিয়ে চলো সঙ্গে করে। অথচ, ওই কথা সুকান্তই সব চেয়ে বেশী করে বলতে পারতো।

আসার সময় ওর ছোট ভাই বিভাস আমার সঙ্গে এসেছিলো।

নতুন বাড়ীতে চলে আসার ন'দিন পরে এক সকালে সুকান্ত

এসে হাজির। দরজায় কড়া নাড়া শুনে খুলতেই দেখি—সুকান্ত।

বললাম, কি রে তুই ?

—হ্যাঁ, এলাম।

বললাম, আয় আয়, ভেতরে আয়। ভেতরে আসতে বলতেই ও কি রকম যেন হয়ে গেলো। বাড়ীটা চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখলো। প্রকাণ্ড ফাঁকা বাড়ী। নীচের তলাটা অন্ধকার।

সুকান্ত সব দেখে শুনে বললো, এতো বড় খালি বাড়ী—একি ভূতের বাড়ী নাকি ? একলা থাকো কি করে ?

সেদিন ছিলো বাংলা ৯ই পৌষ। বড়দিন সেদিন। সুকান্ত আসাতে বড় আনন্দ হলো। ভালো খাওয়া দাওয়ার আয়োজন হয়েছে বাড়ীতে। শুনে সুকান্ত বললো, কি রান্না করবে ?

—তোর মনের মতই সব হবে। এ কথার পর সুকান্ত যা খেতে ভালোবাসতো ওর দাদা সেই সব কিনে আনলেন।

সেইদিনই কলকাতায় প্রথম বম্বিং হলো।

রাত আটটা। আমি তখন রান্নাঘরে। এমন সময়ে খুব জোরে সাইরেন বেজে উঠলো। আমার দুই মেয়ে তখন ছোটো। সুকান্ত ওদের দু'জনকে দুই বগলে নিয়ে নিচে একতলায় দৌড়োলো। আমিও নেমে এলাম।

নিচের ঘরের খাটে ওদের দুজনকে শুইয়ে কানে তুলো গুঁজে দিয়ে ওদের ওপর নিজেও উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো। যেন বোমা পড়লে নিজের পিঠ দিয়ে ওদের বাঁচাবে সুকান্ত, এমনি ভাবখানা।

আমি তখন জানলার পাশেই ছিলাম। জানলার একটি পাল্লা খোলা ছিলো। দেখলাম, দূরে আকাশে বিদ্যুতের মতো আগুনের ঝলক চমকে চমকে উঠছে। সুকান্ত আমাকে খালি বলতে লাগলো, আমি একটু জানলা দিয়ে দেখব বৌদি ?

ওর দাদা বকলেন। তখন ও শান্ত হয়ে বসলো।

ওই সময় কবি সুনির্মল বসুর একটি যুদ্ধ বিষয়ক কবিতা দৈনিক 'যুগান্তরে' বেরিয়েছিলো। সুকান্ত সেই কবিতাটি আবৃত্তি করে প্রায়ই আমাকে রাগাবার চেষ্টা করতো।

পর পর ক'দিন সাইরেন বাজার জন্য সুকান্তকে আমরা পাঁচদিন আট্‌কে রাখলাম।

কলকাতায় তখন বিরাট হৈ-চৈ। বম্বিং হয়ে গেছে, বহু মানুষ মারা পড়েছে। সকলেই নিজের নিজের লোকের খোঁজ খবর নিচ্ছে তখন। এই রকম যখন অবস্থা তখন সুকান্ত আমাদের কাছে। তিন দিনের দিন আমার শ্বশুরমশাই সুকান্তর খোঁজ করতে এলেন। সব জায়গায় খুঁজে, এখানে এসে ওর দেখা পেয়ে, না বলে আসার জন্যে খুব বকাবকি করলেন। আমরা বললাম, ওর দোষ নেই, পথেঘাটে বিপদ হবে মনে করে আমরাই ওকে এখানে আট্‌কে রেখেছি।

শ্বশুরমশাই বললেন, সুকান্ত কোনো নিয়ম মেনে চলে না, পড়াশোনা ছেড়েই দিয়েছে একরকম--বাড়ীতে কারো সঙ্গে কথাও বলে না বিশেষ।

সেদিন তিনি সুকান্তকে বকাবকি করলেন না শুধু, অনেক বোঝালেনও। বললেন, যদি ভাল লাগে এখানেই না হয় থাক্, ইস্কুলে ভর্তি হ, পড়াশোনা কর মন দিয়ে।

যাবার সময় জিজ্ঞেস করলেন, কবে বাড়ী যাবি বল্, দিনটা আমার জানা দরকার। তুই আবার এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাবি তারপর বললেন, না, আর কোথাও যেও না। দিনকাল খারাপ— এখান থেকে সোজা বাড়ী যাবে।

সুকান্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। কোনো কথা বললো না। বাবার মুখের ওপর কোনদিনই কোনো কথা বলতো না সে।

এরপর আমরা যখন শ্যামবাজারের কাছে বলরাম ঘোষ স্ট্রীটে থাকি, তখনকার ঘটনা।

সেদিন ছিল বিজয়া-দশমী।

সুকান্তর দাদা সন্ধ্যার সময় বাড়ী এসেছেন। ওঁর সঙ্গে সুকান্তকে দেখে আমি বললাম, ওকে কোথা থেকে ধরে আনলে ?

উনি বললেন, এই পাড়ারই ভূপেন বসুর বাড়ীতে কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে যাচ্ছিলো, ধরে আনলাম।

সুকান্ত এই ক'দিন আগে ভারী অসুখ থেকে উঠেছে। এরই মধ্যে বাড়ীর বাইরে বেরিয়ে অনিয়ম শুরু করে দিয়েছে দেখে ভারী বকাবকি করলেন ওর দাদা।

সুকান্ত অভিমানে কাঁদলো খানিক। খেতে চাইলো না। ওর দাদা এক সময় বললেন, সুকান্তকে মিষ্টি দাও।

সুকান্ত জবাব দিলো, যা মিষ্টি তুমি দিলে!—বলে ওপাশে সরে গিয়ে দাঁড়ালো।

শেষে অনেক সাধাসাধির পর খেলো সে।

এর পর থেকে নিয়মিত আসতে লাগলো সুকান্ত। অনেক সময় ঘরে ঢুকে ক্লান্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়তো।

দেখতাম ওর আধময়লা জামা-কাপড়। শুক্‌নো মুখ। এলোমেলো মাথার চুল। জিজ্ঞেস করে জানতাম, সারাদিন পার্টির কাজে ঘোরাঘুরি করেছে। বলতাম, খেয়েছিস কিছু ?

সুকান্ত চুপ করে থাকতো, কোনো জবাব দিতো না। ওই ওর এক দোষ ছিলো একান্ত আপনজনের কাছেও মুখ ফুটে খাওয়ার কথা বলতে পারতো না। জোর করে খাট থেকে নামিয়ে এনে খাওয়াতে হতো ওকে।

একদিন হঠাৎ ঝড়ের মতো এসে হাজির হলো। তেমনি শুক্‌নো মুখ। জামাময় কালিমাখা। বললাম, একি রে, এতো কালি কোথা থেকে এলো ?

বললে, তুমি আমাকে একটা কলম দিয়েছিলে না—সেটা ভেঙে গিয়ে কালি পড়েছে। তা যাকগে, তুমি আমাকে দুটো পা-জামা

করে দাও তো। এই নাও কাপড় এর মধ্যে আছে।—আজই চাই কিন্তু। বলে বগল থেকে একটা কাগজের মোড়ক নামিয়ে দিলো। বললাম, কাপড় কোথায় পেলি?

—দিয়েছে একজন। তুমি তাকে চেনো না। নাও নাও, তাড়াতাড়ি করো—বিকেলের মধ্যেই চাই—

খুব তাড়া লাগালো সুকান্ত।

তখন সে পা-জামা-ই পরতো বেশীর ভাগ সময়ে। বললাম, অতো তাড়া কিসের—কোথায় যাবি?

—পার্টির একটা কনফারেন্স আছে, কলকাতার বাইরে যেতে হবে। সুকান্ত জবাব দিলো।

আমি বললাম, কিন্তু দুটো পা-জামা তো এই সময়ের মধ্যে হয়ে উঠবে না। তুই একটা নিয়ে যা না হয়—

সুকান্ত বললে, সে আমি জানি না, এই কাপড় রইলো। বিকেলের মধ্যে দুটো পা-জামা-ই চাই। বলে হন্ হন্ করে ব্যস্ত পায়ে কোথায় চলে গেলো। আমি, সব কাজ ফেলে, বিকেলের মধ্যে ওর পা-জামা দুটো তৈরী করে রাখলাম।

ওই সময় সুকান্ত পার্টির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতো। শুধু কলকাতায় নয়, পার্টির কাজে কলকাতার বাইরেও যেতো সে। তাছাড়া ছোটদের সংগঠন 'কিশোর বাহিনী', 'স্বাধীনতা' কাগজের ছোটদের বিভাগ 'কিশোর সভা' পরিচালনা করতো।

আর এর কিছুদিন পরেই সে পুরোপুরি অসুস্থ হয়ে পড়লো। অসুস্থ অবস্থায় প্রথম দিকে ওই শ্যামবাজার অঞ্চলেই তার জেঠতুতো দাদা শ্রীযুক্ত রাখাল ভট্টাচার্যের বাড়ীতে কিছুদিন ছিলো সে।

ওই সময় আমার ভাসুর শ্রীযুক্ত রাখাল ভট্টাচার্য আর তাঁর স্ত্রী রেণুকাদি অনেক চেষ্টা করেছিলেন সুকান্তকে সুস্থ করে তোলার জন্যে। কিন্তু সকলের সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। সুকান্তকে ভর্তি করে দেওয়া হলো যাদবপুর টি. বি. হাসপাতালে।

তখন সারা কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা চলছে। বিকেলের পরেই কার্ফু অর্ডার জারী করা হতো। তাই শ্যামবাজার থেকে যাদবপুরে গিয়ে ওকে দেখবার সুযোগ সব সময় হতো না।

রেণুকাদির বাবা পুলিশের বড় অফিসার ছিলেন। উনিই জিপে করে সুকান্তকে দেখতে যাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তাও দু'একজনের বেশী যাবার উপায় ছিলো না।

এর ক'দিন পরেই সুকান্ত মারা যায়।

আজকাল সুকান্ত সম্বন্ধে অনেকে অনেক কিছু লেখেন শুনি। পড়িও সে সব কিছু কিছু। অনেকে লেখেন সুকান্ত অত্যন্ত দরিদ্র ছিলো। খুব কষ্টে অনাহারে কেটেছে তার জীবন। এমন কি এমনও পড়েছি. না খাওয়ার জন্যে সুকান্তর টি. বি. হয়ে অকালমৃত্যু ঘটেছে।

কথাটা কিন্তু ঠিক নয়।

আমার শ্বশুরবাড়ীর অবস্থা এমন ছিলো না যে, সে বাড়ীর কোন ছেলেকে না খেয়ে মরতে হবে। এ কথা বলতে পারি যে, সুকান্ত নিজে অনিয়ম আর অমানুষিক পরিশ্রম করে অকালে নিজের জীবন দিয়েছে।

সুকান্তর অকালমৃত্যু সম্বন্ধে এই আমার মত।

অনুলিখন : বিশ্বনাথ দে

বিস্ময়কর সুকান্ত

বিষ্ণু দে

সুকান্তর কবিতা চার-পাঁচ বছর আগে হাতে আসে, হাতে-লেখা তিনটি কবিতা, পরিষ্কার পরিণত হাতের লেখা। আশ্চর্য হয়েছিলুম, সুকান্তর কবি প্রতিভা প্রকাশিত হলো প্রতিশ্রুতিতে নয়, একেবারে পরিণতিতে; তারপর থেকে মাঝে মাঝে তার কবিতা পড়েছি। অক্লান্ত কর্মীর আত্মত্যাগের অবসরহীন মানস কিন্তু সুলিখিত কবিতা। একাধারে তার এই পরিণত কবিত্ব এবং মার্কসিস্ট তত্ত্বের জনগাম্ভীর্য বার বার বিস্মিত করেছে—ভেবেছি এ ছেলেটি প্রৌঢ়ত্বে আর কি লিখবে, এর বিস্ময়কর প্রতিভার কি বিকাশ সম্ভব? সেই ফরাসী কবির আলৌকিক প্রতিভার মতো এও কি উনিশ বছরে সাহিত্য জগৎ থেকে বিদায় নেবে? নাকি কর্মক্ষেত্রে তার কমিউনিস্ট পার্টি সফল হলে তার যৌবন হবে আবার নূতন সূচনা? র‍্যাবো সে তো নয়, যে কবিতার অধ্যায় মুড়ে মরুভূমিতে চলে যাবে সোনা খুঁজতে। আর একটি ছত্রও লিখবে না।

তখন ভাবিনি কীটসের সঙ্গে তুলনা।

আমাদের বর্তমান সমাজ জীবনের প্রতীক এই নবজাতকের অকাল-মৃত্যুর সম্ভাবনা তখন কি মানতে পেরেছি?

এই সেদিন তো তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে জানালুম সুকান্তের অসুখের কথা, অর্থাভাবে তার চিকিৎসা হচ্ছে না শুনে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মর্মাহত হয়ে টাকা তোলার কথা বললেন। যামিনী রায় মহাশয় বললেন ডাক্তার রাম অধিকারীকে তিনি নিয়ে যাবেন, তিনি দিলেন টাকা এবং তাঁর ছেলে অমিয় নিঃশব্দে এনে দিলে এক টিন ওভালটিন।

সুকান্তর কথা বলতে বলতে যামিনীদা বলে উঠলেন, ওর মতো

ছেলেরা সব বাংলাদেশে মরে যাবে, তবে যদি দেশের লোকের যন্ত্রণা কাজে পরিণত হয়। আমাদের উচিত ওকে বাঁচানো, কিন্তু ওরা সব মারা গিয়ে যদি দেশকে বাঁচায়।

সেদিন না হলেও আজকে তাই সুকান্তর মৃত্যুই মেনে নিই, এই অসামান্য কবির, কর্মীর, লাজুক শোভন স্বভাব আমাদের তারুণ্যের প্রতীক সুকান্তর অকালমৃত্যুই। সে যে অতিরিক্ত পরিশ্রম ও অপ্রচুর খাদ্যাভাবে উনিশ বছরে মারা গেল, সে তার দান, কিন্তু আমাদের অক্ষমতার দায়িত্ব। সেই যন্ত্রণা আমাদের জড়তাকে অস্থির করুক।

তার শেষের কবিতা ক'টির তীব্রতা এবং গভীর সারল্য আমার বন্ধুতাকে যেমন মর্মাহত করেছে, তেমনি লেখক হিসাবে আমাকে আনন্দিত ও নতুন করে শ্রদ্ধান্বিত করেছে। না-ই হলো সে বনস্পতি মৃত্যুর আকস্মিকতায়, তবু সে মিশে গেছে বৃহতের দলে, তার নচিকেত কবি স্বভাবের স্বচ্ছ আগুনে।

স্বাধীনতা। ১৮ই মে ১৯৪৭

সুকান্ত

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সুকান্তর যখন বালক বয়স, তখন থেকেই তার কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয়।

আমি তখন স্কটিশ চার্চ কলেজে বি. এ. পড়ছি। 'পদাতিক' বেরিয়ে তখন পুরনো হয়ে গেছে। রাজনীতিতে আপাদমস্তক ডুবে আছি। ক্লাশ পালিয়ে বিডন স্ট্রীটের চায়ের দোকানে আমাদের আড্ডা। কলেজের বন্ধু মনোজ একদিন জোর ক'রে আমার হাতে একটা কবিতার খাতা গছিয়ে দিল। প'ড়ে আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি কবিতাগুলো সত্যিই তার চোদ্দ বছর বয়সের খুড়তুতো ভাইয়ের লেখা। শুধু আমি কেন আমার অন্যান্য বন্ধুরা, এমন কি বুদ্ধদেব বসুও কবিতার সেই খাতা প'ড়ে অবাক না হয়ে পারেন নি।

আমার সন্দেহভঞ্জন করবার জন্যেই বোধহয় মনোজ একদিন কিশোর সুকান্তকে সেই চায়ের দোকানে এনে হাজির করেছিল। সুকান্তর চোখের দিকে তাকিয়ে তার কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে সেদিন কেন আমি নিঃসংশয় হয়েছিলাম, সে বিষয়ে কেউ যদি আমাকে জেরা করে আমি তার সদুত্তর দিতে পারব না।

সে সব কবিতা পরে 'পূর্বাভাস'-এ ছাপা হয়েছে। তাতে কী এমন ছিল যে, প'ড়ে সেদিন আমরা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম? আজকের পাঠকেরা আমাদের সেদিনকার বিস্ময়ের কারণটা ধরতে পারবেন না। কারণ, বাংলা কবিতার ধারা তারপর অনেকখানি ব'য়ে এসেছে। কোনো কিশোরের পক্ষে ঐ বয়সে ছন্দে এমন আশ্চর্য দখল, শব্দের অমন লাগসই ব্যবহার সেদিন ছিল অভাবিত। হালে সে জিনিস প্রায় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

জীবনের অভিজ্ঞতাকে ক্ষমতায় বেঁধে সুকান্ত যখন কবিতার বিদ্যুৎ শক্তিকে কলকারখানায় খেত খামারে ঘরে ঘরে সবে পৌঁছে দিতে শুরু করেছে, ঠিক তখনই মৃত্যু তাকে কেড়ে নিয়ে গেল। আরম্ভেই সমাপ্তির এই শোকে বাংলা সাহিত্য চিরদিন দীর্ঘশ্বাস ফেলবে।

সুকান্ত বেঁচে থাকলে তার অনুরাগী পাঠকদের মধ্যে আমার চেয়ে বড় সমালোচক আর কেউ ছিল কিনা সন্দেহ। এখন ভেবে খারাপ লাগে। সামনাসামনি তাকে কখনও আমি বাহবা দিই নি। তার লেখায় সামান্য ত্রুটিও আমি কখনও ক্ষমা করি নি।

এ প্রসঙ্গ তুলেছি স্মৃতিচারণার জন্যে নয়। পাঠকেরা পাছে বিচারে ভুল করেন, তার যুগ আর তার বয়স থেকে পাছে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে দেখবার চেষ্টা করেন—সেইজন্যে গোড়াতেই আজকের পাঠকদের খানিকটা হুঁশিয়ার ক'রে দিতে চাই।

খুঁত ধরব জেনেও, নতুন কিছু লিখলেই সুকান্ত আমাকে একবার না শুনিয়ে ছাড়ত না। আমি তখন কবিতা ছেড়ে 'জনযুদ্ধ' নিয়ে ডুবে আছি। অফিসে ব'সে কথা বলবারও বেশি সময় পেতাম না। আমাদের অধিকাংশ কথাবার্তা হত সভায় কিংবা মিছিলে যাতায়াতের রাস্তায়। 'কী নিয়ে লিখব'—এটা কখনই আমাদের আলোচনার বিষয় হতো না। 'কেমন করে লিখব'—এই নিয়েই ছিল আমাদের যত মাথাব্যথা।

কিশোর বাহিনীর আন্দোলনে সুকান্তকে টেনে এনেছিল তখনকার ছাত্রনেতা এবং আমাদের বন্ধু অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য। রাজনীতিতে শুক্‌নো ভাব তখন অনেকখানি কেটে গিয়ে নাচ গান নাটক আবৃত্তির ভেতর দিয়ে বেশ একটা রসকষ এসেছে। কবিতাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে আমাদের যেমন রাজনীতির আসরে ঢুকতে হয়েছিল, সুকান্তর বেলায় তা হয়নি। সুকান্তর সাহিত্যিক গুণগুলোকে আন্দোলনের কাজে লাগানোর ব্যাপারে অন্নদারও যথেষ্ট হাতযশ ছিল। সুকান্তর আগের যুগের লোক ব'লে আমি পার্টিতে এসেছিলাম

কবিতা ছেড়ে দিয়ে ; আর সুকান্ত এসেছিল কবিতা নিয়ে। ফলে, কবিতাকে সে সহজেই রাজনীতির সঙ্গে মেলাতে পেরেছিল। তার ব্যক্তিত্বে কোনো দ্বিধা ছিল না।

কিন্তু তার মানে এ নয় যে, আঠারো থেকে একুশ বছর বয়সে সুকান্ত যেভাবে লিখেছিল—বেঁচে থাকলে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেও সেই একই ভাবে লিখে যেত। সুকান্তকে আমি ছোট থেকে বড় হতে দেখেছি ব'লেই জানি, এক জায়গায় থেকে যাওয়া সুকান্তর পক্ষে অসম্ভব ছিল। 'পূর্বাভাসে' আর 'ঘুম নেই'তে অনেক তফাত। তেমনি সুস্পষ্ট তফাত 'ছাড়পত্রে'র প্রথমদিকের আর শেষ দিকের লেখায়।

তাছাড়া কবিতা ছেড়ে সুকান্ত পরের জীবনে উপন্যাসে চলে যেত কিনা তাই বা কে বলতে পারে ? বেঁচে থাকলে কী হত তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনার আজ হয়ত কোনো মানে নেই, কিন্তু কাজে হাত দিয়েই সুকান্তকে চলে যেতে হয়েছে—একথা ভুলে গেলে সুকান্তর প্রতি অবিচার করা হবে।···

ভাবতে অবাক লাগে, সুকান্ত বেঁচে থাকলে আজ তার একচল্লিশ বছর বয়স হত। কেমন দেখতে হত সুকান্তকে ? জীবনে কোন্ অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে সে যেত ? তার লেখার ধারা কোন্ পথে বাঁক নিত ?

অসুখে পড়বার অল্প কিছুদিন আগে একদিন ওয়েলিংটন স্কোয়ারের এক মিটিঙে যাবার পথে আমার এক সংশয়ের জবাবে সুকান্ত বলেছিল : আমার কবিতা পড়ে পার্টির কর্মীরা যদি খুশি হয় তাহলেই আমি খুশি—কেননা এই দলবলই তো বাড়তে বাড়তে একদিন এ দেশের অধিকাংশ হবে।

সেদিনই তর্কে আমি তাকে হারাতে চেষ্টা করেছিলাম। আজ আমাকে মানতেই হবে, একদিক থেকে তার কথাটা মিথ্যে নয়।

গত কুড়ি বছর ধরে সুকান্তর বই বাংলাদেশের প্রায় ঘরে ঘরে স্থান পেয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে তার একটা ছাপা বই থেকে শ'য়ে'শ'য়ে হাতে লিখে নকল করে লোকে সযত্নে ঘরে রেখেছে। তার পাঠককুল ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। সুকান্ত মুখে যাই বলুক, আসলে সে শুধু পার্টির কর্মীদের জন্যেই লেখে নি। যে নতুন শক্তি সমাজে সেদিন মাথা তুলেছিল, সুকান্ত তার বুকে সাহস, চোখে অন্তর্দৃষ্টি আর কণ্ঠে ভাষা জুগিয়েছিল। এ কথাও ঠিক নয়, কাউকে খুশি করার জন্যে সুকান্ত লিখেছিল। তাগিদটা বাইরে থেকে আসে নি, এসেছিল তার নিজের ভেতর থেকে। পাঠকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আসলে নিজেকেই সে কবিতায় ঢেলে দিয়েছিল।

সুকান্ত কি করে কবি হলো

মনোজ ভট্টাচার্য

সুকান্ত একটি অবিস্মরণীয় নাম বাংলা কাব্য পাঠকের কাছে, আর আমরা যারা তার অতি নিকটের—তাদের কাছে অনেক স্মৃতি-বিজড়িত একটি অত্যন্ত প্রিয় নাম। এই নাম সে পেয়েছিল অনেক দিনের হারিয়ে যাওয়া আমার দিদির কাছ থেকে।

এই শতকের বিশ দশকে বাংলা দেশের অত্যন্ত খ্যাতিমান সাহিত্যিক 'রমলা'-রচনাকার মণীন্দ্রলাল বসু ছিলেন আমাদের তখনকার যৌথ পরিবারের তরুণদের সবচেয়ে প্রিয় লেখক। তাঁর একটি গল্প—'সুকান্ত' আমাদের সকলের সবচেয়ে প্রিয় গল্প। সেই সময় আমাদের কাকীমার একটি পুত্রের জন্ম হলো। আমার দিদি প্রিয় গল্পের নায়কের নাম অনুসরণ করে তাঁর সদ্যোজাত ভাইয়ের নাম রাখলেন 'সুকান্ত'। গল্পের সুকান্তর মৃত্যু হয়েছিল যক্ষ্মা রোগে। কী আশ্চর্য! আমার দিদির মৃত্যুর ষোলো বছর পরে আমাদের সুকান্তর মৃত্যুও যক্ষ্মা রোগেই হলো।

কাব্য জগতে সুকান্তর নাম আজ এক স্বীকৃত সত্য। কিন্তু কী করে এটা হলো ভাবতে আজ অবাক হতে হয়। ১৯৩৫ সালে আমরা বাড়ীর সবাই হাওয়া বদল করতে যাই সাঁওতাল পরগণার জসিডিতে। সঙ্গে ছিল সুকান্তর প্রায় সমবয়সী আমার মামাতো বোন রমা। হঠাৎ একদিন দেখি একটি খাতার পাতায় ছড়ার আঙ্গিকে লেখা সুকান্তর কবিতা :

রমা রানী দুই বোন, পরীর মতন,
সবে বলে মেয়ে দুটি লক্ষ্মী কেমন।
দুই বোন রমা রানী—
সবে করে কানাকানি,

তুই বোন হবে ভালো,
করিবে যে ঘর আলো,
সীতার মতন।

রমা আমার মামাতো বোন। আর রানী বহুবর্ষ পূর্বের মৃতা দিদি। যতদূর মনে পড়ে এই ছড়াই সুকান্তর প্রথম কবিতা।

তার কিছুদিন পরে কলকাতায় বেলেঘাটার বাড়ীতে সুকান্ত দেখালো তার কবিতা :

ভগবান
গাহি তব গান।
তোমার দয়াতে জল ও বায়ু
তোমার দয়াতে পেয়েছি আয়ু···ইত্যাদি।

শেষ দুটি লাইন হল :

তোমার মহিমা কতো কব আর,
এইখানে গান শেষ আমার।

এই কবিতা সুকান্ত আমার পিতৃদেবকে [তার জেঠামশাই] শুনিয়েছিল এবং আমার পিতৃদেব তাঁর দশবছরের ভ্রাতুষ্পুত্রের কাব্য প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েছিলাম।

তারপর অনেকদিন পরের কথা—১৯৩৯ সাল। আমি স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়ি। গরমের ছুটিতে সুকান্ত আমাদের শ্যামবাজারের বাড়ীতে ছিল। এই সময় আমি কিছু কবিতা লিখি এবং আমার কবি ভাইকে একান্তে সেগুলো মাঝে মাঝে পড়ে শোনাই। সেই সময়েই একবার সে আমাকে বলে—রোমান্টিক কবিতা না লিখে সাধারণ মানুষকে নিয়ে কবিতা লেখনা কেন? আমি লিখলাম রিকসাওয়ালার ওপর আর সুকান্ত তার অঙ্গসজ্জা করলো রিকসাওলার ছবি এঁকে। এই সময় সুকান্ত মাঝে মাঝে কবিতা লেখে। সেগুলো পরে তার 'পূর্বাভাস' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

১৯৪০ সালে আমার এক সহোদর দাদার বিবাহ হয়। আমার

এক বন্ধু ঐ বিয়েতে নতুন বৌদিকে উপহার দেয়—হীরেন মুখোপাধ্যায় ও আবু সইয়দ আইয়ুব সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা'। সেই বইয়ের কবিতাগুলি আমার পৃথিবীকে এক অনির্বচনীয় মাধুর্যে ভরে দিল। আধুনিক কবিতার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় এই বইয়ের মাধ্যমে।

বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন—এঁদের কবিতা যেন এক নতুন আলোর ঝলকানি। সুকান্ত তখন বেলেঘাটায় তাদের বাড়ীতে। একদিন সকালে চলে গেলাম এবং ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এলাম আমাদের শ্যামবাজারের বাড়ীতে, আর হাতে তুলে দিলাম একটি নতুন আবিষ্কার—'আধুনিক বাংলা কবিতা'। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সুকান্ত সেই বই নিয়ে রইল তিন-চারদিন।

ইতিমধ্যে আবিষ্কার করলাম আমাদের নতুন আবিষ্কৃত প্রিয় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় আমাদের কলেজেই পড়েন এবং আলাপ করতে দেরী হলো না। তারপরেই সুকান্তকে সেই খবর দিয়ে অবাক করে দিলাম। সেই থেকেই সুকান্তর স্বপ্ন—সুভাষকে দেখবে, আলাপ করবে।

একদিন সুকান্তকে আসতে বললাম আমাদের কলেজের চায়ের দোকানে। সেখানে আমরা চায়ের পেয়ালার নিমগ্ন। কবি সুভাষও ছিলেন সেখানে। হঠাৎ সুকান্তকে দেখা গেল সেই চায়ের দোকানের সামনে আর সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে হলো ওর প্রথম পরিচয়। সুকান্ত ছিল অত্যন্ত মুখচোরা। সুভাষের মত প্রথম সারির কবির সঙ্গে সুকান্ত একটাও কথা বলতে পারেনি—বিস্ময়ে মূক হয়ে গিয়েছিল।

তার কয়েকদিন পরে একটি সুদৃশ্য খাতায় লেখা কয়েকটি কবিতা সুকান্ত আমায় পড়তে দিল। তার মধ্যে "বৈশম্পায়ন" কবিতাটি ছিল। এই কবিতার গভীরতা এবং ছন্দমাধুর্য আমাকে বিস্ময়ে হতবাক করেছিল। আমি তড়িৎ সেই খাতাখানা দিলাম কবিবন্ধু

সুভাষকে। আমার ভাই সুকান্ত যে একটি বিস্ময় তা তাকে না জানিয়ে পারছিলাম না।

সে খাতাখানা সুভাষের হাত থেকে গেল কবি দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের হাতে এবং তারপরে বুদ্ধদেব বসুর কাছে। এঁরা দুজনে প্রথমে বিশ্বাসই করলেন না যে এই লেখা এক চোদ্দ বছরের কিশোরের! এই খাতার সব কবিতাই পরে 'পূর্বাভাস' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত হয়েছে।

এর পরে ১৯৪০ থেকে ১৯৪৭-এ তার মৃত্যু পর্যন্ত তার কাব্য-পরিক্রমা বিভিন্ন পথে চলেছে। যদিও সে আমার অনেক ছোটো ভাই—তবু সেই সময় সুকান্তই ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় কবি। যখন তার কবিতা 'একদিন আমার জীবনে বসন্ত এসেছিল' 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হলো—সুকান্তর সে কী আনন্দ! কাব্য-জীবনের প্রথম স্বীকৃতি। যখনই কোনো কবিতা লিখেছে—আমাদের বাড়ীতেই হোক, বা বেলেঘাটায় ওদের বাড়ীতেই হোক—প্রায় সব সময়ই তার প্রথম পাঠক আমি এবং পড়েই উচ্ছ্বাস। সুকান্তর এটা কিন্তু পছন্দ হতো না। কেন আমি Critical হই না, এই ছিল ওর অভিযোগ।

তখনও সুকান্তর স্বীকৃতির ব্যাপ্তি ছিল সীমিত। নানা পত্রপত্রিকায় তার কবিতা সবে প্রকাশ হতে শুরু করেছে। ওর সমস্ত কবিকৃতির মধ্যে আমার কাছে কিন্তু বিস্ময় হয়ে আছে আমাদের বাড়ীর দেয়ালের নানান জায়গায় অত্যন্ত সংগোপনে লেখা ওর কবিতা-গুচ্ছ। যার মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে আছে :

আঁধিয়ারে কেঁদে কয় স'ল্‌তে
চাইনে চাইনে আমি জ্বল্‌তে।

এই দু'টি লাইনই যেন ওর মর্মবাণী।

তারপরে ১৯৪৭-এর ১২ই মে আমরা যখন সবাই ঘুমন্ত—সুকান্ত 'মিশে গেল বৃহতের দেশে।'

আমার কাছে সুকান্ত

সরলা বসু

প্রথম-প্রথম সুকান্ত আমার সঙ্গে কথা বলতো না। আমি তো তখন জানি নে ছোটো করে কথা বললে ও অমনি শুনতে পায় না। আমি কত কি ভাবতাম।

অরুণাচলের সঙ্গে ও রোজ আসতো। ওদের গল্প-গুজব সৌহার্দ্য আমি লক্ষ্য করতাম কিছুটা দূর থেকেই। তারপর এক-আধটু করে ওর সঙ্গে সবে আলাপ হয়েছে, এমন সময় এলো সেই বোমা পড়বার ভয়ে কলকাতা থেকে প্রাণ নিয়ে পালাবার দিন।

আমিও পাঁচ বছরের পাতানো ডেরাডাণ্ডা নিয়ে বিদায়ের জন্যে সবে প্রস্তুত হয়েছি, এমন সময় সুকান্ত এসে আমার কাছে নানারকম দুর্ঘটনার গল্প শুরু করে দিলো: কলকাতা থেকে যাবার পথে কার নাকি ডাকাতে গহনা-টাকা সব কেড়ে নিয়েছে, কাকে নাকি খুনও করেছে।

ঠিক যাবার মুখেই এই সব আতঙ্কের খবর শুনে ওর উপর বেশ কিছুটা রাগও হয়েছিলো সেদিন।

তারপর ওর মৃত্যুর বহু বর্ষ পরে অরুণাচলকে লেখা সেই বোমা-পড়া দিনের একটা চিঠি দেখলাম: সেদিন আমাকে ওর মন কিছুতেই ছেড়ে দিতে চায়নি।···ওর ভয় দেখানোর রহস্যটা যদি সেদিন জানতাম, তা হলে কি ওর ছোট্ট কোমল মনটাকে ব্যথা দিয়ে অমনি করে চলে যেতে পারতাম!

দেশ থেকে ফিরে ওর সঙ্গে যখন আবার দেখা, তখন আমাদের মা-ছেলের খুব ভাব হয়ে গেছে। ও সারাদিন প্রায় আসা-যাওয়া করতো। প্রতি সন্ধ্যায় আমরা কত গল্পই যে করতাম। নিজেদের লেখা গল্প পড়া-পড়িও হতো সান্ধ্য-বৈঠকে।

সুকান্তকে একদিন নিমন্ত্রণ করেছিলাম। ও খেয়ে যখন যাচ্ছে, দেখি ওর ফরসা কাপড়টার ভাঁজে-ভাঁজে সুরকির গুঁড়ো মাখা।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ও কি সুকান্ত ?

ও অতি বিনয়ের সঙ্গে মুখ নিচু করে বললো, ও রাস্তা থেকে লেগে গিয়েছিলো।

মাঝে মাঝে সুকান্ত বড় নম্র ও বিনয়ী হতো।

ও তখন বেলাঘাটার দেশবন্ধু স্কুলে পড়ে। কি ক্লাশ ঠিক মনে নেই। আমি ওর পরীক্ষার খবর জানতে চাইলাম।

সব নম্বর বললে, অঙ্কের নম্বর বাদে।

আমি নাছোড়বান্দা। অঙ্কের নম্বর জানতে চাইলাম।

ও মুখ নিচু করে বড় বিনয়ের সঙ্গে ছোট্ট গলায় বললো, ফাইভ।

তের শো পঞ্চাশের মাঘ মাস। বাড়ীর অভাবে বেলেঘাটা মেন রোডের এক মাঠকোঠায় বাসা নিলাম। ও কিন্তু তখন আসতো অনেক দূর—ওদের নারকেলডাঙার বাড়ী থেকে।

—সেই মাঠকোঠায় তিনটি বছরের ওর অনেক স্মৃতি ধরা আছে মনের পাতায়।

অরুণাচল অনেক সময় বাসায় থাকতো না। ও আমার কাছেই বসতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ওর নিরুদ্বিগ্ন শান্ত স্বভাবটি বড় ভালো লাগতো।

আমার মেয়ে নাচতো। তার জন্য কাব্যে নৃত্য-কথিকা রচনা করতাম। সুকান্ত আমাকে তাই দেখে গদ্য-কবিতা লেখা শেখাবেই। নানারকম উপদেশ, কতরকম লেখানো-পড়ানো।...

আমার লেখা এমনি একটি নৃত্য-কথিকা কবিতা করে সাজাবার জন্য সুকান্ত নিয়ে গেলো। কিছুদিন পরে ভাবলাম—ও মনভোলা মানুষ, হয়তো ছেঁড়া কাগজের টুকরোটুকু হারিয়ে ফেলেছে।

একদিন হঠাৎ এসে ওর হাতের সেই সুন্দর করে সাজানো লেখাটি

ফেরত দিয়ে গেলো। আজো সেই লেখাটি তেমনই আছে আমার কাছে।

সুকান্তর একটি বিশেষ পোশাক ছিলো। সেটি প'রে প্রায়ই শ্যামবাজার বা বাইরে কোথাও যেতো। নইলে কোঁচায়-সুরকি, ময়লা, নীল জামাতেই চলতো।

একবার সুকান্তর 'অভিযান' নাটকটি অভিনয় হবে ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন হলে। বেলেঘাটার ছোটো-ছোটো ছেলে-মেয়েরা অভিনয় করবে। আমাকে যাওয়ার জন্য ও বলে গেলো।

সেদিন আমি আবার করেছি তালের পিঠে। খাওয়া-দাওয়া সেরে তালের পিঠে বার্লির কৌটোয় ভরে নিয়ে অরুণাচলের সঙ্গে চললাম ওদের নাটক দেখতে।

গেটের সামনেই সুকান্তকে পাওয়া গেলো। সেই বিশেষ পোশাকটি পরা ওর আনন্দিত কিশোর মূর্তি।—তালফুলুরি খাওয়ালাম ওকে।

নাটিকাটি বেশ সুন্দর অভিনয় হয়েছিলো সেদিন। ওর সেদিনের খুশি-উজ্জ্বল মুখখানি এখনো বুকের মধ্যে পুরে রেখেছি।

তারপর অরুণাচল-সুকান্ত আমাকে নিয়ে আসছে বেলেঘাটায়। রাস্তায় বাস বদল করবো। দাঁড়িয়ে আছি। একটি থেমে-থাকা বাসের পিছনে ওরা জানি কি কিনতে চলে গেলো।

অনেক সময় হয়ে গেলো, ওরা আসছে না। আমার একটু কৌতূহল হলো ওরা কি করছে দেখবার জন্য। বাসের জানলা দিয়ে দেখি ছোট্ট-ছোট্ট লুচির মতো কি জানি কাঠি ফুঁড়ে একজন বিক্রেতা দিচ্ছে ওদের হাতে। ওরা আনন্দের সঙ্গে খাচ্ছে সেগুলি। বুঝলাম, জিনিসগুলির দাম বড় জোর দু'পয়সা-চারপয়সা।

কিন্তু যে খুশি-ভরা মুখ দু'খানি দেখেছিলাম সেদিন, তার দাম লাখ টাকারও বেশি।

এমনি করেই দুটো-চারটে পয়সা দিয়ে দুই বন্ধুতে হৃদ্যতা হতো। পয়সা তো ওদের ছিলো না সেদিন।—অবশ্য সেদিনের সেই বস্তুটির নাম শুনেছিলাম শেষ পর্যন্ত—'ফুচ্‌কি'।

তোমরা সবাই ভাবো সুকান্ত খুব লক্ষ্মী ছেলে। খুব শান্ত। কিন্তু তার রাগ দেখনি তো কোনদিন। ও বাবা! সে দেখেছিলাম আমি একবার।

কি জানি অরুণাচল ওর নিষেধ-করা কি কথা বলে দিয়েছিলো কার কাছ। আর যায় কোথা! ও রাগ করে আমাদের বাড়ী থেকে চলে যাবেই। কত খোসামোদ যে করতে হয়েছিলো সেদিন।

সারাদিন বালতি-বালতি জল ঢেলে মাথা ধোয়াই। দুটি-দুটি মুড়ি মেখে-মেখে খাওয়াই, আর একটু থামে; আবার একটু পরে রেগে-রেগে ওঠে। এমনি করে সারাটা দিন ওর খাওয়া-নাওয়াই হলো না। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঘাট-কবুর মেনে তবে সন্ধ্যায় সে-রাগ পড়ে।

এই তো গেলো রাগী সুকান্ত। সংসারী সুকান্তকে চাক্ষুষ দেখেনি কেউ। আমি দেখেছি কিন্তু।

অরুণাচল-সুকান্ত কবিতা লিখতো বলে ওদের দিয়ে যে সংসারের কোন কাজই হবে না, এই ছিলো সবার ধারণা। অবশ্য আমি যে সে-দলের কেউ নই, তা কিন্তু ভেবো না তোমরা।

একদিন বেলাবেলি বিকেলের রান্না চাপিয়েছি মাঠকোঠার উপর তলায়। হঠাৎ কারা জানি ঠুং-ঠাং ঘট্-ঘট্ শব্দ করতে-করতে বাড়ীর ভেতর ঢুকে গেলো। আবার উপরেও উঠে এলো।

চেয়ে দেখি সুকান্ত। ওর দুই হাতে, কাঁধে, মাথায় ঘটি-বাটি, হ্যারিকেন লণ্ঠন, দু'চারটে গেলাস—সব নিয়ে অন্তত পনেরো-কুড়িটা হবে। অরুণাচলের মাথায় ও কাঁধে হাতে—বরিশালের বড়-বড় ঘটি, নানারকম গেলাস, বাটি ইত্যাদি।

আমি বললাম, কী ব্যাপার, সুকান্ত ?

সুকান্ত গম্ভীরভাবে উত্তর দিলো, এগুলি মেরামত করতে দিতে হবে। খুব অসুবিধা হচ্ছে কিনা। …বোঝো, কী সংসারী ছেলে সুকান্ত।

আর এক সুকান্তকে দেখবে তোমরা ?

ভাইফোঁটার দিন আমার মেয়ে বসে আছে সকাল থেকে—সুকান্তকে ভাইফোঁটা দেবার জন্য। অরুণাচল তো সুকান্তকে খবর দিয়ে এসেছে কোন্ সকালে।

বেলাও অনেক হলো। বারোটা-একটা। এর মধ্যে সুকান্ত হন-হন করে ঢুকলো এসে ঘরের মাঝখানে, যেখানে সবাই খাওয়া দাওয়া করছিলো।

আমি বললাম, সুকান্ত, কী ব্যাপার বলো তো ?

ও হেসে উত্তর দিলো, রান্না করলাম।

আমি রান্নার সামগ্রী জানতে চাইলাম।

ও বললে, ডালনা—আলু-পটলের ডালনা। এই রান্না করে, স্নান করে খেয়ে এলাম, তাই বেলা হলো।—স্বরে কুণ্ঠার রেশ।

ওর তৈলসিক্ত স্নাত মূর্তিটি দেখে বললাম, সুকান্ত, তোমার রান্নার পরে তেল আর কতটুকু ছিলো বলো তো ?

সমস্ত মাথা ভর্তি তেল জবজব করছে। সিঁথিটি কাটা। সমস্ত কপালের উপরে তেল বেয়ে-বেয়ে আসছে। সবাই ওর মূর্তি দেখে হেসেই খুন।

আমি কিন্তু হাসতে পারিনি সেদিন। বুকের ব্যথায়, চোখের জলে মাতৃহীনের কর্ম-ক্লান্ত মুখখানা এঁকে রেখেছি।

কতদিনের কত কথা। কতোটুকুই বা মনের কোঠায় ধরে রাখতে পেরেছি।

ভাদ্র মাস হবে। প্রথম দাঙ্গা বাধবার কয়েকদিন আগে। মাঠকোঠার উপরে বসে নারকোল-নাড়ু তৈরি করছি। নীচের একটি

ঘরে অরুণাচল আছে। আমি একটু দুষ্টুমি করবার জন্য একটি ছোটো রবারের বলের মতো নারকোল-নাড়ু তৈরি করে নেমে গেলাম। যেয়ে দেখি অরুণাচল চেয়ার-টেবিলে বসে কি আঁকছে আর সুকান্ত তক্তাপোশের উপর চুপচাপ বসে আছে।

সুকান্ত যে কখন এসেছে আমি কিছুই জানি না। আমি নারকোল-নাড়ুটি সুকান্তর হাতেই দিলাম। ও পরম আগ্রহে নিয়ে খেতে লাগলো। এমনি সাগ্রহে ওকে কোনো খাবার নিতে দেখিনি কোনোদিন।

অরুণাচল মুখ বাঁকালো—ওর হজম হয় না বলে কিছুই খেতে দিতে চায় না।

আমার হাতে সুকান্তকে দেওয়া এই শেষ খাবার।

আমি মাঠকোঠা ছেড়ে রাস্তার ও-পাশের একতলা বাড়ীটা ভাড়া নিলাম। প্রথম দাঙ্গার পরে দ্বিতীয় দাঙ্গা শুরু হলো ওই বাড়ীটায় যাওয়ার পর। 'আল্লা হো আকবর', 'বন্দেমাতরম্' মুখরিত তখন কলকাতা শহর। যত না দাঙ্গায় মরছে মানুষ, তার চেয়ে বেশি মরছে মিলিটারির গুলিতে।

বেড়াল-কুকুরের মতো রাস্তায়, অলিতে-গলিতে মৃতদেহ। ভয়ে পালিয়ে গেলাম বেলেঘাটার দেশবন্ধু হাই স্কুলে।

পরে দাঙ্গার অবস্থা তখন কিছুটা শান্ত। আমরা আবার বাসায় ফিরবো মনস্থ করছি, এমনি দিনে সুকান্ত এলো। 'রেড-এড কিওর-হোমে'র হাসপাতাল থেকে বাড়ী যাওয়ার পথে আমাদের সঙ্গে দেখা করে গেলো।—রোগা, পা-জামা পরা ঢেঙা চেহারা। মুখখানা একফালি লম্বা, বিবর্ণ।

এই আমার ওকে শেষ দেখা।

আমরা দেশবন্ধু স্কুল থেকে বাড়ীতে ফিরলাম। তখন দাঙ্গা থেমে গেছে কিন্তু সন্ধ্যা ছ'টা থেকেই কারফিউ। এই সান্ধ্য-আইনের জন্য বেলা থাকতে বেলঘাটা মেন রোডে গতায়াত বন্ধ।

কি জানি, কি রান্না নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত আছি। দরজায় যেন কে মৃদু কড়া নাড়লো। খানিকক্ষণ চুপচাপ। তখনো আমাদের বাড়ীর লোকেরা ঘরে ফেরেনি। কড়া নাড়াটা ভালো মনে করলাম না। অনেক সময় দুষ্টু ছেলেরা অমনি কড়া নাড়তো।

আবার ছোট্ট কড়া নাড়ার শব্দ। এবার আমার মেয়ে দরজা খুলে দিলো। কে যেন খুব ছোট্ট গলায় কি বললে, তারপর বাইরের ঘরটায় এসে ঢুকলো।

একটু পরেই কিন্তু আমার মেয়ে আবার দরজা বন্ধ করে ফিরে এলো।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কে ?

ও বললে, সুকান্তদা।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, আমার সঙ্গে দেখা করে গেলো না ?

ও উত্তর দিলো, সুকান্তদার শরীর খুব খারাপ, মা। দাদাকে একটা চিঠি লিখে রেখে গেলো।

ফাল্গুনের প্রথম। আমি দেশে যাচ্ছি। অরুণাচল একটা পোষ্টকার্ড ধরলো আমার কাছে : মা, সুকান্তকে চিঠি লেখো, ওর বড় অসুখ। ও শ্যামবাজার গেছে।

এতদিন ওকে বাবা বলেই ডাকতাম। লিখলাম, 'আজ মায়ের দাবি নিয়েই তোমার রোগশয্যার পাশে যেতে মন চাইছে, বাবা।'···

তারপর দেশে গিয়ে আর একটা চিঠি দিলাম শ্যামবাজারের ঠিকানায়। ও উত্তর দিলো। আমিও জবাব দিলাম। ও তার উত্তর দিলো যাদবপুর যক্ষ্মা-হাসপাতাল থেকে।

কিন্তু আমি আর তার উত্তর দিইনি ইচ্ছে করেই। বুঝেছিলাম, চিঠি দিলে ও তার উত্তর দেবেই। কিন্তু ওর বড় কষ্ট হবে।

যাদবপুর থেকে লেখা আমার কাছে ওর সেই শেষ চিঠি।

তারপর 'স্বাধীনতা' পত্রিকার মারফত পেলাম ওর সংবাদ !

যাদবপুর হাসপাতালে অরুণাচল ওর সঙ্গে দেখা করতে যেতো।

তাই আমি লিখেছিলাম, 'টি. বি. হাসপাতালে একটু সাবধান হয়ে যাস।'

অভিমানী অরুণাচল শক্তিশেলটুকু পাঠালো চিঠির মারফতে :

'মা, অযত্ন-পালিত, মাতৃহারা ছেলেটি আজ চলে গেছে। টি. বি. হাসপাতালে আর যেতে হবে না।...

তারপর একদিন আমিই এলাম যাদবপুরে।

এত বছরের ভ্রাম্যমান জীবনে যত জায়গায় ঘুরেছি সেখানেই আমার সুকান্ত। শুধু আসেনি যাদবপুরের এই নতুন বাড়ীতে। তবু এখানকার বাতাসেই মিশে আছে তার সুকোমল, প্রদীপ্ত নিঃশ্বাস। আর ঐ নীল ঘন আকাশে ফুটে আছে কিশোর কবির অন্তহীন চাহনি।

কবি-কিশোর সুকান্ত

সুকান্তর অঙ্গীকার

অজিত দত্ত

সুকান্ত ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিলো না। কিন্তু তবু তাঁর মৃত্যু-সংবাদে আত্মীয়-বিয়োগের দুঃখ পেলাম।

কেননা আমাদের মতো লোক, যাদের জীবনে সাহিত্য, বিশেষত কবিতাই সবচেয়ে বড়ো জিনিস, তাদের পক্ষে একজন অসামান্য প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন তরুণ কবির মৃত্যু-সংবাদের চেয়ে শোকাবহ আর কী হতে পারে?

সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা বিচ্ছিন্নভাবে সাময়িক কাগজে কয়েকটি পড়েছিলাম এবং পড়ামাত্রই জেনেছিলাম, এখানে আছে শক্তি। সাধারণত এইরূপ বিচ্ছিন্নভাবে পড়ে কোনো কবিরই রচনার উৎকর্ষ বোঝা যায় না; রচনাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত কবির প্রকৃত শক্তির পরিচয় পাওয়া শক্ত। তা সত্ত্বেও কয়েকটি মাত্র কবিতা পড়েই যখন সুকান্ত ভট্টাচার্যের রচনা সম্বন্ধে কৌতূহল জাগলো, তখন বুঝলাম—এখানে রয়েছে অসাধারণ প্রতিশ্রুতি।

তারপর থেকে সুকান্তর কবিতা যতোই পড়েছি, ততোই এ বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে।

বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে শক্তিশালী নবাগতদের সংখ্যা খুব বেশি বলে মনে হয় না। সেজন্য সামান্য বয়সে সুকান্তর মৃত্যু বাংলা সাহিত্যের পক্ষে আরো বড়ো দুর্ভাগ্য।

আমরা যেহেতু প্রত্যেকেই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীব, সেহেতু কতকগুলি ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক মতামত ও বিশ্বাস আমাদের প্রত্যেকের পক্ষেই থাকা স্বাভাবিক। আমরা যদি লেখক হই, তবে আমাদের রচনার মধ্যে তার প্রকাশ হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। কিন্তু অধুনা কোনো রাজনৈতিক মতের জনপ্রিয়তা—এবং

অপর পক্ষে জনবিরাগ হেতু, এরূপ একটা ধারণা প্রচলিত হয়ে উঠেছিলো যে, কোনো বিশেষ রাজনৈতিক মত প্রচারের দ্বারাই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচিত হতে পারে—অথবা সাহিত্য নিকৃষ্টতার গভীরতায় নেমে যায়।

ব্যক্তিগতভাবে এর কোনো মতকেই আন্তরিকভাবে সমর্থন করতে পারিনি। এইরূপ ধারণা এখনো অক্ষুণ্ণ আছে যে, সাহিত্যকে সাহিত্য হিসেবেই বিচার করতে হবে—বৃহত্তর মানবের কল্যাণই তার একমাত্র উদ্দেশ্য। রাজনৈতিক চিন্তা যেখানে সে কল্যাণের বহন করে সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে, তখন অবশ্যই তা বরণীয়। রাজনীতি সমাজনীতি ক্ষণে ক্ষণে বদলায়, যুগে যুগে তার অগ্রগতি। আজ আমরা যাকে সবচেয়ে অগ্রসর রাজনৈতিক চিন্তা বলে মনে করি, কোনো একদিন তাকেও পিছনে ফেলে মহত্তর আদর্শের সন্ধান মানুষ পাবে না, একথা মনে করা পশ্চাদ্বর্তী মনেরই পরিচয়। কিন্তু শিল্পীর যাদুকে স্পর্শ করে সে-চিন্তা পুরানো হলেও মরে না, পৃথিবী সে ভাবধারার প্রয়োজন ভুলে গেলেও শিল্পের জগৎ থেকে কখনো হয় না তার নির্বাসন। তাই,কেবলমাত্র রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার চমৎকারিত্বেই অনেক রচনাকে অভিনন্দিত করতে পারিনি। কোনো রাজনৈতিক মতের সঙ্গে ব্যক্তিগত মতের বিরোধ আছে বলে নয়; বস্তুতঃ সে প্রশ্ন অবান্তর। এটাই মনে হয়েছে যে এখানে সাহিত্য পেলাম না; পেলাম না কাব্য।

আবার অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক-চিন্তা স্রষ্টার যাদু-স্পর্শে সাহিত্য হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়েছে। তাকে মনে মনে অভিনন্দন জানিয়েছি।

এই কথা ক'টি বলার প্রয়োজন হলো এই জন্য যে, সুকান্তর কবিতায় তাঁর রাজনৈতিক মত স্পষ্ট, উজ্জ্বল ও দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। সেটা কাম্য হতে পারে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তাঁর রচনায় আছে সেই শিল্পীর যাদু-স্পর্শ যার দ্বারা সাহিত্য সৃষ্টি হয়। বস্তুতঃ

সুকান্তর রচনার ছন্দ এতো স্বচ্ছন্দ, ভাষা এতো বলিষ্ঠ, রচনা-শিল্প এতো পুষ্ট যে, বয়সের অনুপাতে এরূপ রচনা বিস্ময়কর ও অসাধারণ। তাঁর কবিতা যেটুকু পড়েছি, তার পরিচিতি এখানে দেওয়া অসম্ভব। কারণ, পাঠকের কাছে তার ঔজ্জ্বল্য ও বলিষ্ঠতার আংশিক পরিচয় দিতে হলেও প্রচুর উদ্ধৃতির প্রয়োজন। বৃহত্তর পরিসরে সন্ধানী সমালোচক তাঁর রচনার যোগ্য আলোচনা করবেন সন্দেহ নেই। আমি শুধু কবিগোষ্ঠীর অন্যতম হিসেবে তাঁর কবিতার প্রতি আমার ব্যাক্তিগত শ্রদ্ধা জানাই। তাঁর 'ছাড়পত্র'-এর অঙ্গীকার ব্যর্থ নয় :

চলে যাবো—তবু আজ যতক্ষণ
দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য
ক'রে যাবো আমি—
নবজাতকের কাছে এ আমার
দৃঢ় অঙ্গীকার।
অবশেষে সব কাজ সেরে,
আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
ক'রে যাবো আশীর্বাদ,
তারপর হবো ইতিহাস।

সুকান্ত সত্য-পালন ক'রে গেছেন তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। সেইটেই বড়ো কথা।

স্বাধীনতা। ১৮ই মে ১৯৪৭

'একটি মোরগের কাহিনী' — সুশীল রায়

সমাজের বিভিন্ন স্তরে যেমন নিয়ম আছে, সেই রকম অনিয়মও আছে। ন্যায় নীতি আর নিয়ম—এই নিয়েই তো সংসার। এটা হয়তো অনেকটা মুখের কথা, এটা তেমন কাজের কথা নিশ্চয়ই নয়। যদি কাজের কথাই হতো তাহলে পৃথিবীটা বোধ হয় সোনার সংসারই হয়ে যেত।

আমরা নিয়ম তৈরি করি সম্ভবত সেই নিয়ম লঙ্ঘন করার জন্যই। বুদ্ধি যার আছে তারই আছে শক্তি—একথা অনেকটা বেদবাক্যের মতন সত্য। কিন্তু বুদ্ধি খাটিয়ে শক্তি প্রয়োগ করেন এমন লোকের সংখ্যা কম। যাকে বুদ্ধি বলে তার প্রয়োগ সুষ্ঠুভাবে হলে কোথাও কোনো অনাচার বা অবিচার কখনোই হতো না। কিন্তু ঘটনা ঘটছে অন্যরকম। যে জিনিস প্রয়োগ ক'রে শক্তিমানেরা তাঁদের দাপট দেখিয়ে চলেছেন তা বুদ্ধি নয়, তা হল দুর্বুদ্ধি। প্রকৃত বুদ্ধিমানের হৃদয় বলে একটা পদার্থ থাকার কথা, তাঁদের কাছে সেইজন্যে নিগৃহীত হবার আশঙ্কা কম। কিন্তু দুর্বুদ্ধিমানদের নিয়েই সংসারের এত সমস্যা। তাঁরা নিজের স্বার্থ ছাড়া অন্য-কিছু দেখেন না, সব রকম অন্যায় ও অবিচারের তাঁরা পৃষ্ঠপোষক। দুর্বল ও অসহায়ের প্রতি বিন্দুবিসর্গ মমতা তাঁদের নেই।

আমাদের মনে হয় পৃথিবীর এত অশান্তির মূলে আছে মানুষের লোভ। অন্যকে বঞ্চনা ক'রে, কখনো কখনো লাঞ্ছনা ক'রে, নিজের সার্থসিদ্ধির জন্যে তথাকথিত বলবানদের এই যে অভিযান—এর জন্যেই পৃথিবীতে এত হাহাকার।

সুকান্ত ভট্টাচার্য পৃথিবীর এই পরিহাস নিয়ে অনেক ভেবেছেন। তাঁর জীবন ছিল সংক্ষিপ্ত, অনেক দেখবার বা অনেক ভাববার অবকাশ

তিনি পান নি। কিন্তু যেটুকু পেয়েছেন তাই বুঝি অনেক। সহানুভূতির চোখ দিয়ে তিনি পৃথিবী দেখেছেন, পৃথিবীর মানুষ দেখেছেন। তাঁর একটি কবিতার কথা বলি, এই কবিতাটিতে তিনি তাঁর চিন্তার তাঁর ভাবনার তাঁর সহানুভূতির নির্যাস দিয়ে গিয়েছেন। কবিতাটি হল—'একটি মোরগের কাহিনী'। মোরগটির কোনো আশ্রয় নেই, মস্ত প্রাসাদের এক কোণে ভাঙা প্যাকিং-বাক্সের গাদায় আরও দু-তিনটি মুরগীর সঙ্গে সে একটু জায়গা ক'রে নিল। তার হয়তো মনে হয়েছিলো যে, বেশ নিরাপদ আশ্রয় সে পেয়ে গিয়েছে। কিন্তু এ আশ্রয় কি সত্যিই তার পক্ষে নিরাপদ? এখানে সে আছে, কিন্তু এখানে তার কোনো আহার নেই। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে আপত্তি জানায় গলা ফাটিয়ে—কিন্তু অটল ইমারতে কোনো ফাটল ধরে না, কোনো সহানুভূতির ইঙ্গিত পায় না সে এখানে। আস্তাকুঁড়ই তার ভরসা, সেখানে আরম্ভ হল তার যাতায়াত। এখানে প্রচুর খাদ্য মিলল তার। ফেলে দেওয়া অনেক ভাত-রুটির সমারোহ। খুশিই বুঝি সে হয়েছিল। কিন্তু এখানে দেখা দিল তার প্রতিযোগী, মানুষের মতন দেখতে কতকগুলি জীব, শরীরে তাদের ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়ার আবরণ। শক্তিমান এই জীবের কাছে হেরে গেল দুর্বল মোরগ। আহার তার বন্ধ হল।

কিন্তু ক্ষুধা তার বন্ধ হয় নি। অন্বেষণ তাই তার আছেই। সে খাবার খোঁজে। আহারে পরিপূর্ণ ঐ প্রাসাদে ঢুকবার চেষ্টা ক'রে বিফল হয়, তাড়া খেয়ে পালিয়ে আসতে হয়। পালিয়ে আসতে হয় হয়তো প্রাণের মায়ায়।

কিন্তু প্রাণ কি তার শেষ পর্যন্ত টিকল? একদিন সে প্রবেশ করল ঐ প্রাসাদে—নতুন রূপে, নতুন স্বাদ নিয়ে। 'ধবধবে সাদা দামী কাপড়ে ঢাকা খাবার টেবিলে' ঘটল ঐ মোরগের আবির্ভাব।

সংসারের লোভ, সংসারের অনিয়ম, সংসারের ব্যাভিচার, সংসারের

দয়ামায়াহীনতা, এবং পরস্পরের মধ্যে খাদ্যখাদক সম্পর্কই হাজার রকমের মর্মপীড়ার কারণ।

সুকান্তর সহানুভূতি ও মমত্ববোধ একত্র মিলিত হয়ে এই একটি কবিতার মধ্যেই যেন অনেক কথা বলতে পেয়েছে বলে মনে হয়। এই জন্যই এই কবিতাটি নিয়ে কয়েকটি কথা বলা হল। কিন্তু সব কথা বোধ হয় বলা হল না।

যে মোরগের কথা সুকান্ত বলেছেন, সেটি হয়তো সংসারের অসহায় জীবদের একটি প্রতীক মাত্র। ঐ মোরগের জীবনই হচ্ছে আসলে এ কালের প্রকৃত জীবন। তার কথা বলেছেন সুকান্ত সহজ অথচ মর্মস্পর্শী বর্ণনায়। তাই ঐ মোরগের উপর এবং তার জীবন-কাহিনীর প্রতি আমাদের এই মমতা।

সুকান্ত-স্মৃতি

অন্নদাশংকর ভট্টাচার্য

সুকান্তর সাথে প্রথম দেখা কবে কোথায় হয়েছিল আজ আর মনে নেই। তবে যতদূর মনে পড়ে ১৯৪২-এর কোনো এক সময়। তখন থেকেই আমরা পরস্পরের খুব কাছাকাছি আসিতে থাকি। বিশেষভাবে ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৬ আমি বাংলাদেশের তৎকালীন ছাত্র-আন্দোলনের প্রথম সারিতে। সুকান্তও ছাত্র-ফেডারেশনের একজন কর্মী। কিন্তু প্রথম থেকেই লক্ষ্য করেছিলাম—ও একটু অসাধারণ, আর পাঁচজনের মত নয়। এই অসাধারণত্ব ওর চলনে-বলনে ও কবিত্ব শক্তিতে। এই শক্তির পরিচয় প্রথম থেকে পেয়েছিলাম বলেই ঝাণ্ডা নিয়ে ছুটোছুটি করার জন্য আমরা ওকে কখনও তাড়া লাগাইনি। বরং সময় ও সুযোগ করে দেবার চেষ্টা করেছি। উৎসাহিত করার প্রয়াস করেছি যাতে ও ভাবতে পারে, লিখতে পারে। শেষের দিকের ওর অনেক রচনাই আমাদের তৎকালীন ছাত্র কমিউনের ঘরে বসে লেখা। এ কারণেই বোধহয় আমাদের সাথে ওর ঘনিষ্ঠতা দিনের পর দিন গভীরতর হয়েছে।

সুকান্তকে যে কতোখানি গভীরভাবে ভালোবাসতাম তা সত্যিই ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। শেষের দিকে এমন হতো যে একদিন ও না এলে বা ওকে না দেখলে ভীষণ মন খারাপ লাগত। এর একটা অব্যক্ত কারণও ছিল। আজকের সামাজিক পরিবেশে তা অবিশ্বাস্য। কিন্তু আজ থেকে তিরিশ বছর আগে তা' ছিল নিষ্ঠুর বাস্তব। আমার পারিবারিক পটভূমিকা ছিল নিতান্ত সেকেলে, রক্ষণশীল ও চূড়ান্ত সনাতনী। বাবা বাংলার মফঃস্বলে এক স্বনামধন্য রাজ-পরিবারের রাজ-পণ্ডিত। দাদা বিখ্যাত নৈয়ায়িক। রক্ষণশীলতায় সকলেই এত উগ্র যে ইংরেজী শিক্ষা দিলে 'ম্লেচ্ছ' ও 'বিজাতীয়' হবার ভয়ে ছোটবেলা থেকেই আমাকে সংস্কৃত পণ্ডিতের টোলে পড়ান হতে থাকে।

একই উদ্দেশ্যে বাড়ী-ছাড়া ও দেশান্তরী করা হয়। বারো বছরে পা দেবার সাথে সাথেই বারাণসীধামে নিয়ে যাওয়া হল দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর দণ্ডী ব্রহ্মচারী জীবন যাপন এবং বেদ-বেদান্ত পাঠ, অভ্যাস ও চর্চা করার জন্য। এই পরিবেশ থেকে পালিয়ে এখানে-ওখানে কাটিয়ে রাজনীতির সংস্পর্শে আসি এবং প্রাইভেটে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে কলকাতায় হাজির হই। কলেজে পড়ার সময় আন্দোলনের তালে ছুটতে ছুটতে একদিন গিয়ে দাঁড়ালাম তখনকার তরুণ কমিউনিস্টদের পাশে কমিউনিস্ট পার্টির পতাকাতলে। বারাণসীর গঙ্গাতীরবর্তী ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকে একেবারে কলকাতার চিৎপুর রেল-ইয়ার্ডের শ্রমিক-বস্তীতে বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টির গোপন দপ্তরে। কমিউনিস্ট পার্টি আমাকে বদ্ধঘরের আগল ভেঙে মুক্তমাঠে পেঁাছে দিল, যেখানে আমি সহস্রমানুষের মাঝেও নিজেকে খুঁজে পেলাম। বিপ্লবী আন্দোলনের জঠরে এ আমার প্রকৃতই নবজন্ম। আমার মত একই নিষ্ঠাবান বৈদিক ব্রাহ্মণ পরিবারের পরিবেশ থেকেই এসেছিল সুকান্ত। ঐ পরিবেশের চারদেয়ালে গতানুগতিকতার বেড়াজালে আটকে থেকে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে রাজী হয়নি। তাই প্রচণ্ড মানসিক সংগ্রাম করতে হয়েছে তাকে কৈশোরের সুরু থেকেই। পথ খুঁজে বেড়াতে হয়েছে এখানে সেখানে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাজির হল লড়াই-এর ময়দানে কমিউনিস্ট শিবিরে। এখানেই পেল লক্ষ জনতার মাঝে নিজেকে প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠার সুযোগ। বিপ্লবী আন্দোলনই তার সুপ্ত সৃজনী প্রতিভাকে জাগিয়ে দিল। এসব কারণেই একই পথের যাত্রী হিসেবে, চলার পথের সাথী হিসেবে সুকান্তর সাথে আমার ছিল এতো নিবিড়তা. এতো ভালোবাসা।

২

সুকান্ত কলেজের সীমানা কখনো ছোঁয়নি। নানা কারণে স্কুলের সীমানা পার হওয়াও ঘটে ওঠেনি। আর পাঁচজনের মত স্কুলের পড়ায়

ওর তেমন মন ছিল না। স্বভাবতঃই অভিভাবকরা এতে অসন্তোষ প্রকাশ করতেন। ফলে মাঝে মাঝেই দেখা দিত পারিবারিক অশান্তি। প্রায়ই সেসব কথা এসে বলত ও হতাশ হয়ে পড়ত। আমরা কিন্তু বুঝেছিলাম পাঠ্য-পুস্তকের চারদেয়ালে আটকে পড়ার ছেলে ও নয়। তাই, যদিও তখন আমাদের নীতি ছিল ভালো ছাত্রকর্মী হতে হলে—স্কুল-কলেজের লেখাপড়াতেও ভাল ছেলে হতে হবে—সুকান্তর বেলায় তার ঘটল ব্যতিক্রম। কারণ আগেই বলেছি ও ছিল অসাধারণ। সৃষ্টির বেদনায় অস্থিরতার লক্ষণ ও প্রকাশ তখন সুকান্ততে সুস্পষ্ট। তাছাড়া তখনকার ছাত্র-আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ। মার্কস্‌বাদের প্রচার ও বিপ্লবী চেতনা সৃষ্টির হাতিয়ার হিসেবে একদিকে বিতর্ক, আলোচনা, নকল পার্লামেণ্ট ও অপরদিকে গান, নাটক ও কবিতা-পাঠের আয়োজন ছিল প্রায় নিয়মিত। প্রগতিশীল গান, নাটক ইত্যাদি রচনা ও মঞ্চস্থ করার দিকে ছাত্র-ফেডারেশন, গণনাট্য আন্দোলন এবং গণনাট্য-সংঘেরও পূর্বসুরী। পরবর্তীকালে গান, নাটক ও ছায়াছবির জগতে বাংলার যাঁরা খ্যাতিলাভ করেছেন তাঁদের অনেকেই কোন না কোনভাবে গোড়ায় ছাত্র-ফেডারেশনের সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর অংশীদার ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ সর্বশ্রী সলিল চৌধুরী, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, সুচিত্রা মিত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নতুন সুর ও ছন্দের কবিতা তখনকার আন্দোলনে প্রভূত উদ্দীপনা ও প্রেরণা জাগায়। এই পটভূমিকাতে এল সুকান্ত। একের পর এক গণসংগ্রাম তখন ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর রূপ লাভ করছে। সারা দেশের লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত জনতা বিশেষভাবে মেহনতী মানুষ এক মহাজাগরণের মুখে। এই অবস্থায় নিত্য নূতন সংগ্রাম ও নিত্য নব সাহিত্য ও শিল্পকর্ম তখন পাশাপাশি পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে চলেছে। সংগ্রামের জোয়ারের সাথে সাথে সুকান্তর কবিতা রচনাও দানা বাঁধতে থাকে।

সুকান্ত ছিল চল্লিশের যুগের কবি। তার অধিকাংশ ভালো কবিতাই লেখা ১৯৪১ থেকে ১৯৪৬-এর ভেতর। তার কবিজীবনের সবটাই কেটেছে কলকাতায়। আর কলকাতার জীবনে তখন নাটকীয় দৃশ্যের মতো এক একটা ঘটনা ঘটে চলেছে আর তার প্রভাব পড়েছে সুকান্তর মনে। ওর অনেক কবিতাই তাই তৎকালীন ছাত্র আন্দোলন বা জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের এক একটি পাতা। ১৯৪১ থেকে জাপানী বোমার ভয়ে কলকাতার মানুষ লাখে লাখে শহর ছেড়ে পালিয়ে গেল। কলকাতার আকাশে তখন ঘন ঘন জাপানী বোমারু বিমানের আনাগোনা। দিনের কলকাতাও জনশূন্য। রাতে নিষ্প্রদীপ। ভয়ে সব শব্দহীন। মাঝে মাঝে মিলিটারি গাড়ী বা বুটের শব্দ। বহু রাতের অন্ধকারে আমি ও সুকান্ত পথে বেরিয়েছি কলকাতার এই প্রেতরূপ দেখার জন্য। ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়' সংগ্রামে ছাত্রসমাজের বীরত্ব ও ইংরেজ-শাসকদের বর্বর অত্যাচারের বীভৎস রূপ দেখে সুকান্ত প্রতিশোধের শপথ নিল। ১৯৪৩-৪৪-এর মহামন্বন্তর ও মহামারীর সময় ক্ষুধার্ত শিশু ও যন্ত্রণাকাতর মায়েদের বুকফাটা কান্নার আওয়াজ তাকে পাগল করে দিল। আভিজাত্য ও জৌলুষের কেন্দ্রস্থল কলকাতার পথে পথে তখন মৃত্যুর মিছিল। মহানগর মহাশ্মশানে পরিণত। এই মৃত্যু-মিছিলের মাঝে সুকান্ত কাটাত সারাদিন সেবা ও সাহায্যের কাজে।

এরপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে আজাদ-হিন্দ ফৌজের বন্দীদের মুক্তির দাবীতে কলকাতায় ছাত্রদের বিপ্লবী সংগ্রামের সুচনা হল ১৯৪৫-এর নভেম্বরে। সে এগিয়ে গেল ২১শে নভেম্বরের ধর্মতলার মিছিলে শহীদ রামেশ্বর ও অবদুস সালামের পাশে। সে ছিল ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারীতে রসীদ আলি দিবসে গুলি চালনা ও হত্যার প্রতিবাদে কলকাতার পথে পথে, বস্তিতে বস্তিতে ইংরেজ সৈন্যদের সাথে পথযুদ্ধের মাঝে। সুকান্ত এই সব ঘটনার সাক্ষী

নয়, শরিক। তাই তার লেখায় এত বিপ্লবী মেজাজ, বিদ্রোহের সুর, তাই তার কবিতার ভাষায় ও ছন্দে এত আগুনের ফুলকি :

দেখবো ওপরে আজো আছে কারা
খসাবো আঘাতে আকাশের তারা
সারা দুনিয়াকে দেবো শেষ নাড়া
ছড়াবো ধান
জানি রক্তের পেছনে ডাকবে
সুখের বান।

১৯৪৬-এর জুন-জুলাইতে আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রে শিল্পী ও কর্মীদের ধর্মঘট এবং ডাক-তার কর্মীদের ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে বার বার সাধারণ ধর্মঘটের ঢেউ বয়ে যায় সারা বাংলায়। ইতিমধ্যে করাচী ও বোম্বাইতে নৌ-বিদ্রোহ, ভারতের নানা স্থানে পুলিশী ধর্মঘট ও সাধারণ হরতালের ঢেউ। সব মিলিয়ে ভারতের মেহনতী জনতার এক অভূতপূর্ব বিপ্লবী মেজাজ। এই পরিস্থিতির বলিষ্ঠ পরিচয় সুকান্তর '১৯৪৬' কবিতায় :

বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে
আমি যাই তারি দিন-পঞ্জিকা লিখে
এত বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ,
দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ।

বাংলাদেশের যুদ্ধ-পরবর্তী ছাত্র-আন্দোলনের সাথে সুকান্ত ও তার কবিতা এক হয়ে মিলে গিয়েছিল। যেখানেই ছাত্র-সমাবেশ সেখানেই সুকান্ত। মনে পড়ে ১৯৪৫-এর নভেম্বর সংগ্রামের ঠিক পরেই চট্টগ্রামে প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলন। কথা ছিল সুকান্ত কবিতা লিখে নিয়ে আসবে। কলকাতার প্রতিনিধিদের আসার জন্য চট্টগ্রাম ষ্টেশনে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। বার বার ভাবছি সুকান্ত আসবে তো?' ট্রেন এল, হাসিমুখে সুকান্ত নেমে এল, নেমেই কবিতাটা হাতে দিল। সম্মেলন সুরু হয় কবি রমেশ শীলের

গান দিয়ে। তারপরই সুকান্তর কবিতা। ওর বাহ্যিক প্রকৃতি ছিল লাজুক। নিজের কবিতা ও বেশী লোকের মাঝখানে পড়তে চাইত না। অপর একজন প্রতিনিধি আবৃত্তি করলেন। এই কবিতাটিই 'ঠিকানা'। আশেপাশের পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হল :

দেখবে ঠিকানা লেখা প্রত্যেক ঘরে
ক্ষুব্ধ এদেশে রক্তের অক্ষরে।

তখনো অগ্নিযুগের আন্দামান ফেরত বন্দীরা ইংরেজের জেলে আটক। তাদের মুক্তির জন্য ১৯৪৬-এর গোড়া থেকে তুমুল আন্দোলন ও ছাত্র-বিক্ষোভের ঝড় বয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত সরকারকে বাধ্য করা হলো বন্দীদের মুক্তি দিতে। ছাত্র-ফেডারেশনের পক্ষ থেকে এই বন্দীদের সংবর্ধনা দেবার ব্যবস্থা করা হলো উত্তর কলকাতার প্রেক্ষাগৃহ 'উত্তরা' সিনেমা হলে। আলাদা অভিনন্দন-পত্র আর রচিত হলো না, কারণ সুকান্ত কবিতা লিখে নিয়ে হাজির —'মুক্ত বন্দীদের প্রতি' :

তোমরা রয়েছো, আমরা রয়েছি
দুর্জয় দুর্বার,
পদাঘাতে পদাঘাতেই ভাঙবো
মুক্তির শেষ দ্বার।

৩

চল্লিশের যুগের বহু কর্মীকেই অভাব অনটনের সাথে নিয়ত লড়াই করে চলতে হত। আজ অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু আমাদের অনেককেই মাসের পর মাস রাত কাটাতে হয়েছে ভবানী দত্ত লেনের রাস্তায় মাদুর পেতে, আর দিনে একবেলার আহার্য পাঞ্জাবী হোটেলে ছয় বা আট পয়সার ডাল-ভাতে। কিন্তু তাতে উৎসাহ উদ্দীপনা একটুও স্তিমিত হয়নি। এই দুঃখ কষ্টের ঝড়

ঝাপটা সুকান্তকে বইতে হয়েছে অনেক বেশী। তার চরম সাক্ষ্য তার অকালমৃত্যু। এ সম্বন্ধে দু-একটি কথা পরে বলব। আসলে যে কথাটা বলতে চাই—এত অভাব অনটনের যাতনা যে সুকান্তকে অবসন্ন বা ক্লান্ত করতে পারেনি তার কারণ বিপ্লবী জীবনের আদর্শে ওর বিশ্বাস ও কমিউনিস্ট পার্টির সাথে নিবিড় সম্পর্ক। এই বিপ্লবী চেতনা তার কাব্য ও কবিতাতেই শুধু বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়ায়নি, তাকে একজন সুদক্ষ সংগঠকরূপেও গড়ে তুলেছিল। চল্লিশের যুগে গড়ে উঠেছিল কিশোরদের সংগঠন 'কিশোর বাহিনী' 'শিক্ষা-স্বাস্থ্য-সেবা-স্বাধীনতা'-র আদর্শে। এই সংগঠনের সূত্রপাত আমার হাতে। কিশোর বাহিনীর শাখা ছড়িয়েছিল শুধু কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় নয়, বিশেষভাবে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। পরবর্তীকালে এই সংগঠনের প্রাণ ছিল সুকান্ত। কলকাতার সব চাইতে ভালো শাখা ছিল শ্যামপুকুর শাখা—প্রাক্তন এম. পি. শ্রীকমল বসুর বাড়ীতে। এর কাছাকাছি প্রায়ই সুকান্ত থাকত শ্রীরাখাল ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাসায়। সুকান্ত কবি ও কর্মীজীবনের অন্যতম প্রধান সহায়ক ছিলেন রাখালবাবু। যাই হোক, এই কিশোর বাহিনীর খেলা-ধূলা নাচ-গান ও কবিতার লড়াই ইত্যাদি দেখাশুনা করত সুকান্ত নিজে আর তাকে সাহায্য করত তখনকার কুমারী আরতি পাকড়াশী [বর্তমানে অধ্যাপিকা আরতি গঙ্গোপাধ্যায়]। তখন ছাত্র-ফেডারেশনের অফিস ছিল কলেজ স্ট্রীট ও বৌবাজারের মোড়ে তিনতলায়। তারই এক কোণে একটি পুরানো টিনের বাক্স নিয়ে সুকান্ত বসত কিশোর-বাহিনীর কেন্দ্রীয় অফিস সাজিয়ে। চিঠি-পত্র এলে বা কোনো সমস্যা দেখা দিলে আমার সাথে পরামর্শে বসত। তখন কমিউনিস্ট পার্টির দৈনিক মুখপত্র 'স্বাধীনতা' নিয়মিত প্রকাশিত হতে শুরু করেছে সোমনাথ লাহিড়ীর সম্পাদনায়। তাতে সুরু হয় 'কিশোর সভা'। কিশোর সভার সম্পাদনা প্রথমে শুরু করেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, পরে এর পরিচালন-ভারও সুকান্তই হাতে নেয়।

জাতীয়তার ভাবে কিশোর সমাজকে উদ্‌বুদ্ধ করা ও নানা সৃজনশীল কাজের ভেতর দিয়ে কিশোরদের গড়ে তোলাই ছিল কিশোর বাহিনীর লক্ষ্য। কিশোর বাহিনী ও কিশোর সভা ছিল সুকান্তর প্রাণ। দেশের ভাবী সমাজ কিশোরকুলকে সে সত্যিই প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত। নাটক ও অভিনয়ের প্রতি কিশোরদের আকর্ষণ অতি প্রবল। কিশোর বাহিনীর কিশোর-কিশোরীদের অভিনয়োপযোগী কোন নাটক বা নাটিকা তখন ছিল না। আমার বিশ্বাস ছিল সুকান্তই রচনা করতে পারে এমন নাটক। আমাদের ভেতর অনেক আলোচনার পর ঠিক হল—১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় রূপকের মাধ্যমে একটি নৃত্যনাট্য সুকান্ত রচনা করবে। কিন্তু নাটক লিখতে গেলে নাটক সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা থাকা দরকার। তাই সুকান্তকে পাঠালাম ষ্টারে 'বিন্দুর ছেলে' দেখতে। দেখে ফিরে এল আমাদের আস্তানায় তখনকার ছাত্র কমিউনে। থিয়েটার দেখে ফিরে এলে জিজ্ঞেস করলাম—কি দেখলে? উত্তরে বুঝলাম 'বিন্দুর ছেলে' দেখে দর্শকের গ্যালারীতে বসে শুধুই কেঁদে কেঁদে চোখ ভারি করেছে। শেষ পর্যন্ত আমাদের ঘরে বসেই 'অভিযান' নৃত্যনাট্য লেখা শেষ হলো। প্রথম লেখায় ওর বিপ্লবী চেতনার স্বাভাবিকতা থেকে শেষ দৃশ্যে ছিল নিপীড়িত প্রজাদের হাতে অত্যাচারী কোতোয়ালের মৃত্যু। তখনকার বন্ধু বা পৃষ্ঠপোষকদের অনেককেই পড়ে শোনান হল। তাদের পরামর্শে শেষ পর্যন্ত কোতোয়াল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে প্রজাদের হাতে বন্দী হলেন। এই অবাঞ্ছিত পরিবর্তনের কথা মনে পড়লে আজ বিরক্তি ও ব্যথাই শুধু জাগে।

৪

সুকান্তর স্বাস্থ্য কোনোদিনই তেমন ভালো ছিল না। ম্যালেরিয়াতে মাঝে মাঝেই ভুগত। তাছাড়া পয়সা-কড়ির কোনো সংস্থানই তেমন

ছিল না। প্রায়শই বেলেঘাটা থেকে হেঁটে আসত, হেঁটেই ফিরত। সারাদিন রাত অবধি নানা কাজে ব্যস্ত থাকত। খাবারদাবারও ঠিকমত প্রায়ই জুটত না। এমনিতেই দুর্বল শরীর, তার ওপর অতিরিক্ত পরিশ্রম। এজন্যই বোধহয় শরীর ভেঙ্গে পড়ে তার। বেশ কিছুদিন খবর নেই। পরে শুনলাম অসুস্থ! গিয়ে হাজির হলাম ওদের বেলেঘাটার বাসায়। তখন পার্টির হাসপাতাল রেড্ এইড্ হোমের সবে সূচনা হয়েছে বউবাজারের একটা বাড়ীর দোতলায়। একখানা ঘোড়ার গাড়ী করে সেখানে এনে ওকে প্রথমে রাখলাম। তারপর সেখান থেকে রাউডন ষ্ট্রীটের রেড্ এইড্ হোমের বাড়ীতে। এ সবই ১৯৪৬ সালের কথা। প্রসঙ্গটা উল্লেখ করছি এজন্য যে, ওর শেষ দিনগুলির কথা যখন ভাবি তখন আমার নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হয়। মনের ভেতর একটা ক্ষত সৃষ্টি হয়ে রয়েছে যা কোনোদিন শুকাবে না। সুকান্ত যাদবপুর টি. বি. হাসপাতালে ভর্তি হবার কিছুদিন আগেই নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক হিসাবে আমাকে ফেডারেশনের সদর দপ্তরে স্থায়ীভাবে থাকার জন্যে বম্বে চলে যেতে হয়। ওই সময় বিশ্বগণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের সাথে আমাদের যোগাযোগ খুবই ঘনিষ্ঠ। তারই সুযোগ নিয়ে বম্বে গিয়েই সব সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির যুব সংস্থার সাথে চিঠি-পত্রের আদন-প্রদান করতে থাকি যাতে ঐ সব দেশের কোথাও সুকান্তর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়। শেষ পর্যন্ত চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে চিকিৎসার পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে যেদিন চিঠি এল বোম্বেতে, তার দিন কয়েক আগে কলকাতায় সুকান্তর মৃত্যু হয়েছে। সুকান্তকে আমরা হারিয়েছি তেইশ বছর আগে। কিন্তু বাংলা-দেশের তরুণ সমাজ রাজনৈতিক চেতনায় যত উদ্‌বুদ্ধ হচ্ছে, দিকে দিকে বিপ্লবী সংগ্রামের মেজাজ যত উত্তপ্ত হচ্ছে, ততই সুকান্তর কাব্য-কবিতা ও গান জনপ্রিয়তা লাভ করছে। ভবিষ্যতে আরো করবে।

কয়েকটি টুকরো স্মৃতি

চিন্মোহন সেহানবীশ

সুকান্তর সঙ্গে কবে প্রথম পরিচয় হয়, তা আজ আর মনে নেই। শুধু মনে পড়ে 'অরণি' পত্রিকায়—খুব সম্ভবত ১৯৪২ সনে সর্বপ্রথম তার লেখা পড়ি। সেটি কিন্তু কবিতা নয়, একটি নিপুণ নক্সা। লেখাটি আমার মতো আরো অনেকের সেদিন নজরে পড়েছিল। সম্পাদক মহাশয় [সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার] খুশী হয়ে তাকে ডেকে পাঠিয়ে তার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করেছিলেন এবং যাওয়ার সময়ে তার হাতে গুঁজে দিয়েছিলেন একটি দশ টাকার নোট।

ঐ লেখাটি সম্ভবত সুকান্তর প্রথম প্রকাশিত রচনা—যদি তা নাও হয়, অন্তত তার সেই প্রথম প্রকাশিত লেখা যায় জন্য তার কিঞ্চিৎ দক্ষিণালাভ ঘটেছিল সেদিন।

তারপর মনে পড়ে ৪৬, ধর্মতলা স্ট্রীটের 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক সংঘে'র দপ্তরে সুকান্তর স্বরচিত কবিতা-পাঠের কথা। কবিতা সে পড়েছিল বেশ কয়েকবার। তবে আমার মনে বিশেষ করেই গাঁথা রয়েছে 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' পড়ার কথা—সেই তার কাঁপা-কাঁপা নিচু গলায় পড়া :

আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি,
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।
আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়,
আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়,
আমার রোমাঞ্চ লাগে অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাতে,
আমার বিস্ময় জাগে নিষ্ঠুর শৃঙ্খল দুই হাতে।

যুদ্ধের যুগের সমস্ত যন্ত্রণা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল সুকান্তর কবিতায়।

তারপর মনে পড়ে 'জনযুদ্ধের' পৃষ্ঠায় চট্টগ্রাম থেকে পাঠানো তার দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও সামাজিক অধঃপতনের জ্বলন্ত সব বিবরণ। রিপোর্টার হিসাবে তাকে সেবার পাঠানো হয়েছিল কয়েকটি জেলায়।

সুকান্ত এরপর অনেকবার এসেছে আমার বাড়ীতে। সত্যকার কিশোর সাহিত্য রচনা নিয়ে তখন সে খুব মাথা ঘামাচ্ছিল। তাই নিয়ে আমার সঙ্গে তার চলেছিল অনেক পরামর্শ।

শেষ কথা এই যে আমিই হলাম সুকান্তর প্রথম কবিতার বই—'ছাড়পত্র'-র প্রথম প্রকাশক। তবে সুভাষের ভূমিকা থেকে তো আপনারা ইতিমধ্যেই জানেন যে ঐ বই প্রকাশের দিন সে আর আমাদের মধ্যে ছিল না।

আমার ঐ মর্মান্তিক প্রকাশনার অভিজ্ঞতা আমি এখনো ভুলতে পারিনি।

সুকান্ত গৌতম চট্টোপাধ্যায়

১৯৪৩। ভারতবর্ষের পূর্ব-সীমান্তে জাপানী ফ্যাসিস্ট বাহিনীর উদ্যত থাবা। দেশের মধ্যে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের ভয়াবহ অত্যাচার। মন্বন্তরে প্রাণ দিচ্ছে লক্ষ লক্ষ নিরন্ন নরনারী। আর এই ঘোর দুর্বিপাকের বিরুদ্ধে প্রাণপণ শক্তিতে দাঁড়িয়ে লড়ছে বাংলার ছাত্র-সমাজ—বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে। তারই এক জেলা সম্মেলন হচ্ছিল কুষ্টিয়ার এক স্কুল বাড়ীতে। বক্তৃতা করছিলেন নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের অন্যতম নেতা প্রভাত দাশগুপ্ত। রাজনৈতিক সঙ্কটের গভীরতা ও ছাত্রসমাজের দায়িত্বের কথা বলতে বলতে, হঠাৎ তিনি আবেগের সঙ্গে উচ্চারণ করলেন একটি কবিতার কয়েকটি ছত্র :

কবে দেখা দেবে, কবে প্রতীক্ষিত সেই শুভক্ষণ—
ছড়াবে ঐশ্বর্য পথে জনতার দুরন্ত যৌবন ?
দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশে অতর্কিতে শত্রু তার পদচিহ্ন রাখে—
এখনো শত্রুকে ক্ষমা ? শত্রু কি করেছে ক্ষমা বিধ্বস্ত বাংলাকে ?
...এ মাটি উত্তপ্ত হোক, এ দিগন্তে আসুক বৈশাখ,
ক্ষুধার আগুনে আজ শত্রুরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক।

ঐ ছাত্র সম্মেলনের সংগঠকদের মধ্যে আমিও ছিলাম একজন। আর প্রভাতদার আবৃত্তির মধ্যমেই সেই আশ্চর্য কবিকিশোর সুকান্তর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।

ঐ ১৯৪৩-এরই শেষদিক। কৃষ্ণনগর স্কুলের ছেলেদের নিয়ে গঠিত হয়েছে কিশোর বাহিনী। তারা অভিনয় করছে সুকান্তের কাব্যনাট্য। নাটকের শেষ দৃশ্যে যখন জাগ্রত জনতা বন্দিনী নায়িকাকে কোতোয়ালের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দৃপ্ত স্বরে বলছে :

রাজার উপর আর করব না নির্ভর
আমাদের ভাগ্যের, আমরাই ঈশ্বর।

তখন অভিনন্দনে মুখর হয়ে উঠেছে সমাবেশের ছোটো বড় সকলেই! এই দ্বিতীয়বার আমি সুকান্তের পরিচয় পেলাম, যদিও তাকে তখনও চোখে দেখিনি।

কলকাতায় ফিরে এলাম ১৯৪৪-এ। প্রাদেশিক ছাত্রনেতা অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্যের সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যুর ঘরে বসে আলোচনা করছি—একটি ১৭।১৮ বছরের ছেলে এসে ঘরে ঢুকে খাটের এক কোণে বসল। দেখে মনে হলো খুবই লাজুক। খানিক পরে ছেলেটি বললে: ছোড়দা, আজ তাহলে আসি।

অন্নদা বললেন: গৌতম, একে চেন না? এই আমাদের সুকান্ত।

সঙ্গে করে সুকান্ত এনেছিল একটা কবিতা, সদ্য লিখেছে—'রবীন্দ্রনাথের প্রতি'। দু'টো লাইন এখনও কানে বাজে:

আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়;
আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়।

সেইদিনই ভাব হয়ে গেল। সেদিন থেকে হয়ে গেলাম সুকান্তের আর এক দাদা—আর সেও হলো আমার চিরদিনের এক ছোটো ভাই। অজস্র ঘটনার মধ্যে সামান্য দু-একটা বলছি। ১৯৪৫-এর ডিসেম্বর মাসে প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলন হচ্ছে চট্টগ্রামে। কলকাতা থেকে বিরাট ছাত্র প্রতিনিধি দল নিয়ে আমরা চলেছি জাহাজে করে—গোয়ালন্দ থেকে চাঁদপুর। সঙ্গে আছেন ভারতীয় ছাত্রনেতা সত্যপাল ডাঙ্গ্ এবং প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। কেউ গল্প করছে, কেউ ডেকে দাঁড়িয়ে পদ্মার শোভা দেখছে। আর সুকান্ত একমনে কবিতা লিখছে সম্মেলনের জন্য। কবিতা লেখা শেষ হলো—চুপি চুপি এসে আমায় শুনিয়ে গেল। চট্টগ্রাম সম্মেলনের গোড়াতেই ছাত্রনেতা রমেন ব্যানার্জি মাইকে ঘোষণা

করলেন সুকান্তের কবিতা দিয়ে সম্মেলন সুরু হবে! পড়া হলো কবিতা : 'ঠিকানা'—অবিস্মরণীয় লাইন :

দেখবে ঠিকানা লেখা প্রত্যেক ঘরে,
ক্ষুব্ধ এদেশে, রক্তের অক্ষরে।

তারপর সেই ঝড়ের দিনগুলি—রসীদ দিবস, নৌবিদ্রোহ। পথে পথে ব্যারিকেড বোম্বাই থেকে কলকাতা, দুরন্ত বিদ্রোহী মিছিল। সুকান্তের কবিতা সেখানেও হাজির সামনের সারিতে। একদিনের কথা খুব মনে পড়ছে। ১২ই কিংবা ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬। রসীদ দিবসের পরদিন। বজবজ থেকে কাকিনাড়া বৃহত্তর কলকাতা বন্ধ। কমিউনিস্ট পার্টির দৈনিক 'স্বাধীনতা'র দপ্তরে একটা কবিতা ছাপতে নিয়ে এসেছে সুকান্ত। আর সম্পাদক সোমনাথ লাহিড়ী বলছেন : না, না, আর কবিতা নয়। এক সুভাষের [সুভাষ মুখোপাধ্যায়] কবিতা ছেপেই পাঁচ হাজার টাকা আক্কেল সেলামী দিয়েছি ['রক্তের ধার রক্তে শুধ্‌বো, কসম্‌ ভাই], আর ওরকম কবিতা নয়। সুকান্তও নাছোড়বন্দা। শেষ অবধি সোমনাথ লাহিড়ী রাজী হলেন এবং ছাপার দরজা খুলে গেল। পরদিন স্বাধীনতার সামনের পাতায় বড় বড় অক্ষরে ছেপে বেরল :

মুখে মৃদু হাসি, অহিংস বুদ্ধের
ভূমিকা চাই না, ডাক ওঠে যুদ্ধের।
গুলি বেঁধাবুকে উদ্ধত তবু মাথা,
হাতে হাতে ঘোরে দেনা পাওনার খাতা—
শোন হুঙ্কার কোটি অবরুদ্ধের।

তারপর এল বন্দীমুক্তি আন্দোলন—১৯৪৬-এর জুলাই। ইউনিভার্সিটি ইনষ্ট্যুটে ছাত্রকর্মীদের বিরাট সভা। কেন জানি না, কারুর বক্তৃতাই সেদিনের ভিজে বারুদে অগ্নিসংযোগ করতে পারছিল না। হঠাৎ সুকান্ত ভীড় ঠেলে এসে একটি কবিতা আমার হাতে গুঁজে দিল। যথারীতি সেটি পাঠ করা হল :

ওদের কাহিনী বিদেশীর খুনে
গুলিবন্দুক বোমার আগুনে
আজও রোমাঞ্চকর।

তারপর সেই আগ্নেয়-ঘোষণা :

শোনো, দুনিয়ার মানুষেরা শোনো,
শোনো স্বদেশের ভাই—
রক্তের বিনিময় হয় হোক
আমরা ওদের চাই

সমস্ত হল ফেটে পড়ল বজ্রধ্বনিতে—আমরা ওদের চাই।

কয়েকমাস পরে, সেই বীর বন্দীরা যখন মুক্ত হলেন, সুকান্ত তখন অসুস্থ। চট্টগ্রামের বন্দীবীরেরা মুক্ত হয়েই জিজ্ঞেস করে ছিলেন : সুকান্ত কোথায়?

কলকাতায় তখন কলঙ্কিত ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা চলছে। রোগশয্যা থেকে সুকান্ত মুক্তবীরদের অভিবাদন জানিয়ে লিখল :

দিকে দিকে আজ বিদেশী প্রহরী
সঙ্গিন উদ্যত,
তোমরা এসেছ বীরের মতন,
আমরা চোরের মতো।

অল্পদিনের মধ্যে যুদ্ধোত্তর প্রথম বিশ্ব-ছাত্র সম্মেলনে ভারতের ছাত্র-প্রতিনিধি হয়ে আমি ইউরোপে গেলাম। যাবার পথে বোম্বাইএ নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের বহুল প্রচলিত পাক্ষিক মুখপত্র 'দি ষ্টুডেন্ট'-এ আমি একটি প্রবন্ধ লিখি—সুকান্তের উপর। নাম 'এ ডিফারেন্ট ব্যানার'। তার শেষ লাইনে লেখা ছিল—'দাস্, অ্যাট দি হেড অফ ক্যালকাটাজ্ ফাইটিং ষ্টুডেন্টস্, সুকান্ত'জ পোয়েমস্ অল্‌সো মার্চ, লাইক্ এ ডিফারেন্ট ব্যানার।' এই প্রবন্ধটি সোভিয়েত তরুণ কমিউনিস্টদের মুখপাত্র 'কমসমলস্কায়া প্রাভ্‌দা' ও 'ওয়ার্ল্ড ইয়ুথ'-এও ছাপা হয়। সুকান্তর নাম আদরের সঙ্গে উচ্চারিত

হয় য়ুরোপের মৃত্যুঞ্জয়ী মুক্তিযোদ্ধা তরুণতরুণীদের কণ্ঠে। স্বয়ং কবি লুই আরাগঁ তর্জমা করেন ফরাসীতে সুকান্তর দুটি কবিতা; যার ইংরেজী অনুবাদ 'ষ্টুডেন্ট'-এ বেরিয়েছিল।

সুকান্তকে এই সব সুখবর দেব বলে সানন্দে যখন ফিরে এলাম, সুকান্ত তখন মৃত্যুশয্যায়। খবরগুলো শুনে একবার শুধু বললে : আরার্গ আমার কবিতা তর্জমা করেছেন!

আমার হাতটা মুঠোর মধ্যে চেপে ধরল। সেই মুঠো—শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইএ যা কখনও আলগা হয়নি।

সুকান্ত ভারতবর্ষকে স্বাধীন দেখে যেতে পারেনি। দেখে গেছে স্বাধীনতাযুদ্ধের শেষ পর্বকে। রোগশয্যা থেকেও সমস্ত শক্তি দিয়ে তাই লিখেছিল :

তাদেরই দলের পিছনে আমিও আছি
তাদেরই মধ্যে আমিও যে মরি-বাঁচি।
তাই তো চলেছি দিন-পঞ্জিকা লিখে—
বিদ্রোহ আজ! বিপ্লব চারিদিকে।

এখন তাই যেখানেই প্রতিরোধ, যেখানেই বিপ্লবের ডাক, সেখানেই সগর্বে ঝড়ের সামনে ওড়ে সুকান্তর কবিতা—সেখানেই দেখতে পাই সুকান্তের মুখ—মৃত্যুহীন বিদ্রোহী নিশান।

সুকান্তর যখন শৈশবকাল, তখন তার বাবা আর জ্যাঠামশাই একসঙ্গে হরমোহন ঘোষ লেনে আমাদের এই বাড়ীর পাশের একটি দু'তলা মাঠকোঠায় বাস করতেন। ওঁদের একটি টোল আর একটি বইয়ের দোকান ছিলো। সুকান্তর জ্যোঠামশাই কৃষ্ণচন্দ্র ওই টোলটি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, আর বইয়ের দোকানটি দেখাশোনা করার ভার ছিলো ওর বাবা নিবারণচন্দ্রের ওপর।

সুকান্ত যখন খুব ছোটো, তখন থেকেই ওর মা সুনীতি প্রায় সময়েই অসুস্থ থাকতো। একবার সুনীতি তার বাপের বাড়ীর লোকজনের সঙ্গে মধুপুর চলে যায়। সেবারে বেশ কিছুদিন মধুপুরে থাকে ওরা। আমার যতদূর মনে আছে, মধুপুরেই সুকান্তর পরের দুই ভাই মুকুল আর অশোকের জন্ম হয়। তারপর সুনীতি মধুপুর থেকে কলকাতায় ফিরে আসে আর কালিঘাটে ওর বাপের বাড়ীতেই থাকে কিছুদিন।

এরপর সুকান্তর জ্যাঠামশায়ের মেজ ছেলে রাখালের বিয়ের সময় সুনীতি ছোটো-ছোটো ছেলেদের নিয়ে আবার হরমোহন ঘোষ লেনে ওদের বাড়ীতে আসে। একসঙ্গে একই বাড়ীতে জ্যাঠামশায়ের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সুকান্ত আর তার ভাইয়েরা মানুষ হচ্ছিলো তখন।

এর কিছুদিন পরে সুকান্তর জ্যাঠামশাই নিজে একটি আলাদা বাড়ী করে নিজের ছেলেমেয়ে পরিবার নিয়ে সেখানে চলে যান। কিন্তু ও বাড়ীতে ওঁরা বেশীদিন থাকতে পারেননি। নতুন বাড়ীতে যাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই পর পর দুটি দুর্ঘটনা ঘটে যায় ঐ পরিবারে। সুকান্তর একমাত্র জ্যাঠতুতো দিদি রানী আর ওদের দুই

পরিবারের সব চেয়ে বড় ছেলে—সুকান্তর জ্যাঠতুতো বড়দাদা গোপালচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

এই দুটি দুর্ঘটনার পর সুকান্তর জ্যাঠামশাই কৃষ্ণচন্দ্র ওই নতুন-বাড়ী ত্যাগ করে পরিবারের সকলকে নিয়ে অন্য জায়গায় চলে যান। হরমোহন ঘোষ লেনে, আমাদের বাড়ীর পাশে ওদের ওই পুরানো দু'তলা মাঠকোঠায় তখন সুকান্তর বাবা তাঁর ছেলেদের নিয়ে বাস করছিলেন। এরই মধ্যে ছোটো ছোটো ছেলেদের রেখে সুকান্তর মা হঠাৎ একদিন চোখ বুজলো। মৃত্যুর আগে সুনীতিকে মধুপুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। দুরারোগ্য ক্যানসার রোগে সেখানেই সে মারা যায়।

নিবারণচন্দ্রের প্রথম পুত্র, সুকান্তর বড় দাদা মনোমোহনের তখন বিয়ে হয়ে গেছে। আমাদের বাড়ীরই একটি অংশে মনোমোহন আর তার স্ত্রী সরযূ বসবাস শুরু করেছে।

ওইভাবে একেবারে হঠাৎ স্ত্রী মারা যাওয়াতে সুকান্তর বাবা ছোটো ছোটো ছেলেদের নিয়ে খুবই বিপদে পড়লেন। একটি মাইনে করা রাঁধুনি রাখলেন রান্না করে ছেলেদের মুখে ভাত দেওয়া আর তাদের দেখাশোনা করার জন্য। তিনি নিজে একা পুরুষ মানুষ, ছোটো ছোটো ছেলেদের দিকে নজর দিতে পারেন না মোটেই, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ওই বইয়ের দোকান নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়।

ওই সময় থেকেই মা-মরা সুকান্ত, বাড়ীতে দেখাশোনা করার লোকজনের অভাবে বাউণ্ডুলে ছন্নছাড়ার মতো এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে শুরু করে দেয়। অতটুকু বয়স থেকে, বলতে গেলে যত্ন আদর ভালোবাসা ছাড়াই সে একটু একটু করে বড় হয়ে উঠেছে। ওর ওই বাইরে ঘোরার অভ্যাসটা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন আরো বাড়তে থাকে। নাওয়া-খাওয়ার কোনো ঠিক ছিলো না সুকান্তর। কখনো খেত, কখনো খেত না। মাইনে করা রাঁধুনি বামুনীর অতো দেখার মন ছিলো না। রান্না শেষ করে হেলা-ফেলার ডাক

দিতো চিৎকার করে: ওরে সুকান্ত, ভাত দিয়েছি, খাবি আয়। —কিন্তু কোথায় সুকান্ত? তার কি তখন খাবার কথা খেয়াল আছে? তাই কোথাও কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া যেতো না। এরকম একদিন নয়, অনেক দিনই হয়েছে।

আমার বড় ছেলে কৃষ্ণগোপাল সুকান্তর ওপরের ভাই সুশীলের সমবয়সী। সেজন্য তার সঙ্গে সুকান্ত বেশী কথাবার্তা বলতো না ছোটবেলায়। ওকে দাদার মতোই শ্রদ্ধা করতো। বড় লাজুক স্বভাবের ছিলো সে। ওর যতো ভাব ছিলো আমার ছোটো ছেলে মণির সঙ্গে। ওর সঙ্গেই সুকান্ত খেলাধুলা ঘোরাঘুরি করতো প্রায় সময়। মণির কাছ থেকেই তখন আমরা জানতে পারি, সুকান্ত নিজে নিজে পদ্য লেখার চেষ্টা করে। আমাদের বাড়ীর দেয়ালেও সুকান্তর অনেক পদ্য লেখার কথা আমার ছেলেদের কাছে শুনেছিলাম।

সুকান্তদের মাঠকোঠার দু'তলার একটি ঘরে ওদের দোকানের বইপত্র গুদমজাত করা থাকতো। সুকান্ত ওই ঘরের মধ্যেই নিজের মতো একটু জায়গা করে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকতো অনেক সময়। কোথাও কোনো জায়গায় যখন ওকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন দেখা গেলো ওই গুদমঘরের অল্প পরিসর একটু আধ-অন্ধকার জায়গার মধ্যে সে চুপটি করে বসে আছে! সামনে হয়তো খোলা একটা খাতা, কি কাগজের টুকরো। কি যে লিখছিলো, কে জানে! কারুকে বড় একটা দেখাতোও না ওর ওই সব লেখা-টেকা।

আমাদের বাড়ীতে, মনোমোহনের বউ সরযূর কাছে নানারকম আবদার ধরতো সুকান্ত। সরযূও তার মা-হারা এই ছোটো দেওর-টিকে স্নেহ করতো খুব। তাই ওর সব রকমের বায়না মিটোতে চেষ্টা করতো। যতো দুষ্টুমিই করুক, সরযূ ওকে কোনোদিন শাসন করতো না। এভাবে প্রশ্রয় দেওয়া দেখে আমি অনেক সময় বলতাম ওকে: বৌমা, ছোটো দেওরকে অতো আস্কারা দিও না, একটু শাসন করার চেষ্টা করো।

সুকান্ত তার বৌদিকে রামায়ণ-মহাভারত পড়ে শোনাতো। একটু স্নেহ, একটু ভালোবাসা পাবার লোভে আমার কাছেও আসতো যখন-তখন। রান্নাঘরের চৌকাঠে বসে রামায়ণ পড়ে শোনাতো আমাকে, কোনো কোনো দিন মহাভারত। তারপর ওরা একদিন আমাদের বাড়ীর পাশের মাঠকোঠা ছেড়ে নারকোলডাঙা মেন রোডের একটি বাড়ীতে চলে গেলো।

ওখানে চলে যাবার পরেও মধ্যে-মধ্যে সুকান্ত আসতো আমাদের বাড়ী। ও তখন একটু বড় হয়েছে। আমার ছেলেদের কাছে শুনতুম সুকান্তর লেখা অনেক কাগজ-পত্রে ছাপা হয়, বেশ নাম হচ্ছে ওর। এর পরেই হঠাৎ একদিন ও আমাদের সকলকে ছেড়ে চলে গেলো। এবার আর আমাদের পাশের বাড়ী ছেড়ে দূরের বাড়ীতে উঠে যাওয়া নয়, এমন জায়গায় গেলো যেখানে গেলে মানুষ আর ফিরে আসে না কোনোদিন।

হ্যালা-খ্যাপা আপনভোলা প্রকৃতির সুকান্ত যে কতো বড় ছিলো, ও বেঁচে থাকতে তা আমি বুঝতে পারিনি। সুকান্ত যখন যাদবপুর হাসপাতালে ছিলো, তখন আমার ছোটো ছেলে মণি ওকে প্রায় দিনই দেখতে যেতো। বাড়ী এসে বলতো ওর খবর। তারপর হঠাৎই একদিন সব শেষ হয়ে গেলো। মৃত্যুর পর খবরের কাগজে ওর ছবি ছাপা হলো, খবর বেরুলো। কবিতাও ছাপা হলো সেদিন নতুন করে।

আমার বড় ছেলে সেই কাগজ নিয়ে এসে দেখালো আমাকে।

তখন বুঝলুম, আমাদের সুকান্ত অনেক বড় ছিলো। বেঁচে থাকলে আরো অনেক, অনেক বড় হতে পারতো।

এই কথাই আজ আমার মনে হয় কেবল।

সুকান্তর কথা আমাকে জিজ্ঞেস করছো, এর চেয়ে বেশী আর আমি কি বলবো?

অনুলিখন : বিশ্বনাথ দে

সুকান্ত, আমাদের সুকান্ত

কে. জি. বসু

আমার ছোটো ভাই মণির সহপাঠি ছিলো সুকান্ত। সে ছিলো অত্যন্ত লাজুক আর নম্র। বড়দের অর্থাৎ আমাদের সামনা-সামনি বড় একটা হতে চাইতো না সহজে, হলেও খুব সহজভাবে কথা বলতে পারতো না, একটু দূরত্ব রেখে সমীহ করে চলতো।

আমাদের বাড়ীর ঠিক পাশে জমিদারের খাজনা করা একটি দু'তলা মাঠকোঠায় তখন সুকান্তর বাবা আর জ্যাঠামশায়ের সংসার একসঙ্গে ছিলো। তারপর ওপাশে একটি জমি কিনে ওর জ্যাঠামশাই নতুন বাড়ী তৈরী করিয়ে নিজের সংসার নিয়ে আলাদা হয়ে যান। সুকান্তর বাবার ভাগে পড়ে জমিদারের খাজনা করা প্রায় জীর্ণ ওই মাঠকোঠাটি। ওদের ছিলো পুস্তক প্রকাশনীর ব্যবসা। একটিই বইয়ের দোকান ছিল আগে, কিন্তু সংসার ভাগাভাগি হবার সময় নতুন একটি বইয়ের দোকান করে ব্যবসাটিও আলাদা করে নেন ওর জ্যাঠামশাই। সুকান্তর বাবার ভাগে পড়ে ওই পুরানো দোকানটি।

তখন ওঁদের ছাপা শ্রীমদ্‌ভাগবত গীতার একটি সংস্করণ ছিলো। বইটি খুব বিক্রি হতো। সেই বহুল প্রচলিত বইটি যতদূর মনে পড়ে সুকান্তর জ্যাঠামশায়ের নতুন দোকান থেকেই এর পর থেকে প্রকাশিত হতো।

সুকান্তর জ্যাঠামশাই ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী মানুষ, ব্যক্তিত্ব ছিলো তাঁর অসীম। তাঁর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে কথা বলার সাহস কারোরই হতো না, এমন কি সুকান্তর বাবারও না।

ওদের পরিবারে মেয়ে বাঁচে না এমন একটি কথা প্রচলিত ছিলো। সুকান্তর জ্যাঠামশাই তাঁর সংসার নিয়ে নতুন তৈরী করা বাড়ীতে চলে যাবার পর সত্যিসত্যিই ওঁর একমাত্র কন্যা রানী মারা যায়। এই

রানী, সুকান্তর রানীদি। এর কোলেই সুকান্তর শৈশবের দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছিলো। শিশু সুকান্ত কান্নাকাটি করলে এই রানীদিই তাকে কবিতা ও গান শুনিয়ে ঘুম পাড়াতো। সেই থেকেই সুকান্তর কবিতা ও গান শোনার কান তৈরী হয়েছিল বলা চলে।
তা এই রানী মারা যাবার পর ওদের সংসারে এক শোকের ছায়া নেমে আসে। এর কিছু দিন পরে সুকান্তর জ্যাঠতুতো বড় দাদা, ওদের বাড়ীর সবচেয়ে বড় ছেলে গোপালদারও [গোপাল ভট্টাচার্য] মৃত্যু হয়।
নতুন বাড়ীতে আসার পর, পর পর এই দুটি দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়াতে সুকান্তর জ্যাঠামশাই ওই বাড়ী ছেড়ে সংসারের সকলকে নিয়ে অন্যত্র চলে যান। এদিকে সুকান্তর বাবার ভাগে পড়া জীর্ণ মাঠকোঠাটিও জীর্ণতর হয়ে ওঠে। উনিও সংসারের সকলকে নিয়ে হরমোহন ঘোষ লেনে আমাদের বাড়ীর পাশের মাঠকোঠা ছেড়ে নারকেলডাঙা মেন রোডের একটি বাড়ীতে চলে যান।
ইতিমধ্যে সুকান্তর মা মারা গিয়েছিলেন। মাতৃহীন সুকান্ত হয়ে উঠেছিলো স্নেহের কাঙাল। বাবা তার নিজের কাজকর্ম আর দোকান নিয়েই দিবারাত্র ব্যস্ত থাকতেন। স্ত্রী-হীন সংসার ও ছেলেদের দিকে লক্ষ্য দেবার বড় একটা সময় পেতেন না তিনি। ছেলেদের ভার ছিলো এক মাইন করা পরিচারিকার ওপর।
সুকান্তদের সংসারটি ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে শ্রীহীন অবিন্যস্ত এলোমেলো। বাড়ীর গৃহকর্ত্রী না থাকলে যা হয় আর কি। ওর বড় ভাই মনোমোহন ভট্টাচার্য তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে তখন আমাদের বাড়ীর একটি অংশে বসবাস শুরু করেছেন।
নিজের বাড়ীর ওই নোংরা ময়লা আবহাওয়ার মধ্যে সুকান্ত মানিয়ে নিয়েছিলো নিজেকে। ময়লা জামা-কাপড়, ময়লা বিছানার চাদর, এমন কি পরনের গেঞ্জীটির মধ্যেও তার দৈন্য দশা। মাইনে করা পরিচারিকার এসব দিকে লক্ষ্য করার অবকাশ ছিলো না।

আমি কখনো কখনো রাগ করে বকুনি দিতাম ওকে, সুকান্ত, তুমি নিজে এসব কেচে নিতে পারো না ?

ও কোনো জবাব দিতো না। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকতো। শুধু জামা-কাপড় নয়, খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেও সুকান্ত আর তার ভায়েদের কোনো নিয়ম কানুন ছিলো না। দিনে আর রাতে দু'বেলা খাওয়ার ব্যবস্থা ছিলো বাড়ীতে, অন্য সময় জলখাবার-টিফিন খেলো কি না ছেলেরা, সে বিষয়ে লক্ষ্য কারো ছিলো না।

এই সব কারণেই সুকান্তর মনটি ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছিলো বহির্মুখী। বাড়ীতে সে বিশেষ থাকতো না। হয় আমাদের বাড়ী আমার মায়ের কাছে, মোনাদার স্ত্রীর কাছে, নয় অরুণাচলদের বাড়ী চলে যেতো সুকান্ত।

ওর সহপাঠি-বন্ধু অরুণাচল বসুরা তখন আমাদের বাড়ীর কাছাকাছি একটি ভাঙা পোড়ো বাড়ীতে বাস করতো।

ওই সময় থেকেই সুকান্তর মনে রাজনীতি ও সাহিত্যের প্রেরণা জেগে ওঠে।

একদিনের ঘটনা বলছি। বাড়ীতে আমার ঘরটি চুণকাম করিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেছি আমি। সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে দেখি কোলি দেওয়া সাদা দেয়ালে কাঠকয়লার কালো আঁচড়ে কে কি লিখে রেখে গেছে। আমি তো অবাক! মাকে ডেকে বললাম, মা, দেয়ালে এসব লিখলো কে ?

মা বললেন, তা তো জানি না, সুকান্ত সারাদিন বসেছিলো, বোধ হয় সেই লিখেছে।

সুকান্তদের আর আমাদের দুহ বাড়ার মধ্যে বাশের বেড়া দেওয়া ছিলো। সেই বেড়ার কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে ডাকলাম সুকান্তকে।

সুকান্ত বাড়ীতেই ছিলো, নেমে এলো।

ওকে হাত ধরে টেনে ঘরের মধ্যে নিয়ে এসে বকুনি দিলাম খুব। দেয়ালের দিকে দেখিয়ে বললাম, এসব কে লিখেছে—তুমি ?

সুকান্ত ঘাড় নেড়ে স্বীকার করলো, তারপর মাথা নিচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে রইলো।

আমি একটি খাতা সুকান্তর হাতে দিয়ে বললাম, কক্ষনো আর দেয়ালে লিখো না। এবার থেকে যখন ইচ্ছা হবে এই খাতায় লিখবে।

সুকান্ত ঘাড় নাড়লো। তারপর নম্র কণ্ঠে বললে, দেয়ালটা আমি মুছে দেবো কি ?

বললাম, না, মুছলে আরো কালো দাগ হয়ে যাবে, ওর যা করার আমিই করবো, তোমায় ভাবতে হবে না।

সুকান্ত আর কোনো কথা না বলে খাতা হাতে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে। যতোদূর মনে পড়ে সেদিন আমার ঘরের দেয়ালে সুকান্ত এই কবিতাটিই লিখেছিলো :

দেয়ালে দেয়ালে মনের খেয়ালে
লিখি কথা,
আমি যে বেকার, পেয়েছি লেখার
স্বাধীনতা।

সে সময় সুকান্তর স্কুলের পরীক্ষা হয়ে গিয়েছিলো। এখানে ওখানে ঘুরে বেড়িয়ে ছুটি উপভোগ করছিলো সে।

ওর জ্যাঠামশায়ের পরিবারটি কিন্তু ওদের মতো অবিন্যস্ত এলোমেলো ছিলো না, ও বাড়ীর সুন্দর সুস্থ শান্তিময় আবহাওয়ার মধ্যে তাই সুকান্ত ছুটে যেতো বার বার। ওখানে জ্যাঠতুতো দাদা রাখালদা আর মনোজের কাছে বসে রাজনীতি আর সাহিত্যের চর্চা শুনতো সে। ওদের সঙ্গে খোলামেলাভাবে মিশতে পারতো সুকান্ত। যেটা নিজের বাড়ীতে নিজের অগ্রজ সুশীলের সঙ্গে কখনো হয়নি। সুশীল আর সুকান্ত ছিলো পিঠোপিঠি দুই ভাই। সেজন্য সুশীলের সঙ্গে তার গোলমাল অশান্তি হামেশাই লেগে থাকতো। মনে আছে, একবার সুশীল ওকে মারতে মারতে এমনভাবে ওর গলা চেপে ধরেছিলো যে,

লোকজন না গিয়ে হাজির হলে দমবন্ধ হয়ে সুকান্ত সেদিন মারাই যেতো হয়তো।

তা যে-কথা বলছিলাম, সুকান্ত তার জ্যাঠতুতো দাদাদের কাছেই রাজনীতি ও সাহিত্যের মানসিকতা তৈরী করে ধীরে ধীরে। তখন সে কবিতা লেখা শুরু করেছে। তবে সে সব কবিতা বড় একটা আমাদের দেখাতো না।

ওর রাজনৈতিক অনুভূতি তৈরী করার ব্যাপারে আরো একজন মানুষের দান ছিলো, তিনি হলেন সুকান্তর ইস্কুলের মাস্টারমশাই শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ দাস।

একদিন হঠাৎ সে নারকেলডাঙা মেন রোডের বাড়ী থেকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে আমাকে বললে, কেষ্টদা, মণি কোথায় ?

মণি সুকান্তর সহপাঠি, আমার ছোটো ভাই।

বললাম, কেন, কি হয়েছে ?

দেখুন না, আমি লিখছিলাম, ও হঠাৎ আমার খাতাটা নিয়ে পালিয়ে এলো।

খোঁজ করলাম মণির, কিন্তু পাওয়া গেলো না। শেষে যখন পাওয়া গেলো তখন খাতা ফিরে পেয়ে কি লিখছিলো, তা আর দেখাতে চায় না। নিজের লেখা দেখাতে সুকান্তর এতো ইতস্তত!

আমাদের বাড়ীর গলির সামনে একটি খাবারের দোকান ছিলো। একদিন সকালে সুকান্ত দুটি পয়সা নিয়ে সেই দোকান থেকে ছোট্ট শালপাতায় মোড়া হালুয়া-কচুরী কিনেছে, পেছু ফিরে বাড়ী আসতে গিয়েই হলো বিপত্তি! কোথা থেকে এক চিল এসে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলো ওর হাতের ঠোঙাটি।

লক্ষ্য করলাম, সুকান্ত, বালক সুকান্ত স্থির চোখে তাকিয়ে রইলো তার মুখের খাবার ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া ওই উড়ন্ত চিলটির দিকে।

সুকান্তর শুক্‌নো মুখের দিকে তাকিয়ে বড় মায়া হলো আমার।

আর একদিন, আমাদের বাড়ীর সামনের রাস্তায় টেলিগ্রাফের

তার লেগে পড়ে যাওয়া এক মরা চিলের দিকে আমুদে চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখেছিলাম তাকে। ভাবখানা যেন এই, সেদিন তো খুব খাবার ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়েছিলে! আজ কেমন হলো?
চিলের এই ঘটনা দুটি থেকেই কি সে পরবর্তীকালে 'চিল' কবিতায় লিখেছিল?—

পথ চলতে চলতে হঠাৎ দেখলাম:
ফুটপাতে এক মরা চিল!
... ...
যার শ্যেন দৃষ্টিতে কেবল ছিল
তীব্র লোভ আর ছোঁ মারার দস্যু প্রবৃত্তি—
তাকে দেখলাম, ফুটপাতে মুখ গুঁজে প'ড়ে।
... ...
অনেকে আজ নিরাপদ;
নিরাপদ ইঁদুর ছানারা আর খাদ্য-হাতে ত্রস্ত পথচারী,
নিরাপদ—কারণ আজ সে মৃত।
আজ আর কেউ নেই ছোঁ মারার,
ওরই ফেলে-দেওয়া উচ্ছিষ্টের মতো
ও পড়ে রইল ফুটপাতে,
শুক্‌নো, শীতল, বিকৃত দেহে।...

সুকান্তর জ্যাঠতুতো দাদা মনোজ ভট্টাচার্য আমার বন্ধু ও সহপাঠি। আমরা তখন কলেজে পড়ি। আমাদের কলেজের বন্ধু সুভাষ মুখোপাধ্যায় তখন কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, 'পদাতিক' বেরিয়েছে সুভাষের।
একদিন আমাদের কলেজের ফাঁকে চায়ের দোকানের আড্ডায় কবিতার খাতা সমেত সুকান্তকে নিয়ে গিয়ে হাজির করলো মনোজ। সেদিন অবশ্য আমি ওখানে ছিলাম না।

মনোজের হাত থেকে খাতাখানি নিয়ে সুভাষ বললে, নিয়ে যাই, পড়ে দেখবো।

সুকান্ত সুভাষের 'পদাতিক' পড়ে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলো। তাই সুভাষের মুখোমুখি হতে চাইলো না সে। কখন এক ফাঁকে রাস্তায় নেমে দাঁড়ালো গিয়ে লাজুক সুকান্ত। পরে ওর খাতার কবিতা পড়ে ওর সঙ্গে আলাপ করেছিলো সুভাষ।

এর পর সে ধীরে ধীরে সরাসরি রাজনীতির ক্ষেত্রে চলে এলো। কবিতাও তার ছাপা হতে লাগালা এখানে ওখানে।

ইতিমধ্যে একদিন সুভাষের মারফত কবি বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে সুকান্তর আলাপ হয়েছিলো।

কমিউনিস্ট পার্টির তখনকার মুখপত্র দৈনিক 'স্বাধীনতা'য় সুকান্তর কবিতা বেরুতে বুদ্ধদেব বসু তাকে একটি ছোটো চিঠি লেখেন। সুকান্ত সেই চিঠি নিয়ে আমার কাছে হাজির।

বললে, কেষ্টদা, দেখুন বুদ্ধদেব বসু আমাকে এই চিঠি লিখেছেন।

দেখলাম কবি বুদ্ধদেব বসু ওকে লিখেছেন : সুকান্ত, তোমার মতো একজন উদীয়মান কবির কবিতা 'স্বাধীনতা'র মতো একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হতে দেখে, খুবই ব্যথিত হলাম [স্মৃতি থেকে বলছি, ভাষা অন্য হলেও বক্তব্য এ-ই ছিলো]।

চিঠি পড়ে আমি সুকান্তকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কোনো জবাব দাওনি ?

সুকান্ত হাসতে হাসতে বললে, হ্যাঁ দিয়েছি, লিখলাম : যাদের জন্য আমার কবিতা, তাদের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে বলে আমি ততোধিক গর্বিত।

পার্টি মহলে সুকান্তর কবি ও কর্মী হিসাবে তখন নাম হচ্ছিলো। এই সময়েও অনেকদিন দেখেছি স্নেহকাঙাল মন নিয়ে সে ছুটে আসতো আমাদের বাড়ী। রান্নাঘরের পাশটিতে আমার মায়ের কাছে বসে পড়ে শোনাতো রামায়ণ-মহাভারত। মাতৃহারা সুকান্তর

অযত্নে লালিত চেহারাটি দেখে আমার মা-ও তাকে খুব ভালোবেসে ফেলেছিলেন।

আর তার স্নেহকাঙাল মন ছুটে যেতো জ্যাঠামশায়ের বাড়ীর দিকে। ওঁরা তখন শ্যামবাজার অঞ্চলে বাস করতে শুরু করেছেন। অনেকদিন রাত দশটা-এগারোটার সময় দেখেছি সুকান্ত নারকেল ডাঙার পোল পেরিয়ে ক্লান্ত পায়ে হাঁটতে হাঁটিতে বাড়ী ফিরছে। আমিও হয়তো বাড়ী ফিরছি বাসে করে, বাস থেকেই দেখতে পেলাম ওকে, রাস্তার বাঁ ধার ঘেঁষে হাঁটতে হাঁটতে সুকান্ত বাড়ীর দিকে যাচ্ছে! পরের দিন দেখা হতেই বকুনি দিলাম, সুকান্ত, অত রাত্তিরে হেঁটে বাড়ী ফিরছিলে দেখলাম কাল—কোথায় গিয়েছিলে ?

শ্যামবাজারে, জ্যাঠামশায়ের বাড়ী।

তা হেঁটে কেন ? অতোখানি পথ, বাসে ফিরতে পারোনি ?

আর কোনো কথা নেই সুকান্তর মুখে। একদম চুপ।

গেলাম শ্যামবাজারে রাখলদাদের বাড়ী। বলতেই ওঁরা হৈ-হৈ করে উঠলেন—দেখেছো কি কাণ্ড! ও ওই রকমই। বললাম আমরা, সুকান্ত বাসভাড়া নিয়ে যা। তা ও বললে, আছে আমার কাছে। দেখো দেখি কী কাণ্ড, এতোখানি পথ—

এই রকম একদিন নয়, প্রায় প্রতিদিনই রাতে সুকান্ত তিন চার মাইল পথ হেঁটে হেঁটে বাড়ী ফিরতো। সময়ে খেতো না। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি ছিলো একেবারেই উদাসীন। এমনও অনেকদিন গেছে—সারাদিন সুকান্ত কিছুই খায়নি, কলকাতার পথে পথে ঘুরেছে কেবল টই-টই করে। পার্টির কাজে, কিশোর বাহিনী গড়ে তোলার কাজে ছিলো তার অফুরন্ত উৎসাহ।

সুকান্তর কবিতার আদর দেখে অনেক কবিই তখন তাকে নিজের শিষ্য বলে জাহির করার চেষ্টা করতেন। সুকান্ত এসব কথা শুনে হাসতো আর বলতো, জানেন কেষ্টদা, আজ এঁরা আমার কবিতায় পঞ্চমুখ, কিন্তু এমনও দিন গেছে যখন এঁদের কাছে কবিতা নিয়ে

যাওয়াতে কতো অবহেলা করেছেন আমাকে, কোনোরকম উৎসাহ দেননি কোনোদিন।

একদিন বললে, সাহিত্যে চুরি কি রকম হয় জানেন ?

আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম ওর দিকে।

সুকান্ত বলতে লাগলো, আমার 'সিগারেট' কবিতাটা লেখার পর একজন বিখ্যাত কবিকে পড়ে শোনালাম একদিন—উনি শুনে-টুনে তাচ্ছিল্য করে বললেন—হুঃ তুমি আর কবিতার নাম পেলে না, শেষে সিগারেট !—বুঝলাম কবিতাটি ওঁর ভালো লাগেনি, তাই কোনো কথা না বলে চলে এলাম। এর কিছুদিন পরে সেই বিখ্যাত কবি একটি পত্রিকায়—আমার কাছে অখ্যাত কিন্তু ওঁদের কাছে বিখ্যাত একটি পত্রিকায়, একটি কবিতা লিখলেন—'এ্যাসট্রে'। দেখি হুবহু আমার কবিতার নকল।

আমি এসব কথা ওর মুখে শুনে ওকে উৎসাহ দিয়ে বলতাম, যাকগে, যে যাই বলুক সুকান্ত, তুমি যা ভালো মনে করবে তাই লিখে যাও, কারো কথা শুনে থেমে যেওনা।

থেমে যায়নি সুকান্ত। কবিতা আর কাজ সমানে চালিয়ে চলেছিল সে। একদিন হন্তদন্ত হয়ে আমার কাছে এসে বললে, কেষ্টদা, একটা গরমের প্যাণ্ট আছে, দেবেন আমাকে ?

বললাম, কেন, প্যাণ্ট আবার তোমার কি হবে ?

সুকান্ত খুব উৎসাহের সঙ্গে জবাব দিলো, চট্টগ্রামে যাবো ষ্টুডেন্টস্ কন্‌ফারেন্সে, অবন্তীদা [কবি অবন্তীকুমার সান্যাল] বলেছেন আমাকে নিয়ে যাবেন। একটা গরমের প্যাণ্ট থাকে তো দিন।

তখন শীতের শুরু।

আমি বললাম, কিন্তু বাড়তি গরমের প্যাণ্ট তো আমার নেই সুকান্ত।

ওতেও কিন্তু নিরুৎসাহ নয় সুকান্ত। বললে, ও, নেই ? আচ্ছা ঠিক আছে, দেখছি আর কোথাও পাওয়া যায় কি না ?

চলে গেলো ও।

কিন্তু প্যান্ট একটা শেষ পর্যন্ত পেলো সে। কোমর বড় ঢলঢলে জীর্ণ, হাঁটুর কাছে এতোখানি গোল কালির দাগ লাগা প্যান্ট। তাই পরে সুকান্ত কোমরে একটা চওড়া চামড়ার বেল্ট লাগিয়ে নিলো। ঢলঢলে প্যান্টের কোমর বেল্টের বাঁধনে কুঁচকে গেলো, কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই সুকান্তর। তাই পরে সে অবন্তীর সঙ্গে চললো চট্টগ্রাম।

কন্‌ফারেন্স শেষে ফিরে আসতেই জিজ্ঞেস করলাম, সুকান্ত চট্টগ্রামে গিয়ে কি রকম কন্‌ফারেন্স করলে—বলো তো শুনি।

সুকান্ত প্রথমেই খানিকটা হেসে নিলো। তারপর আমার হাতটা ধরে বললে, জানেন কেষ্টদা, ভীষণ এক মজা হয়েছে ওখানে গিয়ে—বলেই আবার ওর সেই হাসির দমক!

বললাম, মজাটা কি তাই বলোনা!

জানেন—সুকান্ত বলতে শুরু করলো, চট্টগ্রামে তো গেলাম। ওখানে আগেই কে খবর দিয়েছিলো সুকান্ত আসছে। তা আমরা পৌঁছতেই ছাত্ররা অবন্তীদাকে চেপে ধরলো—সুকান্ত কই?—আমি অবন্তীদার পাশেই ছিলাম, কিন্তু উনি আমাকে না দেখিয়ে মজা করে বললেন, তোমাদের কবি সুকান্তকে তোমরাই খুঁজে নাও না, সে এখানে, এই আমাদের মধ্যেই আছে। ব্যাস, আর যায় কোথায়, ছেলেরা তখন এই বাবরী চুলওলা পাঞ্জাবী পরা কবি সুকান্তকে খুঁজতে লেগে গেছে। কিন্তু কোথায় কি? শেষে নিরাশ হয়ে তারা অবন্তীদাকেই চেপে ধরল আবার—কোথায় সুকান্ত, আমরা তো খুঁজে পাচ্ছি না, আপনিই দেখিয়ে দিন। উনি হাসতে হাসতে বললেন, পারলেনা তো? ওই ছাখো তোমাদের কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য বসে আছে। ঢোলা প্যান্ট আর ছিটের শার্ট গায়ে এই কেলে রোগা সুকান্তকে দেখে ওরা তো প্রথমে ভারী অবাক।

তারপর ক'জন এগিয়ে এলো আমার কাছে। ছোটো ছোটো খাতা বাড়িয়ে দিয়ে বললে, একটা কবিতা লিখে দিন। কি কবিতা লিখবো ভাবছি, এর মধ্যে একজন আবার জিজ্ঞেস করে বসলো— আপনার ঠিকানাটা কি—একটু বলবেন ?—

অমনি, জানেন কেষ্টদা, আমার মাথায় এসে গেলো :

ঠিকানা আমার চেয়েছ বন্ধু—
ঠিকানার সন্ধান,
আজও পাওনি ? দুঃখ যে দিলে করব না অভিমান ?
ঠিকানা না হয় না নিলে বন্ধু,
পথে পথে বাস করি,
কখনো গাছের তলাতে,
কখনো পর্ণকুটীর গড়ি।

ওদের খাতার পাতায় লিখে দিলাম ওই কবিতা !

বলে সে আবার হাসতে লাগলো।

চট্টগ্রামের কন্‌ফারেন্সেও সুকান্তর ওই 'ঠিকানা' কবিতাটিই পড়া হয়েছিলো সেবার।

এর কিছুদিন পরে সুকান্ত হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লো। পার্টি পরিচালিত বৌবাজারের রেড্ এইড্ হোমে ওকে রাখা হলো। কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত ভুল চিকিৎসা হলো সুকান্তর। চিকিৎসকের চোখে টি. বি. রোগ ধরা পড়লো না, চলতে লাগলো পেটের রোগের চিকিৎসা। ওদিকে সেই অবকাশে সুকান্তর আসল রোগ ধীরে ধীরে তার জাল বিস্তার করে চললো।

আমি তখন পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফে কাজ করি। রোজই অফিস থেকে ফেরার পথে সুকান্তকে দেখে তবে বাড়ী আসি। নানাভাবে সান্ত্বনা দিই তাকে, উৎসাহ দিই, সুকান্ত তুমি ভালো হয়ে উঠবে, আবার লিখবে ভালো করে, পার্টির কাজ করবে।

একদিন ওকে দেখতে যেতেই সুকান্ত বললে, জানেন কেষ্টদা,

আজ ডেলিগেট্‌স্‌রা এসেছিলো আমার সঙ্গে দেখা করতে। তারা বললে, আমার কবিতা বিদেশী ভাষায় অনুবাদ হবে।

ওর চোখে মুখে আনন্দের দীপ্তি দেখলাম আমি। বললাম, হ্যাঁ, হবেই তো।

আর একদিন আমি যেতেই সুকান্ত হাত ধরে কাছে বসালো। খুব খুশী-খুশী লাগছিলো ওকে। হেসে বললে, জানেন কেষ্টদা, আজ একজন বিরাট লোক আমাকে দেখতে এসেছিলেন—আমি ভাবতেই পারিনি যে তিনি দেখতে আসবেন কোনোদিন আমাকে!—বলেই সে হাসতে লাগলো।

বললাম, কে এসেছিলো সুকান্ত, বলো না?

আপনি ভেবে বলুন দেখি!—ছেলেমানুষের মতো মাথা দুলিয়ে বললে সুকান্ত।

আমি জবাব দিলাম, বাঃ, আমি কি করে বলবো, কে তোমাকে দেখতে এসেছিলো!

তখন সুকান্ত বেশ দীপ্ত কণ্ঠে বললো, গণেশ ঘোষ—গণেশ ঘোষ আজ দেখতে এসেছিলেন আমাকে।

ওকে বেশ গর্বিত, আনন্দিত মনে হলো আমার।

বেচারী! সেদিন ও জানতো না যে ওই দেখতে আসা মানুষটির থেকে অনেক, অনেক বেশি নাম ওর নিজেরই একদিন হবে!

আর একদিনের ঘটনা মনে পড়লে আজো আমার দুঃখ হয়।

সেদিন আমি জিজ্ঞেস করলাম, সুকান্ত, তোমার কি হতে ইচ্ছা করে?

আমার কথা শুনে ও অনেকক্ষণ ধরে হাসলো। তারপর একদম চুপ করে গেলো হঠাৎ, তারপর বললে, যা হতে ইচ্ছা করে তা কোনোদিনই হতে পারবো না কেষ্টদা।

কি সেটা, বলোনা শুনি!

সুকান্ত ম্লান হেসে আস্তে করে বললো, বাংলার অধ্যাপক।

কিন্তু তা আমি কোনোদিনই হতে পারব না কেষ্টদা; আমি অঙ্কে ফেল করি। ম্যাট্রিক পাশই করতে পারব না কোনোদিন। আর ম্যাট্রিক না পাশ করলে কলেজে পড়বো কি করে বলুন?

বুঝলাম সুকান্তর মনের কষ্টটি কোথায়। আরো ভালো করে বাংলা সাহিত্যের চর্চা করার জন্যই সুকান্তর বাংলার অধ্যাপক হবার ইচ্ছা ছিলো।

আমি ওকে উৎসাহ দেবার জন্য বললাম, সুকান্ত, অঙ্ককেই তোমার ভয়, এই তো?

সে ঘাড় নাড়লো।

এবার আমি জোর গলায় বললাম, ঠিক আছে, অঙ্ক বাদ দিয়েই যদি আমি তোমার কলেজে পড়ার ব্যবস্থা করে দিই?

এই কথা শুনে ওই দুর্বল রোগী সুকান্ত অদম্য উৎসাহে বিছানার ওপর সোজা হয়ে উঠে বসলো, হয় কেষ্টদা? অঙ্ক বাদ দিয়ে পড়া যায় কলেজে?

যায়। জুনিয়ার কেম্‌ব্রিজে, সিনিয়ার কেম্‌ব্রিজে হয় ওরকম।

সুকান্ত আমার হাত দু'টি ধরে ব্যগ্র কণ্ঠে বললে, আপনি ব্যবস্থা করে দেবেন আমায়?

হ্যাঁ, দেবো, তুমি ভালো হয়ে ওঠো, সব ঠিক করে দেবো।

সুকান্তকে আশ্বাস দিয়ে ফিরে এলাম সেদিন।

কিছুদিন পরে সুকান্ত একটু সুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরে এলো। আবার শুরু করলো নাওয়া-খাওয়ার অনিয়ম, ঘোরাঘুরি।

এর ফলে আবার সে অসুস্থ হয়ে পড়লো। বাড়ীতে দেখবার মতো কেউ থাকলে অতো তাড়াতাড়ি আবার সে অসুস্থ হয়ে পড়তো না।

আবার হাসপাতালে যেতে হলো তাকে, এবার আর বৌবাজারে নয়, আরো দূরে যাদবপুরে।

আমি তখন পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফের একটি বড় ধর্মঘট নিয়ে

ব্যস্ত ছিলাম। সুকান্তকে নিয়মিত ওখানে দেখতে যাওয়ার অবকাশ ঘটতো না। আমার ভাই মণি যেতো, সে-ই সুকান্তর খবর নিয়ে এসো বলতো মা আর আমার কাছে।

তারপর একদিন সব শেষ হয়ে গেলো। হঠাৎ বজ্রাঘাতের মতো এলো সুকান্তর মৃত্যু-সংবাদ।

সুকান্তর মৃত্যুর পরদিন ওর একটি বড় ফটো ছাপা হলো 'স্বাধীনতা'-র পৃষ্ঠায়। বেরুলো ওর কবিতা, খবর।

মাকে এসে দেখালাম সেই কাগজ। সুকান্তর ছবি দেখে মা ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। আকুল কণ্ঠে বলে উঠলেন, সুকান্ত তুই এতো বড় ছিলি কোনদিন বলিসনি আমাকে ?—মানুষ না চলে গেলে জানা যায় না সে কতো বড়!

বলতে বলতে মায়ের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো।

পরের বছর আমরা সুকান্তর জন্মোৎসব পালন করেছিলাম আমাদের স্থানীয় নারকেলডাঙা হাইস্কুলের একটি বড় হলঘরে। উদ্দেশ্য ছিলো এ অঞ্চলের লোককে সুকান্তর কথা আরও বেশি করে জানাবার।

সভায় সুকান্তর কথা কিছু বলার জন্য আমরা অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যকে নিয়ে এলাম। সুকান্ত জগদীশবাবুকে বরাবরই শ্রদ্ধা করতো। উনি আমাদের পার্টির লোক নন, তবু বরাবর সুকান্তকে উৎসাহ দিতেন।

জগদীশবাবুর কথায় সুকান্ত বলতো, কেষ্টদা, পার্টির বাইরের কোনো লেখক আমাকে কোনোদিন উৎসাহ দেননি, বরং উপেক্ষা করেছেন, ঠাট্টা করেছেন, কিন্তু এই অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যই একমাত্র মানুষ, যিনি প্রথম দিন থেকেই আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন, বহু স-স্নেহ উপদেশ দিয়েছেন।

তাই সুকান্তর প্রথম জন্মবার্ষিকীর আয়োজন করে আমরা জগদীশবাবুকেই নিয়ে এলাম।

জগদীশবাবু মর্মস্পর্শী ভাষায় সমবেত সকলকে শোনালেন সুকান্তর কথা। বলতে বলতে আবেগে কণ্ঠ বার বার রুদ্ধ হয়ে আসতে লাগলো তাঁর। সব শেষে উনি বললেন: রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি, তিনি একাশী বছর বেঁচে ছিলেন। এই দীর্ঘ জীবনে তিনি বহু মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করে রেখে গেছেন আমাদের জন্য। কিন্তু সুকান্ত, কিশোর কবি সুকান্ত মাত্র একুশ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেছে। রবীন্দ্রনাথ এই একুশ বছরে কি ছিলেন? একুশ বছর বয়সের মধ্যে কতোটুকু সাহিত্য তিনি উপহার দিয়েছিলেন দেশবাসীকে? সুকান্তও যদি রবীন্দ্রনাথের মতো একাশী বছর বাঁচতে পারতো, তাহলে কি সে রবীন্দ্রনাথের থেকে অনেক, অনেক বড় কবি হতে পারতো না?

এ প্রশ্ন শুধু জগদীশবাবুর একার নয়, আমারও, আমাদের সকলের।

অনুলিখন: বিশ্বনাথ দে

আমার বন্ধু সুকান্ত

মণিগোপাল বসু

সুকান্ত আমার বাল্যবন্ধু। একসময়, একই বাড়ীতে, বলতে গেলে একই ঘরের চৌহদ্দির মধ্যে আমরা হেসে খেলে, ছুটোপাটি করে মানুষ হয়েছি।

হরমোহন ঘোষ লেনে, আমাদের বাড়ীর ঠিক পিছনে সুকান্তদের দু'তলা মাঠকোঠায় তখন সুকান্তর বাবা ও জ্যাঠামশায়ের দু'টি পরিবার একসঙ্গে যৌথভাবে বসবাস করতেন। তারপর কাছেই ওর জ্যাঠামশাই নিজে আলাদা নতুন বাড়ী তৈরী করে পৃথক হয়ে যান।

আমাদের, অর্থাৎ সুকান্তর আর আমার বয়স তখন সাত-আট বছরের বেশী হবে না।

সুকান্তর জ্যাঠামশায়ের ওই নতুন বাড়ীতে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই হঠাৎ এক গভীর শোকের ছায়া নেমে এলো। ওদের বাড়ীর একমাত্র কিশোরী মেয়ে সুকান্তর জ্যাঠতুতো বোন রানীদি মারা গেলেন। তারপর সুকান্তর জ্যাঠতুতো বড় দাদা গোপালদারও মৃত্যু হলো ওই নতুন বাড়ীতেই।

এই মর্মান্তিক দুটি ঘটনার পরে সুকান্তর জ্যাঠামশাই ওই নতুন বাড়ী ছেড়ে নিজের সংসার নিয়ে অন্যত্র চলে যান।

সুকান্তর বড়দাদা মোনাদা [মনোমোহন ভট্টাচার্য] তখন আমাদের বাড়ীরই পিছনের একটি অংশে নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে বসবাস শুরু করেন।

ওই সময় সুকান্ত বেশীর ভাগ সময়ই তার বড়দাদা মোনাদা ও তাঁর স্ত্রী বড় বৌদির কাছে আমাদের বাড়ীতে থাকতো।

মোনাদা ও আমাদের নিজেদের পরিবার এমনভাবে একসঙ্গে মিলে

মিশে এক হয়ে গিয়েছিলো যে, বাইরের কোন লোক দেখলে আমাদের যে পৃথক পরিবার তা বুঝতে ও বিশ্বাস করতে পারতো না। ওই সময় থেকেই সুকান্তর পড়ার বইয়ের চেয়ে বাইরের বইয়ের দিকে টানটা বেড়ে উঠেছিলো। ন-দশ বছর বয়সেই সে নানা রকম ছড়া বানিয়ে আমাদের অবাক করে দিতে পারতো।

রমা রানী দুই বোন পরীর মতন
সবে বলে মেয়ে দুটি লক্ষ্মী কেমন।

কিংবা

বল দেখি জমিদারের কোন্‌টি ধাম ?
জমিদারের দুই ছেলে রাম শ্যাম।*

এই সব ছড়া সে সেই সময়েই বানিয়েছিলো।

সুকান্তর যে দেয়ালে লেখা ছড়ার লাইনগুলির কথা লোক জানে, সেগুলি আমাদের বাড়ীতে মোনাদা থাকার সময় তাঁর ঘরের দেয়ালেই সে লিখেছিলো :

দেয়ালে দেয়ালে মনের খেয়ালে
লিখি কথা
আমি যে বেকার পেয়েছি লেখার
স্বাধীনতা।

এই ছড়াটি আমাদের বাড়ীর ঘরের দেয়ালে লেখা ছড়াগুলিরই একটি।

আমার মনে আছে, ওই সময় আমাদের বাড়ীতে থাকাকালীন মোনাদা তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে একদিন সাংসারিক কারণে সামান্য ঝগড়ার মতো করেছিলেন, নিতান্তই পারিবারিক খুটিনাটি। সুকান্ত তখন সেখানে হাজির ছিলো। দাদা-বৌদির এই ঝগড়া দেখে সে খুব দুঃখ অনুভব করে। বড় বৌদিকে সুকান্ত খুবই ভালোবাসতো।

ওই সময় সে আপনমনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘরের দেয়ালে লিখে দিলো :

হে রাজকন্যে
তোমার জন্যে
এ-জনারণ্যে
নেইকো ঠাঁই।
জানাই তাই॥

এই প্রসঙ্গে জানাই সুকান্ত তার ওই বৌদিকে খুব জ্বালাতনও করতো, নানাভাবে তাঁকে বিরক্ত করতো, কিন্তু বৌদি সুকান্তকে নিজের ছেলের মতো ভালোবাসতেন, সুকান্তকে কোনদিন মারধোর করা দূরে থাক সামান্য বকা-ঝকা করতেও বড় একটা তাঁকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এর জন্য আমার মা বড় বৌদিকে অনেক সময় বকেছেন।

তখন সুকান্তদের বাড়ীতে প্রায়ই কোন-না-কোন উৎসব-অনুষ্ঠান হতো। এই রকম একটি অনুষ্ঠানের কথা আমার মনে আছে। সেই ঘটনাটি বলছি।

সেবার সুকান্তদের বাড়ীর কোনো একটি ছেলের পৈতে না কি ওই ধরনের একটি উৎসবের আয়োজন হলো।

আমাদের আর ওদের বাড়ীর মধ্যে একটি বড় কদম গাছ ছিলো। গাছের ঠিক পাশেই ছিলো পরিষ্কার ফাঁকা জায়গা।

ওদের বাড়ীতে কোনো উৎসব হলে সেই গাছের পাশের ফাঁকা জায়গাটিতে বড় উনুন তৈরী করা হতো। আর সুকান্তর বাবা সেই উনুনের সামনে বসে বড় বড় জিলিপি ভেজে খাওয়াতেন অতিথি-অভ্যাগতদের। খুব চমৎকার সুস্বাদু জিলিপি ভাজতে পারতেন সুকান্তর বাবা। সে জিলিপির স্বাদ আজও আমি ভুলিনি।

তা সেবারেও নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি। যথারীতি তিনি জ্বলন্ত উনুনের সামনে বসে রসের কড়া থেকে গরম জিলিপি তুলে তুলে বড় কানা-উঁচু-জায়গায় জমা করে রাখছেন। ওদিকে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা খেতে বসেছেন।

আর সুকান্ত ?

সে তখন সেই জিলিপি গরম অবস্থাতেই অন্য একটি পাত্রে তুলে এনে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের কাছে নয়, অন্য একটি ঘরে, যেখানে আমরা তার বন্ধু-বান্ধবরা বসেছিলাম সেখানে নিয়ে এসে আমাদের মধ্যে বিলি করে দিচ্ছে !

এই রকম একবার নয়, কয়েকবারই সে বাবার সামনে থেকে জিলিপি তুলে এনে পরিতৃপ্ত সহকারে খাওয়ালো আমাদের।

বন্ধুদের হাতে-হাতে জিলিপি বিলিয়ে দিয়ে সুকান্ত গর্বিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, কি, কেমন জিলিপি তৈরী করেছেন আমার বাবা, ভালো না ?

আমরা সেই সুস্বাদু গরম জিলিপি খেয়ে সমস্বরে বলতে লাগলাম, হ্যাঁ, হ্যাঁ—খুব ভালো, চমৎকার।

ওদিকে কিন্তু তখন গোলমাল লেগে গেছে !

নিমন্ত্রিত অতিথিরা যেখানে খেতে বসেছেন, সেখান থেকে ঘন ঘন জিলিপির তাগিদ আসছে, কই, জিলিপি কই ? একটিও জিলিপি এখনও এলো না যে !

সুকান্তর বাবা তো ভারী অবাক হয়ে গেলেন এবার।

ওদিকে জিলিপি যায়নি, তবে গেলো কোথায় সুকান্ত অতো জিলিপি নিয়ে ?

একটু সন্দেহও হলো তাঁর। যে ছেলে বাড়ীর উৎসব-অনুষ্ঠান হৈ-চৈ-এর মধ্যে নিজে কখনো ধরা-ছোঁয়া দেয় না, সে আজ হঠাৎ নিজেই যেচে পরিবেশন করতে এলো কেন, এটাও তো ভাববার কথা !

এরপর খোঁজাখুঁজি করতে ধরা পড়ে গেলো জিলিপি হাতে সুকান্ত, আর তার বন্ধুরা—আমরা সকলেও ধরা পড়ে গেলাম। তবে আমরা সবাই ছোটো, তাই বিশেষ বকুনি খেতে হলো না, বড়রা এ ব্যাপারটা হেসেই উড়িয়ে দিলেন।

আর একটি ঘটনা মনে আছে।

এই কথা মনে পড়লে আজো আমি অবাক হয়ে ভাবি, সেই কিশোর বয়সে আমাদের বন্ধু সুকান্ত কী অসীম জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলো!

তখন সুকান্ত সারা বাংলায় কিশোর বাহিনী সংগঠনের কাজে ব্যস্ত। বাংলার নানা জায়গায় 'কিশোর বাহিনী' গড়ে উঠছে।

সুকান্ত তখন 'স্বাধীনতা'র 'কিশোর সভা'র পরিচালক।

এই সময় আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর দিদির বাড়ী বনগাঁতে বেড়াতে গেছি। তখন দু' একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হতে গল্প করার ফাঁকে কিভাবে তারা জেনে গেল যে, সুকান্ত ভট্টাচার্য আমার বন্ধু। ব্যাস, ওই একটি সূত্রই যথেষ্ট। যে কথা প্রথমে দু' জন ছেলে জানলো, দশ মিনিটের মধ্যে তা জানলো কুড়ি জন। আর এই খবর দুশো জন ছেলে জানতে এক ঘণ্টার বেশী সময় লাগলো না।

বনগাঁয়ের কিশোর মহলে সুকান্তর অসীম জনপ্রিয়তা আবিষ্কার করলাম আমি। সুকান্তকে কেউ তারা দেখেনি, তাই তার সম্বন্ধে কৌতূহল তাদের অসীম। সুকান্ত কেমন, সুকান্ত কখন কি করে, তার ধ্যান-ধারণা, খেয়াল-খুশীর খবর তারা জানতে চাইলো আমার কাছে। শুনতে পেলাম সকলের সমবেত আকুল কণ্ঠস্বর, আপনি সুকান্তদার বন্ধু। সুকান্তদার কথা আমাদের কিছু বলুন। আমাদেরও 'কিশোর বাহিনী' আছে। আমরা সুকান্তদার কথা শুনতে চাই।

সুকান্ত আমার বন্ধু শুনে তারা এমনভাবে সমীহের চোখে আমার দিকে তাকালো, যেন আমিই সুকান্ত!

ধরে নিয়ে গেলো তারা আমাকে 'কিশোর বাহিনী'র মাঠে।

খবর পেয়ে দূর-দূর থেকে আরো অনেক কিশোর ছেলে এসে জুটলো তাদের প্রিয় সুকান্তদার কথা শোনবার জন্য।

বনগাঁয়ের ইস্কুলে শিক্ষকতা করতেন তখন 'পথের পাঁচালী'র স্রষ্টা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিভূতিভূষণ সে সময়ে বনগাঁতেই ছিলেন। কয়েকজন উৎসাহী কিশোর তাঁকেও টেনে নিয়ে এলো সেই জমায়েতে।

আমাকে দেখিয়ে একজন ছেলে তাঁকে বললে, স্যার, ইনি কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের বন্ধু।

বিভূতিভূষণ সহজ সরল দিলখোলা মানুষ। আমার পরিচয় শুনে বললেন, তাই নাকি? তাহলে তো খুব ভালো। সুকান্তর কথা কিছু বলতে হচ্ছে আমাদের! বলো কিছু, আমরা শুনি।

বললাম আমি, যা জানি, যতটুকু জানি সুকান্তর কথা, সব বলতে হলো। ছেলেদের সঙ্গে-সঙ্গে শিশুর মতো সহজ-সরল মন নিয়ে বিভূতিভূষণও শুনলেন আমার সব কথা।

অতোগুলি ছেলে উদগ্রীব হয়ে শুনলো। আমার বক্তব্য শেষ হবার পরেও যেন তাদের আশা মেটে না! জিজ্ঞেস করলো আরো কতো খুঁটিনাটি কথা। কতো অবাক সহজ-সরল প্রশ্ন।

সেদিন সুকান্তর ওই জনপ্রিয়তা দেখে শুধু অবাক হইনি, মনে মনে গর্ব অনুভব করেছিলাম আমি। বার বার অনুভব করেছিলাম, এই এতোগুলি কিশোরের মনে যে ছেলেটি শ্রদ্ধার আসন পেতে নিয়েছে সে সুকান্ত—সুকান্ত! আমার বন্ধু, আমারই বন্ধু!

সুকান্ত লিখেছিলো :

> আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
> করে যাব আশীর্বাদ,
> তারপর হব ইতিহাস।

তা সত্যিই, সেদিনের কিশোর-প্রিয় সুকান্ত আজ ভারতের প্রান্তে প্রান্তে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কবি-জীবনের শুরুতে সে যে দুঃসাহসীর ভঙ্গীতে লিখেছিলো : তারপর হব ইতিহাস—এ লাইনটিকে তার আজ আর অত্যুক্তি বলে মনে করবে না কেউ। সুকান্ত আজ সত্যিই ইতিহাস হয়ে উঠেছে।

অনুলিখন : বিশ্বনাথ দে

দু'টি বাইশে শ্রাবণের স্মৃতি

পারুল বসু

সুকান্তর কথা আমাকে কিছু বলতে বলেছেন। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, ওর সম্বন্ধে কিছু বলবার মতো অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠার আগেই আমাদের ছেড়ে সুকান্ত চলে গেছে।

আমার দাদা প্রভাত ভট্টাচার্য রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইতেন, গান শিখতেন গীতবিতানে। সুকান্তও রবীন্দ্র-সঙ্গীতের খুব অনুরাগী ছিলো।

আমার মনে হয় এই সূত্রেই, আমার দাদা সুকান্তর চেয়ে বয়সে বড় হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর সঙ্গে সুকান্তর একাত্মতা গড়ে উঠেছিলো। সে প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে, আমার দাদার রবীন্দ্র-সঙ্গীত চর্চার আসরে এসে বসে থাকতো। আমাদের দু'তলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রায়ই দেখতাম, নিচে দিয়ে সুকান্ত গুণ গুণ করে রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে হেঁটে চলেছে। রবীন্দ্রনাথের 'সে দিন আজি কোন্ ঘরে গো খুলে দিলো দ্বার'—এই গানটি সুকান্তর মুখে মুখে ফিরতো সব সময়ে।

আমাদের বাড়ী প্যারীমোহন সুর গার্ডেন লেনের ও-মাথায়, আর সুকান্তরা তখন থাকতো এ-মাথায়, ওই রাস্তারই মোড়ে নারকেলডাঙা মেন রোডের একটি বাড়ীতে।

সুকান্ত প্রায় প্রতি রবিবার সকালে আমাদের বাড়ীতে এসে আমার দাদাকে টেনে নিয়ে যেতো হরমোহন ঘোষ লেনে কে. জি. বসুদের বাড়ীতে। ওই বাড়ীতে তখন সুকান্তর বড়দাদা শ্রীমনোমোহন ভট্টাচার্য তাঁর নিজের সংসার নিয়ে ভাড়া থাকতেন। মোনাদার একটি রেডিও ছিলো। তাই রবিবার হলেই আমার দাদাকে সঙ্গে করে সুকান্ত মোনাদার ঘরে গিয়ে হাজির হতো। ওখানে রেডিও খুলে পঙ্কজ মল্লিকের রবীন্দ্র-সঙ্গীত শেখানোর অনুষ্ঠান শুনতেন আমার দাদা। একদিন ওই ভাবে রেডিওর গানের অনুষ্ঠান শুনতে গিয়ে, মোনাদার সাধের এক পাথরের টেবিল ভেঙ্গে ফেলেছিলেন দাদা।

মোনাদার ঘরে এই গানের অনুষ্ঠান শুনতে যাওয়ার ব্যাপারেই আমার দাদার সঙ্গে সুকান্তর ঘনিষ্ঠতা বেশী করে বেড়ে ওঠে।

এই রবীন্দ্রনাথের গানের সূত্রে আমার দু'টি বাইশে শ্রাবণের সন্ধ্যার স্মৃতি মনে পড়ছে।

১৯৪৩ সাল। তখনকার বালিগঞ্জ লেকের সীমানার মধ্যে 'ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটি' নামে একটি সংগঠন গড়ে উঠেছিলো। ওই সংগঠনের সভ্য-পৃষ্ঠপোষকরা প্রায় সকলেই এসেছিলেন কলকাতার নামকরা ধনী অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে। সুকান্তর জ্যাঠতুতো মেজদাদা শ্রীরাখাল ভট্টাচার্যও ওর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

সেবার ওই সোসাইটির রবীন্দ্র-স্মরণ অনুষ্ঠান হবে শুনলাম বাইশে শ্রাবণের সন্ধ্যায়। আরো শুনলাম রাখালদার চেষ্টায় ওই অনুষ্ঠানে সুকান্ত তার স্বরচিত কবিতা পাঠ করবে আর আমার দাদা গাইবেন রবীন্দ্রনাথের গান।

আমার তখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা হয়ে গেছে, অনুষ্ঠানের আগের দিন রেজাল্টও বেরিয়ে গেছে। তাই খুশীতে মন ভরপুর। দাদার কাছে বায়না ধরলাম আমিও যাবো লেকের ফাংশনে। দাদা রাজী হয়ে আমাকে সঙ্গে নিলেন।

রাখালদারা তখন শ্যামবাজার অঞ্চলে থাকতেন, তাই প্রথমে আমরা ওই বাড়ীতেই গেলাম। সুকান্ত আমাদের যাওয়ার আগে থেকেই ওখানে হাজির ছিলো। আমরা সবাই একত্র হয়ে লেকের বাইশে শ্রাবণের অনুষ্ঠানে গেলাম।

সেদিন ওই অনুষ্ঠানে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আর দেবব্রত বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের গান গেয়েছিলেন। আমার দাদা গাইলেন একটি কোরাস গান, আমিও সে-গানে অংশ গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করলাম।

সুকান্ত সেদিন লেকের ওই অনুষ্ঠানে, ওই ধনী অভিজাত সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক আসরে পড়ে শোনাবার জন্য তার 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাটি লিখে নিয়ে গিয়েছিলো। বেশ মনে আছে, অত্যন্ত

সাধারণ কাগজে, দোমড়ানো-মোচড়ানো ভিজে ন্যাতার মতো একটি ব্রাউন রঙের খাতার পৃষ্ঠায় লিখে নিয়ে গিয়েছিলো ওর ওই পরবর্তীকালের বিখ্যাত কবিতাটি।

কবি বুদ্ধদেব বসু আর অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য সেদিন ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সুকান্ত তাঁদের সামনে তার 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতা পড়ে শোনালো।

অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের ভাবভঙ্গী দেখে মনে হলো, অল্পবয়স্ক আর রাখালদার ভাই বলেই যেন দয়া করে সুকান্তকে কবিতাটি পড়তে দেওয়া হয়েছে!

সুকান্তর গায়ে আধময়লা জামা, পায়ে জুতো নেই, ওই অভিজাত সমাবেশে সামিল হওয়ার মতো সাজ পোশাক চেহারা তার মোটেই ছিলো না। অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে লাজুক সুকান্ত মাথা নিচু করে কোন রকমে কবিতাটি পড়ে শেষ করলো।

সভার অধিকাংশ লোকই ছিলেন কবিতা সম্বন্ধে উদাসীন। তাই সুকান্তর কবিতার ওই স্মরণীয় লাইনগুলি কারো মনেই কোনো সাড়া তুললো না। সে যখন পড়ছিলো :

> আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি,
> প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।
> আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সরিতে প্রতীক্ষায়,
> আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়,
> আমার রোমাঞ্চ লাগে অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাতে,
> আমার বিস্ময় জাগে নিষ্ঠুর শৃঙ্খল দুই হাতে।

তখন, আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, অনুষ্ঠানের শ্রোতারা পরস্পরের মধ্যে নিচু গলায় কথা বলছিলেন। প্রায় শ্রোতাই ছিলেন অমনোযোগী। ওর কবিতা পড়া শেষ হতে, উপস্থিত শ্রোতাদের মুখ-চোখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো, যেন ওই আলোক-উজ্জ্বল কেতাদুরস্ত অনুষ্ঠানে বিরাট এক ছন্দপতন ঘটিয়ে ফেলেছে সুকান্ত!

অভিজাত ধনী সম্প্রদায়ের ওই মানুষগুলি যেন সুকান্তর ওই জ্বালাময়ী কবিতার বক্তব্য সহ্য করতে পারেননি সেদিন। কেউ কেউ বিরক্তও হয়েছিলেন!

সারা দেশে তখন প্রবল অস্থিরতা, যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ মহামারীর করাল ছায়া। সুকান্তর কবিতার ভাষায় 'জঠরের নিঃশব্দ ভ্রূকুটি'কে উপেক্ষা করে মানুষ দু' মুঠো খাদ্যের জন্য রেশনের লাইনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রতীক্ষিত।—এই পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে ওই বক্তব্য ছাড়া আর তার কি হবে?

কিন্তু সুখী সুস্থ অভিজাত মানুষের সমাবেশে ওর ওই কবিতা কোনো অভিনন্দনই পাইনি সেদিন।

তাই, সুকান্তর স্বরচিত কবিতা পড়ার একটি বিশ্রী অভিজ্ঞতা নিয়ে সেদিন ফিরে আসতে হয়েছিলো আমাদের।

এরপর আর একটি বাইশে শ্রাবণের সন্ধ্যার কথা মনে আছে।

সেবার আমাদের বাড়ীর নিচের ঘরে আমার দাদা বাইশে শ্রাবণের দিনে এক রবীন্দ্র-স্মরণ-অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। বাড়ী আর পাড়ার ছেলে-মেয়েরা তাতে অংশগ্রহণ করে। দাদা অনেকগুলি রবীন্দ্র-সঙ্গীত গেয়েছিলেন। সুকান্ত শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ওখানে হাজির ছিলো। তারপর অনুষ্ঠানের শেষে সবাই বিদায় নিয়েছে, আমরা বাড়ীর ছেলেমেয়েরা ওপরে উঠে গেছি, এমন সময় দাদার খুব ব্যস্ত চিৎকার আমার কানে এলো। নিচের ঘর থেকে আমার নাম ধরেই ডাকছিলেন দাদা।

ব্যস্ত পায়ে নেমে এলাম। ঘরে ঢুকে দেখি, দাদার সমানে দাঁড়িয়ে সুকান্ত।

ও খালি বলছে, থাক না প্রভাতদা, ও ঠিক হয়ে যাবে, আমি বাড়ী চলে যাচ্ছি—

আর, আমার দাদা সুকান্তকে টেনে ধরে রেখে বলছেন, না, দাঁড়াও, ব্যস্ত হয়োনা, আমি পরিষ্কার করে আইডিন লাগিয়ে দিচ্ছি।

দেখি সুকান্তর হাঁটু কেটে ঝর ঝর করে রক্ত পড়ছে।
তবু ওদিকে ওর খেয়াল নেই, দাদার হাত ছাড়িয়ে চলে. যেতে চাইছে ও। আর দাদাও রক্ত মুছে আইডিন না লাগিয়ে ছাড়বেন না।
আমাকে দেখে দাদা বললেন, তুলো আর আইডিন নিয়ে আয় তো।
বললাম, কি করে কাটলো ?
দাদা কিছু বলার আগেই সুকান্ত জবাব দিলো, এখান থেকে যাবার সময় রাস্তায় পড়ে গিয়েছিলাম।—বল্‌ছি প্রভাতদাকে, কিছু হয়নি—ছেড়ে দিন, তবু ছ্যাখোনা ছাড়ছেন না।
আমি কিছু না বলে তাড়াতাড়ি তুলো-আয়ডিন এনে দিলাম।
খানিক পরে দাদার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে চলে গেলো সুকান্ত।
সেইদিন স্বচক্ষে দেখলাম নিজের শরীর সম্বন্ধে কতখানি উদাসীন ছিলো সুকান্ত।
এটা হলো শ্রাবণ মাসের ঘটনা, এর ক'মাস পরেই কার্তিক মাসে, হঠাৎ মাত্র ছ-সাত দিনের অসুখে আমার দাদা মারা যান। সে সময় সুকান্ত খুব অসুস্থ ছিলো। সে-ও এর ছ' মাস পরে, পরের বছরের বৈশাখ মাসে আমাদের ছেড়ে চলে গেলো।
তখন কলকাতায় কুখ্যাত হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা চলছে।
সন্ধ্যাবেলা সেদিন আমার ছোটবোনকে সঙ্গে নিয়ে বালিগঞ্জ থেকে ফিরছি, বাসে মাঝপথে কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে কে. জি. বসু উঠলেন। বললেন, 'সুকান্তকে পুড়িয়ে ফিরছি।'
মনটা বিষাদে ভরে গেলো।
তার অনেক পরে কে. জি. বসুর সঙ্গে আমার বিবাহ হয়। শ্বশুর-বাড়ীতে এসে শাশুড়ী, স্বামী আর দেওর-ননোদদের কাছে সুকান্তর অনেক গল্প শুনেছি। সেসব কথা ওঁরা বললে অনেক ভালো করে বলতে পারবেন, আমার মনে সুকান্তর স্মৃতি, দু'টি বাইশে শ্রাবণের সন্ধ্যার স্মৃতি হয়েই উজ্জ্বল হয়ে আছে।

অনুলিখন : বিশ্বনাথ দে

সুকান্ত ও মার্কসবাদী কবিতা

বিমলচন্দ্র ঘোষ

কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিকালে অগ্নিশুদ্ধ তারুণ্যের কবি সুকান্তর জীবনমুকুল বৃন্তচ্যুত হয়। একটি মহৎ সম্ভাবনাময় কবিসত্তার ওপর নেমে আসে করাল মৃত্যুর অন্ধকার যবনিকা। সেই শোকাবসন্ন দিনটির কথা আমরা ভুলিনি। সুকান্ত তার স্বল্পপরিসর জীবনে সবশুদ্ধ যতগুলি কবিতা লিখেছিল তখনো সেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। সেজন্যে সে সময়ে যাঁরা তার আলোচনা করেছিলেন তাঁদের কারুর পক্ষেই সুকান্তর কবি প্রতিভার সামগ্রিক পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয়নি। যতদূর মনে পড়ে সুধীন্দ্রদত্তোত্তর 'পরিচয়'-এর কোনো একটি সংখ্যায় বন্ধুবর জগদীশ ভট্টাচার্য সুকান্তর কবিতা নিয়ে একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মনে সুকান্ত সম্পর্কে কৌতূহল জাগিয়েছিল। সুধীন্দ্রনাথ 'পরিচয়'-এর মালিকানা বিক্রি করে দেবার পর নবপর্যায় 'পরিচয়'-এর সাহিত্যাদর্শ পছন্দ করেননি। কারণ তিনি গোঁড়া অ্যান্টি-কমিউনিস্ট না হলেও বাংলা সাহিত্যে কমিউনিজম্‌-এর ক্রমবর্ধমান প্রভাব প্রসন্নমনে গ্রহণ করতে পারেননি। আত্মনিষ্ঠ-প্রজ্ঞাবাদী কবি ও সমালোচক সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন লিবারাল বুর্জোয়া। অশেষ বিদ্যাবৈদগ্ধ্যসম্পন্ন এই অমায়িক স্বভাবের অভিজাত কবি তখন কোনো দুর্জ্ঞেয় কারণে সাহিত্যক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ জনকয়েক কবি সাহিত্যিকের সঙ্গে ঘরোয়া আলাপ আলোচনা করতেন। দীর্ঘকাল পরে হঠাৎ একদিন সুধীন্দ্রনাথের কাছ থেকে তাঁর ফ্ল্যাটের ঘরোয়া বৈঠকে কবিতাপাঠের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধপত্র পেয়ে আমি বিস্মিত হই। পরে জেনেছিলুম সে সময়ে আমরা কি ধরনের কবিতা লিখছি জানবার জন্য ওঁর মনে তীব্র কৌতূহল জাগে। তিনি তাঁর

অন্তরঙ্গদের মধ্যে থেকে মাত্র চার-পাঁচজন কবি সাহিত্যিককে সাদর আহ্বান জানিয়েছিলেন। সন্ধ্যার সময়ে তাঁর ফ্ল্যাটে উপস্থিত হয়ে দেখি আমার আগেই সেখানে বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, জ্যোতির্ময় রায় প্রভৃতি প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিকরা উপস্থিত হয়েছেন। আমি সুধীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শ সম্পর্কে অবহিত ছিলুম বলেই খুব সচেতনভাবেই কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো শতবার্ষিকী (১৮৪৮-১৯৪৮) উপলক্ষে প্রকাশিত আমার 'ফতোয়া' কাব্যপুস্তিকাটি নিয়ে গিয়েছিলুম। সেই বৈঠকে বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে ও আমি, আমাদের স্বনির্বাচিত কবিতা পাঠ করি। আমার মুখে আমার 'উত্তরাকাশের তারা' কবিতাটির আবৃত্তি শুনে উনি আঙ্গিক ও ভাষার তারিফ করলেও content পছন্দ করেন নি। সেই বৈঠকে সুধীন্দ্রনাথ আধুনিক কবিতার নানা দিক নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করেন। 'পরিচয়'-পত্রিকায় প্রকাশিত জগদীশ ভট্টাচার্যের উপরোক্ত প্রবন্ধটির মধ্যে সুকান্তর বিভিন্ন কবিতার যে উদ্ধৃতিগুলি ছিল সেগুলি সুধীন্দ্রনাথের মনে রেখাপাত করেনি। তিনি 'Immature !'—এই মন্তব্য করেছিলেন। স্বল্পভাষী কবি বিষ্ণু দে সুকান্তর আদর্শনিষ্ঠা ও কাব্যানুরাগের প্রশংসা করেন। বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'কবিতা' পত্রিকায় সুকান্ত সম্পর্কে যে প্রবন্ধটি লেখেন, তিনি সেই প্রবন্ধে ঘোষিত তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্যের পুনরুক্তি করেন। সুধীন্দ্রনাথ সুকান্তর কোনো লেখাই পড়েননি জেনে আমি কিছুদিন পরে সুকান্তর কিছু কবিতা সংগ্রহ করে তাঁকে পড়তে দিই। পড়ার পর তিনি আমাকে বলেন, সুকান্তর আন্তরিকতাপূর্ণ ভাষা ও ছন্দ তাঁর ভালো লেগেছে। কিশোর কবির অকাল বিয়োগে তিনিও আমাদেরই মতো ব্যথিত।

সুকান্তর কবিতা সম্পর্কে সে সময় অনেকগুলি পত্রিকায় যে সব আলোচনা বেরিয়েছিল সেগুলির বেশির ভাগই শোকব্যঞ্জক ও প্রশস্তিবাচক। কলকাতার তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মহলের কোনো-

কোনো উন্নাসিক কাব্যসমালোচক কিশোর কবির অকাল মৃত্যুতে যথাবিহিত দুঃখ প্রকাশ করেও কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে সুকান্তর মার্কসবাদী আদর্শানুসরণের নিন্দা করেছিলেন। এই শেষোক্ত দলের বক্তব্য হলো, সুকান্ত যদি রাজনীতিকে কাব্যের বিষয় রূপে গ্রহণ না করতো তাহলে অনেক বেশি শক্তির পরিচয় দিতে পারতো। সমাজনিরপেক্ষ ব্যক্তিত্বের অভাবে কবিতাগুলি সার্থক পরিণতি লাভ করতে পারেনি। উপরন্তু এঁরা এই বলে অপপ্রচার করেছিলেন যে, পার্টির রাজনৈতিক কর্মসূচী অনুসরণ করতে গিয়ে সুকান্তর প্রত্যেকটি কবিতাই উদ্দেশ্যপ্রবণ প্রচারধর্মী হয়ে পড়েছে।

ব্যক্তি-স্বাধীনতার ধ্বজাধারী এই ধরনের রাজনীতিবিদ্বেষী কলাকৈবল্যবাদী সমালোচকদের দুরভিসন্ধিমূলক বক্তব্য প্রচারকে আমার মতো অনেকেই ঘৃণিত অপরাধ বলে মনে করতেন। কারণ এঁদের সাহিত্যাদর্শ কায়েমীস্বার্থেরই অনুকূলে প্রচারিত শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ শত্রুতা। এঁদের দিয়ে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালানোর জন্য পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী গোপন তহবিল থেকে মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করা হতো। লোকায়ত চেতনায় উদ্দীপ্ত প্রগতিসাহিত্যের বলিষ্ঠ সমর্থনে আমরা তখন বারে বারে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছি, 'হ্যাঁ, আমাদের সাহিত্য নিশ্চিতরূপেই উদ্দেশ্যপ্রবণ। এই উদ্দেশ্যপ্রবণতার জন্য আমরা গর্বিত। শুধু এ দেশে নয়, পৃথিবীর সমস্ত দেশেই সর্বহারা শোষিত শ্রেণীর কোটি কোটি মানুষ যতদিন পর্যন্ত ধনবাদী, সামন্তবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী দাসত্ব-শৃঙ্খল থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ না করে, ততদিন পর্যন্ত আমাদের সাহিত্যে উদ্দেশ্যপ্রবণতা থাকতে বাধ্য। একেই আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্বের সাধনা বলে মনে করি।'

ধনবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের পক্ষছায়াতলে লালিত পালিত রাজনীতিবিদ্বেষী কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও সমালোচকরা সমাজে শোষিত ও নিগৃহীত শ্রমিক শ্রেণীর দুঃখ-বেদনা-লাঞ্ছনায় বিচলিত

হন না। 'জনগণ' কথাটা শুনলেই এঁদের নাক সিঁটকে যায়। মহান কবি রবীন্দ্রনাথের মানবপ্রেমও এঁদের কাছে অসহ্য। শোষক ও শাসকবর্গের হিংস্র অভিজাত্যের দম্ভকে এঁরা আবহমানকালের শ্রেণীসংঘাতময় ও নির্লজ্জ শক্তি প্রতিযোগিতার সমাজে যোগ্যতমের ন্যায়সঙ্গত অধিকার বলে মনে করেন। ভাগ্য, অদৃষ্ট ও বিধিলিপির এঁরা ধারক ও বাহক। পাশ্চাত্য ক্ষয়িষ্ণু সাহিত্য-সংস্কৃতির আবর্জনা কুণ্ড থেকে খুঁটে খুঁটে উচ্ছিষ্ট ভোজনের দ্বারা এঁরা এঁদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছেন। এই জঘন্য দাসমনোভাব থেকে উদ্ভুত কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, চিত্রকলা ও প্রবন্ধদির Form and Content দেখলেই বোঝা যায় বাংলাসাহিত্যের একটি বৃহদাংশ আজ লোকবিমুখী বিকৃতির কোন্ নরকে পৌঁছে গেছে। জ্যাক লিণ্ডসে বলেছেন: 'Poetry is a lost art in England for the moment, in the United States, in Canada, because the poets are writing to poets, to critics, to professional intellectuals.' এ কথা উপরোক্ত বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য; বুর্জোয়া ক্ষয়িষ্ণু কবিদের কবিতা আজ একটি সর্বস্বান্ত শিল্প। মাটিতে যার শিকড় নেই, জনমনে নেই শ্রদ্ধার আসন, কাব্যরসিকচিত্তে যা বিরক্তি সঞ্চারক। আত্মমুখিতায় অন্ধ মেরুদণ্ডহীন ও পৌরুষবর্জিত আয়ান-গোত্রজ এই দুর্ভাগা কবিরা এঁদের সমানধর্মা কবিদের জন্য, 'গাঁয়ে মানে না-আপনি-মোড়ল' ভুইফোঁড় সমালোচকদের জন্য ও পেশাদার বুদ্ধিজীবীদের মনোহরণের জন্যই কবিতা লিখে থাকেন। কোনান ডয়েল একটা খুব সত্যিকথা বলেছিলেন, আইনস্টাইন যার সমর্থক। তিনি বলেছিলেন: 'The emotional qualities are antagonistic to clear reasoning.' বিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র, দর্শনতত্ত্ব ও ইতিহাস 'Clear reasoning', ছাড়া পর্যালোচনা করা ও এগুলির থেকে সাহিত্যিক প্রেরণা লাভ করা যায়না। বিশাল লোকজীবনের অবিরাম সংঘাতপূর্ণ বহুমুখী

সমস্যাগুলি সঠিকভাবে বুঝতে হলে 'Clear reasoning'-এর সাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য। অলস ও আত্মমুখী কবি-সাহিত্যিকরা এই কঠিন সাধনার ঘোরতর বিরোধী। ফলে তথ্যতত্ত্বযুক্তিহীন নৈরাজ্যবাদী বক্তব্য-বিন্যাসের অর্থহীন আবেগসর্বস্বতা ও গদ্যে পদ্যে নির্বিচার ছন্দ-পতনই ক্ষয়িষ্ণু কবিদের একমাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন। বাল্যকাল থেকেই অঙ্ককষা যাঁদের কাছে বিভীষিকা, তাঁরা অত্যন্ত সচেতন-ভাবেই অঙ্কশাস্ত্রসম্মত 'Clear reasoning'-কে ভয় করেন, এড়িয়ে চলেন। 'Clear reasoning' থাকলে কেউ লোকবিদ্বেষী, রাজনীতি-বিদ্বেষী ও বাস্তবতাবিদ্বেষী হতে পারেন না। সমাজের বুকে মান্ধাতার আমল থেকে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রকার বৈষম্য, ধর্মান্ধতা, শ্রেণীস্বার্থ, এবং এর ফলে নিচেরতলার প্রতি ওপরতলার জাতক্রোধ, ঘৃণা ও নৃশংসতার বিরুদ্ধে এই সব নিরিন্দ্রিয় কবিরা নির্ভিকভাবে লেখনী ধারণ করতে আতঙ্কিত হন। তার কারণ বুর্জোয়া অভিভাবকদের বিরাগভাজন হলে তাঁদের সাংস্কৃতিক জীবন বিপন্ন হবে। সেজন্য কখনোই তাঁরা সজ্ঞানে তাঁদের সুখান্বেষণ ও স্বার্থসিদ্ধির পথে কাঁটা ছড়াতে পারেন না। ঠিক এই কারণেই 'চোরের মায়ের বড় গলা'-র মতো তাঁদের কণ্ঠ থেকে বিপ্লবী কবিদের বিরুদ্ধে এত বিষোদ্গার! ফলে এঁদের সাংস্কৃতিক অসভ্যতা ও মিথ্যাচার চরমে উঠেছে। আমরা অনেকদিন থেকেই লক্ষ্য করে আসছি বুর্জোয়া ভাবাদর্শের চরণচারণ কলাকৈবল্যবাদী সমালোচকরা ও বড় বড় খবরের কাগজের বশংবদ ভৃত্যরা আধুনিক কবিতা প্রসঙ্গে যে সব আলোচনা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশ করেন, সেগুলির মধ্যে অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গেই কাজী নজরুল ইসলাম, সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রভৃতি লোকপ্রিয় কবিদের নামোচ্চারণও করেন না। একেই বলে অভিসন্ধিমূলক সাহিত্য প্রচারের ক্ষেত্রে নীরবতার চক্রান্ত (Conspiracy of silence)। এর দ্বারা এই সব সমাজবিরোধী সমালোচকরা মনে করেন এইভাবে লোকপ্রিয় কবিদের উপেক্ষা করলেই বোধহয় বাংলাকাব্যের ইতিহাস

থেকে তাঁদের নাম মুছে যাবে! এই অশ্রদ্ধেয় ধারণা যে কত বড় ভুল তার প্রমাণ, যত দিন যাচ্ছে ততই লোকপ্রেমিক বিপ্লবী কবিদের স্বীকৃতি সম্মান লোকসমাজে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবং তাঁদের কাব্যগ্রন্থ-গুলি সংস্করণের পর সংস্করণ কাব্যরসিক বাঙালী পাঠকের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে। অন্যদিকে বিপুল বিত্তশালী বুর্জোয়াদের পৃষ্ঠ-পোষকতায় শক্তিশালী প্রচারযন্ত্র হাতে থাকা সত্ত্বেও ক্ষয়িষ্ণু কবি-সাহিত্যিকরা লোক সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পাচ্ছেন না। আত্মম্ভরী বিদ্যাদিগ্‌গজ সমালোচকবর্গ যাঁদের নিয়ে মাতামাতি করেন সেই সব আত্মপ্রসাদগদগদ কবিদের এক একজনের পাঁচশো কপি বই-এর পাঁচ বছরেও সংস্করণ শেষ হয় না। 'জনপ্রিয়তা' কথাটাকে নিয়ে এঁরা হামেশাই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেন এবং ঠিক এই কারণেই দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের মনের মন্দিরে যাঁরা নিত্যসেবিত, সেই লোকমান্য কবিরা এঁদের চোখে কবি নয়। এ কথা ছাপার অক্ষরে বললে সংগ্রামী জনগণের হাতে লাঞ্ছিত হতে হবে জেনেই এঁরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিপ্লবী কবিদের সম্পর্কে নীরবতার চক্রান্তে অংশ-গ্রহণ করেছেন। প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথের পার্ষদকবিদের অন্যতম কবি দ্বিজেন বাগচীর লেখা কবিতার একটি পংক্তিতে তিনি বলেছিলেন : '...আগুন কবে আঁচল দিয়ে লুকিয়ে রাখা যায়?' নজরুল ইসলাম, সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রভৃতি নিষ্ঠাবান কবিদের লোকপ্রেমের অনির্বাণশিখা নীরবতার আঁচল দিয়ে যে ঢাকা যায় না এ কথা অর্বাচীনরা কবে বুঝবে কে জানে!

সুকান্তর মতো অনন্য সাধারণ প্রতিভার অকাল বিয়োগে বাংলা সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। এই যশস্বী কবি বালক বয়সে জ্ঞানবৃদ্ধ, তা না হলে এই অতি অল্প বয়সের রচনাগুলির মধ্যে এমন বিস্ময়কর ছন্দনৈপুণ্য, ভাষা-মাধুর্য ও বিষয়বস্তুর গভীরতা কেমন করে সম্ভব হলো? আধা ঔপনিবেশিক দাসত্বজর্জর ভারত-মৃত্তিকায় নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের অপরিসীম লাঞ্ছনার মধ্যে জন্মগ্রহণ

করেও সুকান্তর জন্ম-বিপ্লবী কবিচিত্তটি নির্ধূম অগ্নিশিখার মতো ঊর্ধ্বমুখীন ও সদাভাস্বর ছিল। জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি সুগভীর নিষ্ঠা, বস্তুনিষ্ঠ দেশপ্রেম, চারিত্রিক সংযম ও নিঃশব্দ নিষ্কাম সাধকের মতো অতুলনীয় অধ্যাবসায় সুকান্তর মধ্যে যেমনটি দেখেছি, এ যুগের আর কোন সমসাময়িক কবির মধ্যে তা বিরল।

প্রায় দশ বছর আগে মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত একটি সাহিত্য সভায় 'সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রসঙ্গে' প্রদত্ত অভিভাষণ।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যেদিন প্রথম যোগ দিই সেদিন আবার সুকান্তর মুখোমুখি হলাম।

আর একটি সজল দিন চোখের উপর ভেসে উঠলো।

তখন ভারতবর্ষ পরাধীন। যাদবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা অরবিন্দ বিল্ডিং-এ কোথাও সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন ছিল না। তখন আমরা বিয়াল্লিশের ঘটনাবহুল কলেজস্কোয়ারের তরুণেরা, কফির কাপে দুধচিনির পরিবর্তে রাজনীতি-দর্শন শিল্প-সাহিত্যের ধোঁয়াই বেশি মেশাতে অভ্যস্ত। মনে করতাম যাদবপুর একটি দুর্গম দূরান্ত গ্রাম। এমনিতে সেখানে আমার কোনই আকর্ষণ ছিল না। অথচ এমনি ঘটনার পরিহাস, সেই যাদবপুরেই দিনের পর দিন এসেছি, কখনো সংগীদের নিয়ে, কখনো একা—বেশির ভাগই একা—কারণ এখানে টি-বি হাসপাতালে শুয়ে আমাদের প্রিয় সুকান্ত।

শেষবার এসেছি তার চলে যাবার ঠিক তিনদিন আগে।

সুকান্ত বলেছিল, 'জগন্নাথদা, কিছু ভাববেন না, এই তো সেরে উঠছি, আবার নারকেলডাঙায় আড্ডা জমাবো, আপনাকেও আসতে হবে। অরুণাচলকে আমার সমস্ত প্ল্যান বুঝিয়ে দেবো।'

প্ল্যান বুঝিয়ে দেওয়া আর হয়ে উঠেনি, তার আগেই সে ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছিল।

সুকান্তর সঙ্গে পরিচয় নিবিড় হয় যখন আমাদের ছোট্ট এক মেসে সে কেম্‌ব্রিজ পরীক্ষার জন্য ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের মহড়া নিতে আসতো আমার কাছে। 'লুসি' কবিতাগুলির যে সমালোচনা সুকান্ত লিখে দেখিয়েছিল, মনে আছে সেগুলির ব্যাকরণগত

ভুল-ভ্রান্তি থাকলেও বক্তব্য একেবারেই তার নিজস্ব। রোমান্টিক কবিতার মর্মগ্রহণ তার মতো করে খুব কম ছেলে-মেয়েই পারে।

নারকেলডাঙার রেল পুলের প্রায় গায়েই সুকান্তদের বাড়ী।

সুকান্ত যখন বেশ অসুস্থ তখন তাকে সংগ ও আনন্দ দেবার জন্যই তার বন্ধুরা প্রতি সপ্তাহেই যেতাম, বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত আড্ডা চলতো, সুকান্ত আধ-শোয়া অবস্থায় এই আলোচনায় যোগ দিত।

রাজনৈতিক মতামতে আমাদের খুব পার্থক্য হত না।

কারণ তখন ইংরেজ তাড়ানোর ব্যাপারটাই ছিল সবচেয়ে জরুরী, এবং তরুণেরা সকলেই একাজে কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্র ঐক্যের ওপর জোর দিতেন। গোর্কির রচনাবলী এবং রবীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে-র কবিতা আমরা ভালোবাসতাম। দুর্ভিক্ষের দিনগুলিতে যখন নানা দলে বিভক্ত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা রিলিফের কাজে কলকাতার বাইরে বহুদূরে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়েছি তখনো ফিরে এলেই সাহিত্য-বৈঠকে যোগ দিতে যেতাম। এই বৈঠক বসতো কখনো বাড়ীতে, কখনো ইডেন গার্ডেনে, ময়দানে, কখনো গংগার ধারে ফোর্ট উইলিয়মের কাছে, কখনো বা বেলেঘাটার একটা তালগাছের ছায়ায় মাটির দেওয়াল দেওয়া ঘরে—যেটা ছিল, আমাদের মতে, কবিবন্ধু অরুণাচলের স্বপ্ন দর্শনের টাওয়ার।

সেই ঘরটা কী করে যোগাড় করা হয়েছিল তা মনে নেই, কিন্তু একথা ঠিক যে—আমরা—অরুণাচল, সুকান্ত বা আমি—ঐ ঘরটাতে বসলেই অসম্ভবতম চিন্তা ও কল্পনার উৎসাহ পেতাম।

অরুণাচলের মা কখনো কখনো এই স্বপ্নদ্রষ্টাদের ডেকে ভর্ৎসনা ও প্রশ্রয় দুই-ই দিতেন। আমরা অন্যত্র সাহিত্যের আড্ডায় যা কখনো বলতাম না বা ভাবতাম না, এখানে বসে সেইসব আজগুবি আইডিয়া—চরম রোমান্টিক ধ্যানধারণার কথা আলোচনা করতাম। তখন মনে হত না আমরা কফি হাউসে রাজনীতি, সমাজনীতি,

পিকাসো, হাক্সলি, এলুয়ার বা নেরুদা নিয়ে এত আলোচনা করে থাকি!

এই ঘরটিতে বসে আমরা বেশিরভাগ সময়ই প্ল্যান করতাম—খুব দূরে কীভাবে আমরা পালিয়ে যাবো, এবং কাকে কীরকম চিঠি লিখে যাবো, অথবা প্রথম একজন পালালে আর দুজনের কী করণীয় হবে—ইত্যাদি।

যে সুকান্ত এখন বাংলা কাব্যের অবিস্মরণীয় কিংবদন্তী, তাকে হয়তো আপনারা এই সুকান্তর সংগে খুব সহজে মেলাতে পারবেন না।

যদিও অন্যান্য সুকান্তকে বাদ দিয়ে এই সুকান্ত নয়, তবু আমার নিজের কাছে এই সুকান্তই সবচেয়ে প্রিয় এবং সবচেয়ে জীবন্ত, এবং যাদবপুর হাসপাতালে আমি তো এই সুকান্তকেই দেখতে আসতাম।

'পলায়নী মনোবৃত্তি' আমাদের তরুণ মহলে একটা খুব বড়ো গালাগাল ছিল, কিন্তু অরুণাচলকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন আমার মতো সেও মনে করে কি না যে আমাদের মধ্যে সুকান্তই সবচেয়ে বড়ো পলাতক এবং মিথ্যুক। কারণ 'সেরে উঠছি' এবং 'আবার আড্ডা জমাবো' বলে সে যে পালাবার ফন্দি আঁটছিল—পালাবার তিনদিন আগেও কেউ তা বুঝতে পারেনি।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যেদিন প্রথম আসি সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত বলতে গেলে সুকান্তর মুখোমুখিই আছি। এত কাছের মানুষ সম্বন্ধে কোনো গোছানো কথা বলতে আমার একটুও ভালো লাগেনা।

অরণি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

আশ্চর্য নতুন এক চোখে

অরুণাচল বসু

পৃথিবীর সকল প্রাণবান কবিদের মতোই সুকান্তরও ছিলো সুন্দরের প্রতি গভীর ভালোবাসা। প্রকৃতি বা মানুষ, যেখানেই হোক, সুন্দরের দেখা পেলে সে অভিভূত, উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতো। কিন্তু তার লেখায় সেদিকটি বড় না-হয়ে যেটা বড় করে ফুটেছে তা হলো অভাবী মানুষের প্রতি ভালোবাসা আর তার মুক্তির জন্য সংগ্রামের কঠিন পণ। কারো কাছে প্রিয়, কারো কাছে অপ্রিয় তার সেইসব ক্ষুব্ধ পংক্তিই বেশি করে ছড়িয়েছে চারদিকে :

পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

তাই এর আড়ালে বালুর তলায় স্রোতোধারার মতো প্রায় চাপা-পড়ে থেকেছে তার সেই অপরূপ সৌন্দর্য-কোমল, স্বপ্ন-মুগ্ধ মনটি। তবু পৃথিবীর রূপ-রস-সৌরভে বিমোহিত তার 'আশ্চর্য নতুন চোখে'র চাহনি একেবারে লুকিয়ে থাকার নয়। একটু কান পেতে, চোখ মেলে, ছুঁয়ে দেখলেই এই দিকটিও আমাদের আচমকা আনন্দের মধুর সৌরভে ভরিয়ে দেবে।

কিন্তু এ-দিকটিকে তেমনি করে প্রকাশ করবার মতো যথেষ্ট ঘটনা নেই আমার ঝুলিতে।…তাই তারই কিছু অপ্রকাশিত বা প্রকাশিত হয়েও হয়তো খানিকটা নজর-এড়িয়ে-যাওয়া রচনা বা রচনার অংশ থেকেই বিশেষ করে এ-দিকটিকে তুলে ধরতে চেষ্টা করবো।

আমরা সুকান্তকে কবি বলেই জানি। অর্থাৎ সে ছন্দময় আনন্দের—ইঙ্গিত-ঝলকিত ভাবরূপের কারিগর। কিন্তু শুধু কবিতা নয়; প্রথম দিকে সুকান্ত কয়েকটি ছোটগল্প, নাটক, নাটিকা—এমন কি একটি উপন্যাসের অংশবিশেষও লিখেছিলো।

এইসব লেখার মধ্যেই প্রথমে জেগে-উঠে ধরা পড়ে তার এই সৌন্দর্য-মুগ্ধ স্বপ্নময় মনটি।—এমনি একটি অসম্পূর্ণ ছোটগল্পের একটুকরো তুলে দিচ্ছি…:

গল্পটির শুরু :

সন্ধ্যা নামতে শুরু করেছে। ধারোয়ার বুকে তারই কালো ছায়া। নিমন্ত্রিতের মতো নিঃশব্দে প্রতিটি নক্ষত্র জড়ো হলো আকাশের আসরে। আকাশের কোনো এক অদৃশ্য কোণ থেকে একদল বকেরা উড়ে এলো।

চাঁদের আলো নদীর ধারের স্বচ্ছ বালিতে লুটিয়ে প'ড়ে নিবিড়-ভাবে জড়িয়ে ধরে প্রতিটি বালুকণাকে। সেই চাঁদের আলো নিজের দেহে কুড়িয়ে নিয়ে অনেকে বসে গল্প করছে। তাদের কথালাপে, উন্মুখ হাসিতে ধারোয়া-তীর গুঞ্জনে মুখরিত। কিন্তু নিস্তব্ধতা ছড়িয়ে আছে প্রতিটি কথার ফাঁকে-ফাঁকে। কারও হঠাৎ-গাওয়া গানের কলিতে চমকে ওঠে না সেখানকার সমাধি-গম্ভীর নিসর্গ, দূর থেকে ভেসে-আসা-তরুণীর কলহাস্যে সাড়া দেয় না এই তপস্যামগ্ন পরিপার্শ্ব। তবু সেখানে জনতার নিত্য যাওয়া-আসা।…

তবুও আমাদের এই আলোড়ন-কোলাহল মুখর নাগরিক জীবন থেকে বহু দূরে, সুদূর কোনো কল্পনার ধারোয়া-তীরেই শুধু সীমাবদ্ধ রইলো না তার এই কল্প-ভ্রমণ। সেখান থেকে সে ফিরে এলো—পুরোপুরি শহরে না-হলেও অন্তত শহরের উপকণ্ঠে।

এমনি এক গ্রাম-ঘেঁষা শহরতলির এক গার্হস্থ্য-জীবনের এক দুপুরের ছবি আঁকছে আর একটি ছোটগল্পের অংশে :

থেমে থেমে একটা ঘুঘুর ডাক অনেকক্ষণ ধরে শোনা যাচ্ছিলো, বেচারা বুঝি ক্লান্ত হয়ে পড়লো,…কারো মনোযোগ আকর্ষণ না-করতে পেরে বুঝিবা থেমেই গেলো। একটি চিল কোথায় যেন কলহাস্যে দুপুরবেলাটাকে উচ্চকিত করে তোলবার চেষ্টা করলো। কিন্তু মৌনী মধ্যাহ্ন সাড়া দেবে না…। সে শুধু সকলকে চুপ করতে ইঙ্গিত জানাচ্ছে:

এমন সময় উদাস অকুন্ঠিত দমকা হাওয়া এসে ঘরে ঢুকলো। একটা খোলা বইয়ের কয়েকটা পাতা উল্টে গেলো খুব তাড়াতাড়ি। একটা দ্বিধাগ্রস্ত বোলতা জানলার কাছে বহুক্ষণ ধরে ঘোরাফেরা করছিলো। এখন কি ভেবে ঢুকে পড়লো ঘরে।…

তারপর এসে পৌঁচেছে একেবারে শহরেই। সেখানকার এক ইট-লোহায় গড়া বাড়িতে একদিন তার গল্পের নায়কের কয়েকটি মুহূর্ত-যাপনার বর্ণনা :

মাঝরাত্রে ঘুমের মধ্যেই সে অনুভব করলো—সমস্ত আকাশ ছেয়ে বৃষ্টি নেমেছে। আর সেই সঙ্গে ঝড়ের সমুদ্র বুঝি পাগল হয়ে উঠেছে অবিশ্রান্ত কলরোলে। একটানা গভীর দীর্ঘ ঝড়-বৃষ্টির সুরকে যেন অর্কেষ্ট্রার মতো মধুর লাগতে লাগলো তার। শেষ-রাত্রি অদ্ভুত রোমাঞ্চময়তায় আবিল হয়ে উঠলো ক্ষণে ক্ষণে। সমস্ত পৃথিবী বোধহয় প্লাবিত হয়ে গেলো বর্ষণের এই অবিরাম ধারায়। ঘুমের মধ্যে প্রবল বারিপাতের শব্দকে যেন এক স্বপ্নময় গুঞ্জরণধ্বনি বলে মনে হলো তার।

দু-এক ফোঁটা ঠাণ্ডা জলের কণা গায়ে পড়তেই কিন্তু স্বপ্ন এবং তন্দ্রা দুই-ই ছুটে গেলো, তবু বিছানা ছেড়ে ওঠবার কোনো চেষ্টাই সে করলো না।

কিন্তু শুধু গল্পে নয়। তার সেই একেবারে শিশুকালের রূপকথা-লোকের সদ্যস্ফুট কবিমন—যে-মন তার দুটি ছোট্ট বোনকে দেখে বলেছিলো :

রমা-রানী দুই বোন পরীর মতন

—তা তখন আর একটু পরিণতি পেয়েছে এমনি সময়ে লেখা বোধহয় 'রাখালছেলে' নামে তার একটি গীতি-নাটিকার কথা মনে পড়ে। সেই রাখালছেলে বনের হরিণীকে ডেকে বলছে :

ওগো বনহরিণী—
আমি তো পাশে এসে বসতে তোমায়
নিষেধ করিনি।

এমনি 'মধুমালতী' নামে আর একটি গীতি-নাটিকার কথাও স্মরণে আছে। সেখানেও বিকীর্ণ হয়ে ছিলো এমনি নিবিড় মাধুরীর অজস্র মণি-মরমত। প্রাণ-টলমল সেই ছোটগল্প ও কাব্য-নাটিকাগুলি সময় মতো প্রকাশিত হলে আমরা সুকান্তর আর এক রূপ দেখতে পেতাম।*

কিন্তু এই সমস্ত রচনা সুকান্তর কবি-প্রতিভার হয়তো গৌণ দিক। আসল দিক্ তার কবিতা। সেই কবিতার মধ্য দিয়ে তার সৌন্দর্য-রুচির বিকাশই অধিকতর গভীর ও মৌলিক।

সুকান্তর অতি দ্রুতপরিণতিশীল, অতি সংক্ষিপ্ত জীবনকালের সেই প্রথম কৈশোরে লেখা একটি কবিতার কথা আজো ভুলতে পারিনি। মনে আছে কবিতাটিতে অন্তর্নিহিত এক বেদনার্ত রূপ-ব্যাকুলতায় কী গভীরভাবে আচ্ছন্ন, আপ্লুত হয়েছিলাম আমি।

গোটা কবিতাটি 'পূর্বাভাষে' আছে। এখানে কয়েকটি লাইন শুধু উদ্ধৃত করি :

আজ রাতে যদি শ্রাবণের মেঘ হঠাৎ ফিরিয়া যায়
তবুও পড়িবে মনে
চঞ্চল হাওয়া যদি ফেরে কভু হৃদয়ের আঙিনায়
রজনীগন্ধা বনে
তবুও পড়িবে মনে।
বলাকায় পাখা আজো যদি ওড়ে সুদূর দিগঞ্চলে
বন্যার মহাবেগে
তবুও আমার স্তব্ধ বুকের ক্রন্দন যাবে থেমে

* আলোচিত রচনাগুলির কয়েকটি বর্তমানে গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়েছে।—সম্পাদক

মুক্তির ঢেউ লেগে
বন্যার মহাবেগে।······

এবং এই কবিতায় ছিলো এমন সব পংক্তি যা সেই অনস্ফুট কৈশোরের রচনা বলে ভাবতে এখনো বিস্ময় জাগে।

কিন্তু এসব রচনাগুলি লিখেও সুকান্ত প্রকাশ করতে দেয়নি। দিনে-দিনে তার কবিদৃষ্টি মোড় নিয়েছে অন্যদিকে। মস্তবড় বিশ্ব-জগতটার দিকে ফিরে তাকিয়ে তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অন্য আর একটি কথা—সুন্দরের পায়ে শিকল বাঁধা।

যে-সৌন্দর্যের মাধুরীতে এতদিন মগ্ন হতে চেয়েছে সে, চাঁদের দেহে মসির ছাপের মতো তাকে আবিষ্ট করে রেখেছে 'কিসের গোপন ছায়া'! অত সহজে নিটোল আর সাবলীল হয়ে তার ফুটে ওঠবার উপায় নেই।

বাস্তব পৃথিবীর প্রকট মূর্তি দেখে সুকান্ত সত্যিই 'অবাক' হয়েছিলো বুঝি: মাঠ-প্রান্তর যারা ফুলে-ফসলে সাজিয়ে তোলে, শহরকে গড়ে রমণীয় করে, যে-'শিল্পী আর মজুরের বহু পরিশ্রমে'ই এ-পৃথিবী যুগে-যুগে অপরূপা—তাদের এর কিছুতে অধিকার নেই।

তাই এর মধ্যে দাঁড়িয়ে সুন্দরের স্বপ্ন দেখা—সে বুঝি শুধু এক বিড়ম্বিত পলায়ন।

এই পলায়নপরতার সংকটকেই এরপর সে রূপ দিলো ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে আর একটি কবিতায়।

'ঘুম নেই'তে প্রকাশিত এই 'মীমাংসা' কবিতাটিতে আছে এক রোমান্টিক বাস্তবিকতার তীক্ষ্ণ ঝলক:

আজকে না হয় সাতসমুদ্র তের নদী
পার হতে সাধ জাগে মনে। হায়, তবু যদি
পক্ষপাতের বালাই না-নিয়ে পক্ষীরাজ
প্রস্রবণের মতো এসে যেতো হঠাৎ আজ,

তা হলে না হয় আকাশবিহার হতো সফল
টুকরো মেঘেরা যেতে-যেতে ছুঁয়ে যেতো কপোল।···

কিন্তু আকাশবিহার অসম্ভব। জীবন-ব্যবস্থার যে-পক্ষীরাজ নিয়ে যাবে সুন্দরের রাজকন্যার কাছে, তার রয়েছে পক্ষপাতের বালাই। যাদের আছে বিত্ত, ধন-দৌলত সুন্দর শুধু তাদেরই। যদিচ আসলে তাদের সেই সুন্দরের 'রাজকন্যার লোভ নেই' লোভ কেবল তার 'অলংকারে'। তাই তাদের কাছ থেকে সুন্দরকে মুক্ত করতে হলে চাই সংগ্রাম।

আর এই সংগ্রামের চেতনাই এরপর প্রধান হয়ে উঠতে থাকলো তার সৌন্দর্যবোধের মর্মলোকে। সুকান্তর প্রতি মুহূর্তের চিন্তাভাবনায় পরিস্ফুট তারই ছাপ। খুঁটিনাটি রচনার মধ্যেও আভাসিত সেই সংগ্রামী সিদ্ধান্ত—সেই প্রতিবাদী বাক্-ব্যঞ্জনার তীক্ষ্ণ দ্যুতি।

এ-প্রসঙ্গে আমাদের দু'জনে লেখা একটি কবিতার কথা মনে পড়ে। একদিন খেলাচ্ছলে এটি লিখিত হয়েছিলো। হারিয়ে যাওয়া সেই গোটা কবিতাটির (কবিতাটির নামকরণ হয়েছিলো—'শতাব্দী') মাত্র একটি স্তবক স্মরণে আছে। সেই স্তবকে যার লেখা যে-পংক্তি সেইভাবেই নির্দিষ্ট করে দিলাম:

অরুণাচল: হৃদয়ের উল্লাস ছন্দের বন্ধন মানে না,
সুকান্ত: চম্পক গন্ধের সুরভিত ক্রন্দন আনে না।
অরুণাচল: যৌবন-খঞ্জন উদ্দাম পিঞ্জর ভাঙতে,
সুকান্ত: রক্তের রঙ্গনে উদ্যত বুঝি আজ রাঙতে।

(আর ঐ কবিতায় সুকান্ত লিখেছিলো আর একটি অপূর্ব পংক্তি: 'জ্যোৎস্নার বুকে অমাবস্যার ফুল যেন ফুটলো')।

রক্তের রঙ্গনে উদ্যত বুঝি আজ রাঙতে—অসুন্দরের বিরুদ্ধে, অসুন্দরকে টিকিয়ে রাখতে চায় যে-শক্তি, তার বিরুদ্ধে, প্রতিবন্ধের মুখোমুখী আরব্ধ সংগ্রামে যৌবন কৃতসংকল্প।

অবশ্য এই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বিপরীত চেতনারও স্বাক্ষর আছে

১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭
সকাল

অরুণ

আমি বড্ড শ্বাসকষ্টে ভুগছি। কাজেই দুএকটা কাজের ভার তোকে দিচ্ছি, আগামী কাল বৃহস্পতির মধ্যে/ কাজগুলো ক'রে তুই আমার সঙ্গে বিকেলেই কাল দেখা করবি। কাজগুলো হচ্ছে

(১) শিশিরের দুর্ভিক্ষের, মন্বন্তর ইত্যাদি কবিতাগুলো জোর ক'রে আদায় ক'রে আনবি।

(২) দেবব্রতবাবুর কাছ থেকে আমাদের দুজনের ছবির পাণ্ডুলিপিটা যে ক'রে হোক সংগ্রহ ক'রে আনা চাই।

(৩) যে জিনিসটার জন্যে তোকে কিছু টাকা দিচ্ছি পারিস তো তাও আনিস।

কাজগুলো খুবই জরুরী। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এবং ওদের বিমানের জিনিসগুলো যথাসম্ভব ক'রে আমার সাথে দেখা করবি। অনেক সুখবর আছে।

— সুকান্ত

বন্ধু শ্রীঅরুণাচল বসুকে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য-র স্ব-হস্তে লেখা একখানি চিঠি।

শ্রীঅরুণাচল বসুর সৌজন্যে প্রকাশিত হলো।

সুকান্তরই কবিতায়। কারণ মানুষের আত্মায় নিহিত চির-শান্তি-চেতনার সন্ধানও এড়িয়ে যেতে পারে না বাস্তবসিদ্ধ নতুন যুগের কবির সর্বব্যাপী রূপ-দৃষ্টিতে :

অসি নাই থাক, হাতে তো আমার কাস্তে আছে,
চাষীর ছেলের অসিকে কি ভালোবাসতে আছে ?

কিন্তু ঐ কবিতায় বা ঐ সময়ের অন্যান্য রচনাতে যে-সংগ্রামী চেতনার স্ফুরণ—তাতেও যেন রয়ে গেলো কেমন একটা কাব্যিক প্রচ্ছন্নতা। শব্দ আর ভাষার রোমান্টিক খোলস ছিঁড়ে যেন ঠিকভাবে পরিস্ফুট হতে পারলো না সেই সংগ্রামের আসল চেহারা। সাব্যস্ত হলো না সে-সংগ্রামে নতুন যুগের কবির সৌন্দর্যবোধের সঠিক কি ভূমিকা।

আর ঠিক এই ক্ষেত্রেই ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে সুকান্তর দৃষ্টির এক ব্যাপক গভীর ভিন্নতর রূপান্তর। সৌন্দর্যবোধের নতুন অর্থ উদ্ঘাটিত হয়ে গেছে তার চোখে :

আজকের দিনে সুন্দর শুধু তারাই যারা সৃষ্টিকে, সৌন্দর্যকে রক্ষা করার দায়ভার তুলে নিয়েছে নিজের বাহুতে।

কবিতার প্রতি তার সততা, সৌন্দর্যের প্রতি তার নিষ্ঠা আর সেই বাস্তবের ঐকান্তিক অনুশীলন ও বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া তাকে ক্রমশ উত্তরিত, উন্নীত করেছে পক্ষগ্রহণের নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে।—সাধারণ মানুষ, মজুর-চাষী আর বিপ্লবী সমাজ-কর্মীদের মহিমা-স্ফুটনে নিযুক্ত হয়েছে তার সৌন্দর্যবোধ।

বড়রা শিল্পের মধ্যেকার সৌন্দর্য-ভাবনাকে বলেন নন্দনতত্ত্ব। সুকান্তর এই দৃষ্টি-বদলকেই যেন বলা যায় সঠিক অর্থে সেই নন্দন-তাত্ত্বিক বিপ্লব। এর মধ্যেই নিহিত তার কবিসত্তার নতুনত্বের নিরীখ। এই বিশেষ গুণের মূল্যেই তার কবিতা সাধারণের এত প্রিয়।

আজকের এই নতুন দৃষ্টিতে সেই গীতি-নাট্যের রাখাল ছেলে,

যে-নেহাতই এক রূপকথা-লোকের স্বপ্নকিশোর—তার ঘটে গেলো কি অভিনব রূপান্তর :

হয়তো এখনি কোনো মুক্তিদূত দুরন্ত রাখাল
মুক্তির অবাধ মাঠে নিয়ে যাবে জনতার পাল।

—জনবাহিনীর পরিচালক অগ্রচারীরূপে সে নতুন করে এসে চমৎকৃত করেছে আমাদের !

হরিণ ছিলো সেই কল্প-কিশোরের চিরাচরিত পার্শ্বচর। আজ তাকে এই বাস্তব পৃথিবীর আকাশ-মাটির দিগন্ত ডিঙিয়ে ছুটতে দেখি আমরা :

অবাক রাতের তারারা আকাশে মিটমিট করে চায়
কেমন করে এ-রানার সবেগে হরিণের মতো যায়।

—নতুন দিনের মানুষের জন্যে নতুন সমাচারবাহী বিঘ্নসংকুল পথের অভিযাত্রী সে।

সুকান্তর এই পরিবর্তিত রূপদৃষ্টির নব-নব উন্মেষ, নতুন নতুন পথযাত্রা শুরু হলো এবার। বিকশিত হতে থাকলো সে দৃষ্টি নানা পর্বে, নানা ভূমিকায়। সেই ব্যাপক রূপ-বিবর্তনের গোটা চিত্রটি তুলে ধরবার মতো যথেষ্ট পরিসর এখানে নেই। শুধু কয়েকটি বিশিষ্ট দিককেই চিহ্নিত করতে চেষ্টা করবো।

সেই দ্বিতীয় যুদ্ধের দিনে যখন ফ্যাসীবাদের পেষণে অসহায়ভাবে লুটিয়ে পড়ছে দেশের পর দেশ, যখন সারা পৃথিবীর মজুর মরণপণ প্রতিরোধের সংগ্রামে রক্ত ঢালছে, সুকান্তর নতুন দৃষ্টি তখন ঘোষণা করেছে সেই মজুরের ভূমিকায় :

তবুও সুদৃঢ় আমি, আমি এক ক্ষুধিত মজুর।
অদূর দিগন্তে আসে ক্ষিপ্র দিন জয়োন্মত্ত পাখা
আমার দৃষ্টিতে লাল প্রতিবিম্ব, মুক্তির পতাকা,
আমার বেগান্ধ হাত, অবিরাম যন্ত্রের প্রসব
প্রচুর প্রচুর সৃষ্টি, শেষ-বজ্র সৃষ্টির উৎসব

ফ্যাসীবাদের উন্মত্ত রাহুর দাঁতের তলা থেকে পৃথিবীকে ছিনিয়ে আনার অস্ত্র, শেষ মুষল সৃষ্টির দায়িত্ব তুলে নিয়েছে দুনিয়ার শ্রমশিল্পী মজুরশ্রেণী।

—কখনো আবার সেই বাংলার চাষী, যে চিরকাল ঘরে ঘরে 'নবান্ন উজাড় করে' পাঠিয়ে নির্ভাবনার হাসি ফুটিয়ে এসেছে সকলের মুখে, আর আজ দুর্ভিক্ষের দিনে মাঠে নতুন ধান রোপণ করে এসে 'শহরের চুল্লিতে' 'পতঙ্গের' মতো যার নিষ্করুণ অসহায় আত্মাহুতি,— সেই কৃষকদের ভূমিকায় উচ্চারিত হয় তার আবেগব্যাকুল দরদ-মথিত আকুতি :

কাস্তে দাও আমার এ হাতে—
সোনালী সমুদ্র সামনে, ঝাঁপ দেবো তাতে।
নিঃশব্দে নিস্তীর্ণ ক্ষেতে তরঙ্গিত প্রাণের জোয়ার
মৌসুমী হাওয়ায় আসে জীবনের ডাক—'
'আজ শুধু কাস্তে দাও আমার এ হাতে।

কিন্তু কেবলমাত্র মজুর আর কৃষকই নয়, সুকান্তের সৌন্দর্যদৃষ্টি গোটা পৃথিবীর সমস্ত সাধারণ মানুষের জন্য। বুদ্ধিজীবী, শ্রমশীল নানা অংশের মানুষ—সকলেই মহিমান্বিত তার চোখে। তার আনন্দ-শিহরণ 'কত যুগ, কত বর্ষান্তের শেষে জনতার মুখে ফোটে বিদ্যুৎবাণী' —এই উপলব্ধির মধুর চেতনায়।

তাই এর পর সেই ব্যাপক জনবাহিনীকে অভিনন্দিত করে ব্যাপ্ত হয় তার রূপচৈতন্য :

জন-পাখিদের কণ্ঠে তবুও আলোর অভ্যর্থনা
দিকে-দিকে প্রতিদিন অবিশ্রান্ত শুধু যায় শোনা।

কিংবা

পৃথিবী ও ইতিহাস কাঁপে আজ অসহ্য আবেগে
ওদের পায়ের স্পর্শে মাটিতে সোনার ধান,
রঙ লাগে মেঘে।

এ আকাশ চন্দ্রাতপ, সূর্য আজ ওদের পতাকা,
মুক্তির প্রচ্ছদপটে ওদের কাহিনী আজ ঢাকা।

কর্মীষ্ঠ মানুষের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় সুকান্তর কবিদৃষ্টি ধারণ করে বিশ্বরূপঃ নানা দেশের জন-অভ্যুত্থানে, জয়-পরাজয়ের আলোড়নে তারও নৈমিত্তিক ওঠা-পড়া। সেই 'খবর-পরী'র পথ চেয়ে উৎকর্ণ হয়ে থাকে সে, যে একদিন খবর নিয়ে আসবে :

পৃথিবী মুক্ত—জনগণ চূড়ান্ত সংগ্রামে জয়ী।

আর সেই রূপদৃষ্টির বিশ্ব-দর্পণে শুধু মানুষ নয়, ক্রমশ প্রতিফলিত হয় মানুষের নিত্য-সহচর এই আলো-আকাশ, মাটি-নক্ষত্রের অপরূপ নিসর্গমণ্ডলও।

সেই নিসর্গ-সমাহিতির অনন্য-মনোহর প্রতিবিম্বন বিকীর্ণ হয়ে আছে তার স্বদেশ-বন্দনার কবিতাগুলিতে :

'আজন্ম দেখেছি আমি আশ্চর্য নতুন এক চোখে
আমার সোনার দেশ, আসমুদ্র ভারতবর্ষকে।'
'আমার সম্মুখে ক্ষেত, এ-প্রান্তরে উদয়াস্ত খাটি,
ভালোবাসি এ-দিগন্ত, স্বপ্নের সবুজ-ঘেরা মাটি।'

কিংবা

ভারতী, তোমার লাবণ্য দেহ ঢাকে,
রৌদ্র তোমায় পরায় সোনার হার;
সূর্য তোমার শুকায় সবুজ চুল,
প্রেয়সী, তোমার কত না অহংকার।

আর কেবল স্বদেশ-মাতৃকার এই বিমুগ্ধ রূপচর্যাতেই পরিতৃপ্তি মানতে চায় না, সীমায়িত হতে চায় না তার যুগান্তচারী কবিদৃষ্টি। তার বাঞ্ছিত আরো বৃহত্তর, আরো মহত্তর কিছু। সে যে চায় 'নতুন নতুনতর বিশ্ব'।

তাই সেই ব্যাপ্ত মুক্ত বিশ্বের—অনাগত ভাবিলগ্নে সেই পূর্ণতর সুন্দরের দ্বারোন্মচনের জন্য স্ফুরিত হয় তার সৌন্দর্যানুভূতির সেই

অতলস্পর্শী ডাক—কেবল একাল নয়, হয়তো সর্বকালের পথিকৃৎ জন-যাত্রীকের মনে যার আবেদন উন্মীলিত হবে ভিন্ন-ভিন্ন তাৎপর্যে, নতুন-নতুন অর্থ-ব্যঞ্জনায় :

রক্তে আনো লাল—
রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল।

'রক্তে আনো লাল' কথাটির কোনো বাচ্যার্থ বা অভিধানগত অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ ঐ-কথাটির এক দুর্নিবার শক্তি মুহূর্তে আমাদের চেতনাকে জাগরূক, আলোড়িত করে তুলে সেই কর্তব্যের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়—যা হয়তো ছিলো সেই রূপসিদ্ধ কবিসত্তায় প্রাক্-কল্পিত, পূর্ব-অভিপ্রেত।

কিন্তু সুকান্তর জীবনের আচমকা যতিপাত তার রূপদৃষ্টির এই নব নব বিকাশের পথেও ছেদ টেনে দিলো অভাবিতভাবে। সেই বিরল, অভিনব কাব্য-জাগরণ ভোরের অস্পষ্ট কুহেলীতেই থমকে রইলো। আরও ব্যাপকতর উন্মেষে, গভীরতায় ও আবিষ্কারের বৈচিত্র্যে সে আমাদের সৌন্দর্যবোধের ধারণাকে অজ্ঞাতপূর্ব দিগন্তে উত্তীর্ণ করে দিয়ে যাওয়ার যোগ্য সময়টুকু পেলো না।

সেই অতৃপ্তির বেদনায় বুঝি তার আশ্বাসেই শুধু প্রবোধ মানতে হয় :

আজ আছি নক্ষত্রের দলে
কাল জানি মুহূর্তের টানে
ভেসে যাবো সূর্যের সভায়···

সেই যুগ-দ্রষ্টার আরব্ধ সৃষ্টিযাত্রায় আচম্বিত যবনিকা নামলো অপূর্ণতার মধ্যপথেই।

তবু এরই মধ্যে, এই অতি কৃপণ আয়ুষ্কালটুকুর ক্ষীণতম অবকাশেও আমাদের রূপবোধের এক পৃথক, ভিন্নতর উপস্থাপনা ঘটেছে সুকান্তরই হাতে। সুকান্তরই প্রয়াস ভিত্তি গঠন করে দিচ্ছে

পেরেছে এক নতুনতর বাস্তবিকতার রূপসংহত কাব্যভাষার। যার উপর দাঁড়িয়ে আগমীদিনের প্রতিভাধর কবি তাঁর নন্দন-সৌধ ওঠাতে পারবেন অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যে ও স্বনির্ভর সাবলীলতায়।

তারও পূর্বভাষণ বুঝি ধ্বনিত হয়েছে সুকান্তরই কণ্ঠে :

'অঙ্কুরিত বন্ধু যত মাথা তুলে আমারই আহ্বানে
জানি তারা মুখরিত হবে নব অরণ্যের গানে।'
'সংহত কঠিন ঝড়ে দৃঢ় প্রাণ প্রত্যেক শিকড়
শাখায়-শাখায় বাধা, প্রত্যাহত হবে জানি ঝড়।'

এবং সেই সম্ভাবী রূপস্রষ্টার কাব্যকৃতির মর্মস্থল থেকে যুগে যুগে উৎসারিত হবে সেই অনন্য প্রাণসঙ্গীর সহৃদয়, সানন্দ আশ্বাসবাণী :

ফল দেবো, ফুল দেবো, দেবো আমি পাখিরও কূজন,
একই মাটিতে পুষ্ট তোমাদের আপনার জন।

সুকান্ত গোলাম কুদ্দুস

প্রতি বৎসর যখনি আমরা কবি সুকান্তর জন্মদিবস পালন করতে সমবেত হই, যখনি আমাদের মনে পড়ে যে-বয়সে অনেকে কাব্য রচনা সুরু পর্যন্ত করে না সেই বয়সে সুকান্ত এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে গেছে, তখনি নতুন করে একবার আমাদের মনে বেদনা উপস্থিত হয়। রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ দান রেখে গেছেন আমাদের সামনে, তাঁকে হারানোর ব্যথা অন্য রকমের ; মাইকেলের মৃত্যুতে আমাদের মন আলোড়িত হওয়ার বেদনাও ভিন্ন প্রকারের, আর আজ নজরুল ইসলাম যে জীবন্মৃত হয়ে রয়েছেন তার জন্য আমাদের আকুতির প্রকৃতিও আলাদা—কিন্তু সুকান্তর কাব্য-প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশের আগেই ঝরে পড়ার জন্য আমাদের প্রায় বিলাপ করতে ইচ্ছে হয়। বিশেষ করে আমরা যারা সুকান্তের সঙ্গে কাজ করেছি, সুকান্তকে নানা ছোটখাট ঘটনার মধ্যে নিকট থেকে পেয়েছি, তাদের অকাল-বিয়োগের দুঃখ বোধ হয় সবচেয়ে বেশী।

অনেকের মতো আমিও ভেবেছি, এতো অল্প বয়সে সুকান্তর এতখানি কাব্য-প্রতিভার বিকাশ হলো কী করে। শুনেছি সুকান্ত তার জ্যেঠতুতো বোন রানীদির কোলে ছোটোবেলায় বেড়ে ওঠে এবং সেই রানীদির কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান এবং কবিতা শুনে-শুনে সে বড় হয়। কিন্তু সুকান্তর বয়স যখন এগারো তখন এই রানীদি মারা গেলেন। সেই সঙ্গে-সঙ্গে মারা গেলেন সুকান্তর মা। প্রৌঢ় পিতা তাঁর বইয়ের দোকান নিয়ে ব্যস্ত। বাড়ীতে টাকা পয়সার যে খুব অভাব, তাও নয়—কিন্তু জীবনে কিছু একটার তীব্র অভাব অনুভূত হয়। স্নেহের কাঙাল থেকে যায় মন—অতো অল্প বয়সে প্রিয়জনের মৃত্যুর শূন্যতা কে পূরণ করতে পারে। মৃত্যুর আঘাতেই বোধহয় কবি সুকান্ত

ছোটো বয়সে বড় হয়ে ওঠে। আর নিজের বেদনা-বোধ অন্যের বেদনার কাছে কিশোর কবিতে টান মারে।

১৯৪২ সালের আন্দোলন এলো। তখন সুকান্ত দেশবন্ধু স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য স্কুলের কর্তৃপক্ষ তার উপর মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। সে স্কুল ছেড়ে অন্য স্কুলে গিয়ে সুকান্ত ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলো। কিন্তু সুকান্ত অঙ্কে ফেল করলো। ইতিমধ্যে ঘনিয়ে এসেছে বাঙালীর চরমতম দুর্দিন, অর্থাৎ ১৯৪৩ সালে মহা দুর্ভিক্ষ সুরু হলো। তার বহু আগেই সুকান্তর কবিতা লেখা সুরু হয়ে গেছে। কলকাতার কঠিন রাজপথে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত কৃষক তখন মরছে হাজারে-হাজারে। এই ধ্বংসের রাজত্বে সুকান্তর বড়দার কয়েকটি বন্ধুর সাথে আলাপ হয়। তাদের মধ্যে ছিলেন তদানীন্তন কালের ছাত্র-ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য। দিনের-পর-দিন অন্নদাশঙ্কর এবং তাঁর বন্ধুদের কাছে সুকান্ত মৃত্যু এবং দুর্ভিক্ষের মধ্যে শুনতে লাগলো জীবনের বাণী, করণীয় কাজের কথা, সেই সঙ্গে তাঁদের কাছে থেকে পেতে লাগলো কাব্যসৃষ্টির উৎসাহ। সেদিন থেকে কবি-সুকান্ত আর কর্মী-সুকান্ত মিলে গেলো। সুকান্ত কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বার হলো, সুকান্ত তার আদরের কিশোর বাহিনী প্রতিষ্ঠা করলো, সুকান্ত দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে 'অভিযান' নাম দিয়ে নাটক লিখলো, 'আকাল' নাম দিয়ে দুর্ভিক্ষের উপর লেখা বহু কবির কবিতা নিয়ে কাব্য সঞ্চয়ন বের করলো।

সুকান্তর একার বেদনা সকলের বেদনার সঙ্গে মিলে গেলো। সুকান্ত অনেক বড় হয়ে উঠলো।

তবু এ পরিচয়ও সুকান্তর বাহ্যিক পরিচয়। বেদনা অনেকে পায়, অভিজ্ঞতা অনেকের হয়; কিন্তু কবিতা সবাই লেখে না, কবি সবাই হয় না। সেজন্য অন্তরের জারক রসে মিশ্রিত করে বাইরের জগৎকে ভিতরের জগৎ করতে পারে, সত্যকে করতে পারে সুন্দর, সেই মানুষই হচ্ছে কবি। অন্তরের সেই প্রক্রিয়া কীভাবে চলতে

থাকে তার হদিস পাওয়া অনেক সময় কবির নিজের পক্ষেই শক্ত। কাজেই সুকান্তর অন্তরের ইতিহাস বলার সাধ্য আমার নেই। তবে সেই অন্তর বস্তুটি জগৎ-নিরপেক্ষ নয়। কবি চিরকাল তাঁর যুগকে প্রকাশ করেন। যে কবি তাঁর যুগকে যত বেশী প্রকাশ করেন তিনি ততো বড় কবি। সমাজের মানুষেরা এই যুগধর্মকে প্রকাশ করে নিজেদের আবেগ আর চিন্তার মধ্যে। তাদের সেই আবেগ আর চিন্তার দুই ধারা—নূতন এবং পুরাতন, ক্ষয়িষ্ণু এবং বর্ধিষ্ণু, প্রগতিশীল এবং প্রতিক্রিয়াশীল। বিপ্লবী কবি তিনিই যিনি লোকের Revolutionary Sprit-কে ব্যক্ত করতে পারেন। আমার ধারণা সুকান্ত তার যুগের এই Revolutionary Sprit-কে ব্যক্ত করতে পেরেছে যথেষ্ট পরিমাণে। প্রকাশ করেছে অন্তরের জারক রসে রসিয়ে, সত্যকে সুন্দর করে তুলে। সুকান্ত কিশোর হয়েও তাই কিশোর-কবি নয়। সে হচ্ছে মরার দেশে প্রাণের উন্মাদনা, সে হচ্ছে যৌবনের উদ্গাতা। তার কাব্য খুলে দেখছি পনেরো বছর বয়সে সে যে কবিতা লিখেছে তার নাম 'আঠারো বছর বয়স' :

> এ বয়স যেন ভীরু কাপুরুষ নয়
> পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে,
> এ বয়সে তাই নেই কোনো সংশয়—
> এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।

এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে—অর্থাৎ যৌবনচঞ্চল হোক এই ভারতবর্ষ। অর্থাৎ শিশু হোক যুবক, কিশোর হোক যুবক, প্রৌঢ় হোক আবার যুবক, বৃদ্ধ হোক পুনর্বার যুবক। এই যৌবন-শক্তি সেদিন জেগেছে সোভিয়েট ইউনিয়নে, জেগেছে মহাচীনে, আগামীকাল জাগবে ভারতবর্ষে।

সুকান্তর কবিতার মধ্যে আছে এই যৌবনের পৌরুষ। সে কাঁদে না, সে কাঁদায় না, সে এগিয়ে যেতে বলে, সে সংগ্রামের পথ জয়

করতে ডাক দেয়। শত্রুকে সে আঘাত করে, মিত্রকে সে কোলে টানে, যন্ত্রণায় সে বিমূঢ় হয় না। এই সূত্রে মনে পড়ছে সেদিন আমাদের বাংলা দেশেরই এক কবি লিখেছেন, আমাকে তোমরা কেউ বাঁচার গৌরব বলে দিতে পারো?—সুকান্ত থাকলে হয়তো তার উত্তর দিতো, কবিকে কে বাঁচার গৌরব বলে দেবে, কবির কাজই তো হচ্ছে বাঁচার গৌরব অন্যকে বলে দেওয়া। সুকান্ত দেখেছিলো বাঁচার গৌরব এ-দেশে আসছে কী করে। অঙ্কুরিত বীজের মধ্যে সে দেখেছে বটবৃক্ষের গৌরব, সে দেখেছে প্রাসাদ বিদীর্ণ করা চারাগাছ, সে প্রভাতের খবর পেয়েছে রাত্রিতে বসে, সে তাই কলমকে ডাক দিয়েছে বিদ্রোহ করতে। সুকান্ত সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষের চেতনা নিয়ে শুধু মানুষের দুঃখ দেখেনি, অগ্রদূত হয়ে খুঁজেছে কোথায় সেই দুঃখজয়ী শক্তি কতো বিচিত্র পন্থায় জমা হচ্ছে গোপন বারুদের মতো।

তবু সুকান্ত শুধু সুরু করেছিলো—নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়ে যেতে পারেনি। মানুষ-জীবনের বিচিত্র জটিল রূপের প্রসাদের প্রথম সোপানে সে পা দিয়েছিলো। আজ বেঁচে থাকলে সে হয়তো আমাদের কাব্য-জগতের পথ আলোকিত করার জন্য প্রদীপ হাতে থাকতো সবার আগে।

তবু সুকান্ত না থেকেও আছে। যে কবি জীবনের জয়গান গায় সে কবি মরে না, আর যে কবি মরার কবিতা লেখে সে মরে যায়।

সুকান্তকে দেশবাসী ভোলেনি, ভুলবে না, ভুলতে পারে না। নিজের প্রাণের গরজে কিশোর এবং যুবক সুকান্তকে সন্ধান করে ফিরছে। সুকান্ত তার 'ঠিকানা' কবিতায় লিখেছিলো :

> আমার ঠিকানা খোঁজ করো শুধু
> সূর্যোদয়ের পথে
> জালালাবাদের পথ ধরে ভাই
> ধর্মতলার পরে

দেখবে ঠিকানা লেখা প্রত্যেক ঘরে
ক্ষুব্ধ এদেশে রক্তের অক্ষরে।

সংগ্রামের পথের উপরই সুকান্ত প্রাণ দিয়ে ঠিকানা লিখে রেখে গেছে। তার ঠিকানা আজ হয়তো কুড়িয়ে পাচ্ছে পাটনা নগরের পথে গুলিবিদ্ধ ছাত্রের দল, তার ঠিকানা পেয়েছে আজ হয়তো ভারতের এক সুদূর সীমান্তের শহীদ নিত্যানন্দের সঙ্গীরা। যতদিন দুঃখের বিরুদ্ধে মানুষ মানুষের মতো দাঁড়াবে, ততোদিন সুকান্তর ঠিকানা খুঁজে পেতে কষ্ট হবে না।

স্বাধীনতা। ২৮শে আগষ্ট, ১৯৫৫

আমার বন্ধু সুকান্ত

শৈলেন সরকার

কমলা বিদ্যামন্দিরের একেবারে নীচের শ্রেণী থেকে সুকান্তর সাহচর্য লাভের সুযোগ আমার হয়েছিলো। তখনকার দিনে স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ছিলো অল্প। বোধহয় কুড়িজনের বেশী ছাত্র আমরা এক ক্লাশে ছিলাম না। তারই মধ্যে ঐ লাজুক, আপাত-স্বল্পবাক ছেলেটিকে সহজেই নজরে পড়তো তার বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার জন্য।

ধীরতা, নম্রতা ও বন্ধুপ্রীতি ছিলো সুকান্তর সহজাত গুণ। বাইরে থেকে দেখে মনে হতো সুকান্ত কথা বলে কম। কিন্তু মেলামেশা করলে বোঝা যেতো ও সে ধাতের ছেলেই নয়; কল্পনার নবীনতায়, বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে ও লঘু পরিহাস-প্রিয়তায় ওর সঙ্গ সর্বদাই আনন্দময় করে তুলতো।

বয়সের তুলনায় সুকান্ত যে আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে গেছে সেটা আমরা সে সময়েই বুঝতে পারতাম। স্কুলের ভালো ছেলেদের সে ছিলো একজন। কিন্তু অন্য সকলের তুলনায় তার পড়াশুনা ছিলো অনেক বেশী, যা সে-বয়সে আমরা ভাবতেও পারতাম না। ক্লাশে ভাল রচনা লিখতে পারার প্রশংসা সুকান্ত একাই কুড়াতো। এজন্য মাস্টারমশাইরা ওকে বিশেষ স্নেহ করতেন। আমরাও সপ্রশংস দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে থাকতাম।

এই প্রাইমারী স্কুলে পড়বার সময় সুকান্ত আমাদের সামনে একটা নতুন জিনিস তুলে ধরেছিলো!

একদিন এসে বললে, আমরা সবাই মিলে একটা হাতে-লেখা পত্রিকা বার করবো।

শোনা মাত্রই আমরা সবাই রাজী। উৎসাহের সঙ্গে সুকান্তর পরিকল্পনা মতো সবাই কাজে লেগে গেলাম। লাইনটানা ভালো

কাগজ এবং চাইনিজ-ইংক কিনে আনা হলো। যথাসময়ে আমাদের হাতে-লেখা পত্রিকা বার হলো। সুকান্ত এই পত্রিকার নাম দিয়েছিলো 'সঞ্চয়'। 'সঞ্চয়'-এর প্রথম রচনাটি ছিলো সুকান্তর লেখা একটি সুন্দর হাসির গল্প। এখন ভাবি, সুকান্ত যদি আমাদের মধ্যে না থাকতো, কমলা বিদ্যামন্দিরের ছাত্রদের সেদিনের গর্ব 'সঞ্চয়' কখনও আলোর মুখ দেখতো না।

আমরা যেবার কমলা বিদ্যামন্দিরের চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি, সেবার মাস্টারমশাইদের উৎসাহে সরস্বতী পূজার দিন ছাত্রদের অভিনয় হলো—ছেলেদের একাঙ্ক নাটক 'ধ্রুব'। এতে নাম ভূমিকায় ছিলো সুকান্ত। ধীর ও শান্ত সুকান্তকে মানিয়েছিলো ভালো। আমাদের এই অভিনয় দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছিলো।

সুকান্তর এই সব বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও সে আমাদের থেকে আলাদা ছিলো না। দলবেঁধে সার্কাসের বাঘ-সিংহ দেখতে যাওয়া বা মিউজিয়ামে বেড়াতে যাওয়া, সব ব্যাপারেই ওকে উৎসাহী সঙ্গী হিসাবে বরাবর পেয়ে এসেছি। সুকান্ত সঙ্গে থাকলে আমাদের ভ্রমণটাও জমতো ভালো। নানারকম গল্প ও লঘু পরিহাসের মধ্যে পথের ক্লান্তি মোটেই বুঝতে দিতো না।

সুকান্তকে আমরা খেলার মাঠেও পেয়েছি। একবার শীতকালে কমলা বিদ্যামন্দিরে ব্যাডমিণ্টন খেলার ব্যবস্থা হলো। এ খেলায় সুকান্তর উৎসাহ ও দক্ষতা ছিলো সমান। আবার আমাদের সঙ্গে পরম উৎসাহে নিয়মিতভাবে ক্রিকেটও খেলেছে।

কত রকমের বই যে সুকান্ত পড়তো এবং মাঝে মাঝে আমাদের পড়তে দিতো, তা ভেবে পাই না। ছোটোদের কি বড়দের, গল্প কি কবিতা, ডিটেক্‌টিভ্‌ কাহিনী কি নীরস প্রবন্ধ—কোনও কিছুই বাদ দিতো না সে। সুকান্তর পাঠ্যতালিকায় যেমন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, তেমনি হেমেন্দ্রকুমার-দীনেন্দ্রকুমারের স্থানও ছিলো। আমরা যখন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র, তখন ওর 'পথের পাঁচালী' পড়া

হয়ে গেছে। এই 'পথের পাঁচালী' ওর কিশোর মনে গভীর আবেদন সৃষ্টি করেছিলো। বলেছিলো, 'ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে সমান আদরে এই বই সকলের ঘরে রাখা উচিত'। সুকান্তর সদাজাগ্রত শিল্পী-মন সেই ছেলেবেলাতেও সাহিত্যের মূল্যায়নে কোন ভুল করতো না। সে সময়ে আমাদের কাছে এমন সমস্ত বইয়ের নাম করতো, যেগুলি পরে বুঝেছি, বাংলা সাহিত্যে অক্ষয় আসন লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতি সুকান্তর সুগভীর শ্রদ্ধা ছিলো। কলকাতার মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠানে সুকান্ত গিয়েছিলো শুধু রবীন্দ্রনাথকে দেখবার জন্য। পরে আমাদের বলেছিলো, রবীন্দ্রনাথকে দেখে ওর প্রণাম করবার ভীষণ লোভ হচ্ছিলো।

এর মধ্যেই সুকান্তর লেখক হবার সাধনা দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছিলো। একদিন 'শিখা' পত্রিকার একখণ্ড এনে দেখালো ওর একটি লেখা বেরিয়েছে। পরে 'শিখা'তে সুকান্তর আরো লেখা ছাপা হয়েছিলো। কলকাতা রেডিও-র গল্পদাদুর আসরের সভ্য ছিলো সুকান্ত। সেই আসরে ওর লেখা গান এবং কবিতা-পাঠ একাধিকবার হয়েছে। আনন্দবাজার পত্রিকার শিশু বিভাগ 'আনন্দ-মেলা'র সভ্য-তালিকাতেও সুকান্তর নাম ছিলো।

আমরা যখন দেশবন্ধু হাই স্কুলের ছাত্র, তখন পরবর্তীকালের খ্যাতিমান কবি অরুণাচল বসু এলো আমাদের সহপাঠি হয়ে। অরুণাচলের সঙ্গে সুকান্তর পরিচয় যেন মণি-কাঞ্চন সংযোগ হলো। উপযুক্ত গুণগ্রাহী এবং একজন প্রকৃত কবিকে সঙ্গী হিসাবে পেয়ে সুকান্তর কবিসত্তা যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো। একদিন ক্লাশে বসেই দুজনে মিলে একটি দ্বৈত-কবিতা রচনা করে ফেললো। এদের দুজনের সম্পাদনাতে আবার আমাদের হাতে-লেখা পত্রিকা 'সপ্তমিকা' বার হলো। তখন আমরা সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। এই পত্রিকার নামকরণ করেছিলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক নবদ্বীপচন্দ্র দেবনাথ মহাশয়।

অসাধারণ নিষ্ঠায় ও পরিশ্রমে এই পত্রিকার অনেকখানি সুকান্ত নিজের হাতে লিখেছিলো।

অন্যায়ের সঙ্গে আপোশ সুকান্তর চরিত্রে ছিলো না।

একটা ঘটনার কথা মনে আছে। একদিন বিকালে আমি ও আমার এক সহপাঠী বন্ধু সুকান্তদের বাড়ি বেড়াতে গেছি। ওদের বাড়ির সামনে গিয়ে সুকান্তকে ডাকতেও হলো না। দেখি, ক্রুদ্ধ সুকান্ত একগাছা মোটা লাঠি হাতে বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে এবং সুকান্তর অগ্রজ সুশীলদা তাকে বাধা দিচ্ছেন। সুকান্ত কিছুতেই তাঁর বারণ শুনলো না। লাঠি হাতে অগ্নিশর্মা হয়ে বাড়ি থেকে বেরুলো। আমাদের দিকে চেয়ে দেখলো মাত্র, কথা বললো না। আমরা দুজনে সুকান্তর পিছু-পিছু কাছেরই একটি মাঠে এসে পৌঁছলাম। সুকান্তকে দেখেই মাঠের ওধার থেকে একটি ছেলে ছুটে এলো এবং হঠাৎ পকেট থেকে একটি পেনসিল্-কাটা ছুরি বার করে সুকান্তকে দেখিয়ে আস্ফালন করতে লাগলো। যা হোক, আমরা দুজনে থাকায় ঘটনাটা আর বেশীদূর গড়াতে পারেনি। শুনলাম, কিছুদিন ধরে ছেলেটি অকারণে সুকান্তকে গালমন্দ ও অপমান করছিলো। এটা এমন মাত্রা ছাড়িয়ে যায় যে সুকান্তর মতো সহিষ্ণু ছেলেও ক্ষিপ্ত হয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদে লাঠি ধরতে বাধ্য হয়।

সুকান্তর চিন্তাজগতের পরিধি ও হৃদয়ের প্রসার যে কতখানি ছিলো, তার পরিচয় পেয়েছিলাম আর একটি ঘটনায়। কি কারণে ঠিক মনে নেই, একবার কমলা বিদ্যামন্দিরে আমাদের ক্লাশের ছেলেদের মধ্যে দুটি দল হয়ে যায়। দুর্ভাগ্যবশত (কিংবা সৌভাগ্যবশত বলবো কিনা জানি না—নইলে সুকান্তর চরিত্রের এ দিকটার পরিচয় হয়তো পেতাম না) আমি আর সুকান্ত দুজনে দুটি বিবাদমান শিবিরে পড়ে যাই। সেই অবস্থায় আমাদের দুজনের কথা একদম বন্ধ। রাস্তায় সামনাসামনি পড়লে, সুকান্ত মাটির দিকে তাকিয়ে চলে, আমিও মুখ ফিরিয়ে নিই।

এইভাবে কয়েকমাস চললো।

হঠাৎ একদিন সকালে একখানা খামে ভরা চিঠি পেলাম। সুকান্তর লেখা। বেশ বড় চিঠি। আদ্যোপান্ত পড়ে সুকান্তর প্রতি বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় আমার মন ভরে গেলো। ও লিখেছে, 'আমাদের সামান্য ঝগড়া বিবাদ মিটিয়ে ফেলা দরকার। আমাদের আসল লড়াই ইংরাজের বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতার লড়াই।'—বারো-তেরো বছরের কিশোর তখন থেকেই দেশের মুক্তির স্বপ্ন দেখেছে! এজন্যই বোধহয় সুকান্ত একাধারে কবি ও সংগ্রামী হতে পেরেছিলো এবং উত্তরকালে শোষিত মানুষের মুক্তির সংগ্রামে নির্দ্বিধায় নিজেকে ও নিজের কবিসত্তাকে বিলিয়ে দিতে পেরেছিলো।

আমার ছাত্র সুকান্ত

নবদ্বীপচন্দ্র দেবনাথ

ক্লাশে ছেলেদের লেখা প্রবন্ধ সংশোধন করছি। পেছনের বেঞ্চির একটি ছেলের খাতায় চোখ বুলানো মাত্রই চমকে উঠলাম। কী সুন্দর ভাষা আর অপূর্ব ভাব! অনন্যসাধারণ, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনা! হাতের লেখাটিও চমৎকার, যেন রবীন্দ্রনাথের লেখা!

মুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম।

আদর করে কাছে ডাকলাম। রোগা, শ্যামল চেহারা; কিন্তু সব্যসাচীর মতো বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ আমার মন কেড়ে নিলো। বললাম: তুমি একজন বিখ্যাত লেখক হবে। কবিতা লিখতে পারো? গল্প?

সলজ্জ হাসি নিয়ে মাথা নাড়লো সদ্য কিশোর সুকান্ত।

ক্লাসের মনিটর মেধাবী ছাত্র শৈলেন সরকার এসে জানালো: খুব লাজুক ছেলে, স্যার। অনেক লেখা আছে, আপনি দেখবেন?

তখনই সুকান্তকে গলায় জড়িয়ে ধরে আপন করে নিলাম।

সেদিন থেকে সুকান্ত হলো আমার সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র, একান্তভাবে আমার সুকান্ত।

ঘণ্টা বাজতেই শিক্ষকদের ঘরে এসে আনন্দে ঘোষণা করলাম: আমি একটি ছেলে আবিষ্কার করেছি! দেশবিখ্যাত লেখক হবে সে। সপ্তম শ্রেণীর ছেলের হাতে এমন পাকা লেখা আমি আর কখনো দেখিনি। একেবারে অবিশ্বাস্য,—ভাবাই যায় না।

এখনও সেই দিনটির কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। অগ্রজ শিক্ষক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নস্কর মহাশয় এ বিষয়ে একটি গল্পের অবতারণা করে আমাকে বিদ্রূপ করেছিলেন:

এক মাস্টারমশাই ছাত্রদের 'স্বাস্থ্য' বিষয়ে রচনা লিখতে দিয়েছিলেন।

একটি ছাত্র এক জায়গায় লিখেছিল, 'স্বাস্থ্য বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না।' তাতেই মাস্টারমশাই খুশি হয়ে তাকে বেশি নম্বর দিয়েছিলেন! আপনিও বোধহয় ওই রকম নতুন কিছু একটা দেখে অবাক হয়ে ভবিষ্যৎবাণী করছেন।

আমি আজ সেদিনের কথা মনে করে অত্যন্ত গৌরব বোধ করছি যে, আমার সেই ভবিষ্যৎবাণী সত্যিই সার্থক হয়েছে। সুকান্ত শুধু দেশবিখ্যাত কবি নয়, আজ বিশ্বব্যাপী তার নাম।

পরদিনই 'শিখা' নামে একটি পত্রিকা এনে আমাকে দেখালো সুকান্ত তার একটি গদ্য রচনা। কিন্তু অদ্ভুত ছন্দজ্ঞানের পরিচয় পেয়ে আমি তাকে কবিতা লিখবার জন্যই বেশি উৎসাহ দিয়েছিলাম। বিভিন্ন প্রকার ছন্দজ্ঞানের জন্য সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যালোচনার দিকেও তার মনোযোগ আকৃষ্ট করেছিলাম।

ক্লাশে বেশ কয়েকজন ভালো ছাত্র ছিলো! সহজেই তাদের মধ্যে সাহিত্য-প্রতিযোগিতার ভাব গড়ে উঠলো। কিশোর চিত্তে সাহিত্যালোচনার অনবদ্য রস-পিপাসা জাগিয়ে তোলবার উদ্দেশ্যে একটি হাতে-লেখা সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন করলাম। নামকরণ করলাম 'সপ্তমিকা'। সুকান্তকে করলাম সম্পাদক এবং সহকারী সম্পাদক করলাম অরুণ বসুকে [অধুনা কবি অরুণাচল বসু] আর আমি পরিচালনা করবার ভার নিলাম।

'সপ্তমিকা'য় সুকান্ত যে সম্পাদকীয় লিখেছিলো তা হয়েছিলো উচ্চমানের যে-কোনো প্রথম শ্রেণীর সম্পাদকীয় ভাষণের মতোই। পরিতাপের বিষয়, সে পত্রিকাটি আজ কোথায় কার কাছে আছে জানি না।

সুকান্ত আগে কবিতা লিখলেও কোথাও তা প্রকাশের সুযোগ ঘটেনি। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, 'সপ্তমিকা'র জন্য সুকান্ত যে কবিতাটি দিয়েছিলো এটিই তার জনসমাজে প্রকাশিত প্রথম কবিতা।

সুকান্তর সুখ্যাতিতে অরুণ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতো। তাই দুজনকে বললাম : তোমরা পাশাপাশি বসবে।

সেদিন থেকে তারা একসঙ্গে বসে কাব্যালোচনায় মেতে উঠলো, আর তাদের মধ্যে গড়ে উঠলো প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। সে বন্ধুত্ব সুকান্তর আমরণ ছিলো।

এখনও আমি একই ভাবের দুই সতীর্থের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে তুলি। সেদিনের সেই দুই কিশোর-কবির অকৃত্রিম বন্ধু-সৌভাগ্য সৃষ্টির মূলে আমিই ছিলাম—এ ভাবলেও আজ অন্তরে এক অপরিসীম আনন্দ অনুভূত হয়।

একদিন দুই বন্ধু একটি চমৎকার কবিতা এনে হাজির করলো আমার ক্লাশে। কবিতাটির নাম 'শতাব্দী'। এক লাইন সুকান্তর পরের লাইন অরুণ বসুর। সপ্তম শ্রেণীর দুই কিশোর-কবির মধ্যে অভূতপূর্ব শক্তির পরিচয় পেয়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলাম। যতদুর মনে পড়ে, কবিতাটি ১৬ লাইনে শেষ হয়েছিলো। কবিতাটি অনেকদিন আমার কাছে ছিলো। পরে আমার সহকর্মী শ্রীশিবপ্রসাদ দাস এটি রাখেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কবিতাটি কিছুদিন পরে হারিয়ে যায়। তার একটি অনুচ্ছেদ আমি এখানে তুলে ধরছি :

অরুণ—হৃদয়ের উল্লাস ছন্দের বন্ধন মানে না,
সুকান্ত—চম্পক গন্ধের সুরভিত ক্রন্দন আনে না।
অরুণ—যৌবন-খঞ্জন উদ্দাম পিঞ্জর ভাঙতে
সুকান্ত—রক্তের রঙ্গনে উদ্যত বুঝি আজ রাঙতে।

সুকান্ত তার নতুন লেখা নিয়ে আসতো আমার কাছে। তখন লেখার ভালো মন্দ নিয়ে আলোচনা করতাম না। শুধু উৎসাহ দিতাম, প্রেরণা দিতাম : চমৎকার হয়েছে, আরো লিখে যাও।

ছন্দে ছিলো তার পাকা হাত। মাঝে মাঝে তার কাঁচা লেখার সঙ্গে পাকা লেখার পার্থক্য ধরিয়ে দিতাম। সে পুলকিত হতো। কথা বলতো কম। শিশুর আধ-আধ বুলি যেমন স্নেহশীল লোকের মনে

আনন্দ জগায়, সুকান্তর স্পষ্ট উচ্চারিত কথাগুলো এখনও তেমনি আমার মনে আনন্দের সঞ্চার করে।

এমন বিনয়নম্র, নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধায় শিষ্যের মতো ছাত্র পাওয়া সত্যই সৌভাগ্যের কথা। আমার সে সৌভাগ্য ছিলো বলে আমি গর্বিত।

সুকান্ত ও অরুণের মধ্যে যখন বেশ ভাব জমে উঠেছে, তখন সুকান্ত আমাকে একদিন নিয়ে চললো অরুণদের ১৬৯নং বেলেঘাটা মেন রোডের বাড়ীতে। নীচে বি. ঘোষের নামাঙ্কিত চূণের কারবার, উপরে মাঠকোঠা-ঘর।

অরুণের মা শ্রীযুক্তা সরলা দেবীর স্নেহের কথা আমাকে শিশুর মতোই শোনাতো সুকান্ত।

সুকান্তর সঙ্গে আমিও মেতে উঠলাম সেদিন হাস্যপরিহাস ও গল্পগুজবের মধ্যে। সেখানে সুকান্তকে নতুনরূপে চিনলাম। কতো সহজ হৃদয়. কতো সারল্য ও পরিহাসপ্রিয়তা তার ছিলো, যাঁরা তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন একমাত্র তাঁরাই উপলব্ধি করেছেন।

কাব্যে সুকান্তর বক্তব্য ছিলো যেমন স্পষ্ট, কথাও বলতো সে তেমনি স্পষ্টভাবে। প্রত্যেকটি ওজন করা কথা।

সুকান্তকে মাঝে মাঝে আমার কবিতা পড়ে শোনাতাম। তখন দেশ, নবশক্তি, সোনার বাংলা, স্বদেশ, কৈশোরিকা, প্রবর্তক, বঙ্গশ্রী, বিশ্ববাণী প্রভৃতি বহু পত্রিকায় আমার কবিতা প্রকাশিত হতো। ইটালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করলে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষায় অগ্রগামী হাবসী সৈন্যদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলাম :

> ধন্য ইথিওপিয়া, হাবসী সেনানী তোরা ধন্য,
> মৃত্যুর গরিমায় হয়ে গেলে কৃতার্থমন্য।

দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত 'ধন্য ইথিওপিয়া' নামক এই কবিতাটির ছন্দ ও ভাব সুকান্তকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিলো।

যুদ্ধ, সাম্প্রদায়িকতা, জাতিবিদ্বেষ, শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে

সংগ্রাম ছিলো আমার অধিকাংশ কবিতার উপজীব্য। সুকান্ত তা থেকেও যথেষ্ট প্রেরণা পেয়েছে। কৈশোরিকায় প্রকাশিত আমার 'স্ট্যালিন' প্রবন্ধ, অন্যত্র প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ, নবজীবনের গান এবং লালচীন নামক কবিতা কয়টি সুকান্তকে উৎসাহে উদ্দীপ্ত করেছিলো। সে প্রসঙ্গে একটি কথা মনে পড়ছে। তখন আমাদের 'বেলেঘাটা দেশবন্ধু বিদ্যালয় পত্রিকা' প্রকাশের আয়োজন চলছে। আমিই সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলাম। প্রাক্তন ছাত্র সুকান্তর লেখার জন্য দুবার গিয়েছিলাম তাদের হরমোহন ঘোষ লেনের বাড়ীতে। কিন্তু দুবারের একবারও ওর সঙ্গে দেখা হয়নি। তারপর হঠাৎ একদিন সুকান্ত এসে হাজির ৯৫নং রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোডে অবস্থিত বিদ্যালয় ভবনের চিলে কোঠায়। আমি তখন সেখানেই থাকি।

লেখা এনেছ ?—বলতেই পকেট থেকে বার করে খুলে ধরলো সামনে একটি দুরূহ, গাম্ভীর্যপূর্ণ কবিতা।

বললাম ঃ এ চলবে না সুকান্ত, ছেলেরা বুঝবে না। আরো সহজ একটা কবিতা দাও।

তারপর 'মুহূর্ত' নামে একটি কবিতা পেলাম। যথাসময়ে সেটি প্রকাশিত হলো পত্রিকায়। পরে ঐ কবিতাটি পূর্বাভাস-এ ঈষৎ পরিবর্তিত হয়ে 'মুহূর্ত (ক)' রূপে সংকলিত হয়।

একদিন ছাত্রদের স্তূপীকৃত হিজিবিজি লেখা থেকে একটি কবিতা মার্জিত করে আমার হাতে দিলো সুকান্ত। আমি পড়ে তার সংশোধিত একটি লাইন বাদ দিয়ে অন্য একটি পংক্তি জুড়ে দিলাম। সুকান্ত মুগ্ধ হয়ে শ্রদ্ধায়, আনন্দঘন উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। তার ছেলেমানুষীতে আমিও কম খুশি হলাম না।

একদিন একটি লেখা নিয়ে ব্যস্ত আছি, এমন সময় সুকান্ত নীরবে এসে সতরঞ্চির উপর বসলো।

কি যেন আলোচনার পর সুকান্ত ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে বললো ঃ বিদগ্ধ জীবন আপনার।

আমি বললাম : বিদগ্ধ জীবন নয় সুকান্ত, বিশেষরূপে দগ্ধ জীবন। সুকান্ত চুপ করে আছে দেখে বুঝলাম, শুনতে পায়নি। তখন কানে কম শুনতো সে। যখন শুনলো, তখন ঈষৎ হাসলো, আবার সঙ্গে-সঙ্গেই সমবেদনায় বিমর্ষ হয়ে পড়লো।

আমার বাংলার মাস্টারমশাই এবং পরে বিপ্লবী ডঃ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছ থেকে আমি লেখার জন্য যে উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়েছি, তা আমার কাছে চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাই সুকান্ত এলেই তাকে আবেগে উৎসাহে অনুপ্রেরণায় ভরিয়ে দিতাম। স্নেহরসে অভিসিঞ্চিত করে দিতাম তাকে।

একদিন সদ্য প্রকাশিত আমার লেখা walt whitman-এর একটি কবিতার স্বচ্ছন্দ অনুবাদ নিয়ে আলোচনা করে বললাম : সুকান্ত তোমাকে এম-এ পাশ করতে হবে, শুধু বাংলায় নয়, ইংরেজীতেও। সেক্‌শ্‌পীয়রের নাটক ও কবিতা না পড়লে উন্নত সাহিত্য-চর্চা করা যায় না।

সুকান্ত বললো : আমি ত স্যার ম্যাট্রিকই পার হতে পারছি না। অঙ্কে যে আমি ভীষণ কাঁচা।

বললাম : তিন মাস পড়, তিরিশ নম্বর পেতে অসুবিধে হবে না।

সুকান্তর মুখে বিষাদের ছায়া নেমে এলো : টাকা কোথায় পাবো স্যার যে পড়বো ?

ভরসা দিয়ে বললাম : সে বিষয়ে তোমায় ভাবতে হবে না, যা লাগে আমি দেবো।

কয়েকদিনের মধ্যেই সুকান্তকে অভিজ্ঞ শিক্ষক শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র পাল মশায়ের কোচিং ক্লাশে ভর্তি করে দিলাম। সে ক্লাশে অঙ্ক কষতো বটে, কিন্তু মন পড়ে থাকতো তার কোন্ সুদূরে কে জানে। অবিন্যস্ত চুল, আলুথালু অপরিচ্ছন্ন বেশ। ব্যস্ত হয়ে বসে থাকতো। মনে হতো যেন এখনি সে উঠে যাবে কোনো জরুরী কাজে।

যথাসময়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিলো, কিন্তু পাশ করতে পারলো না। পাশের খাতায় নাম না উঠলেও পাটনা ও গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষার পাঠ্যতালিকায় তার কবিতা পাঠ্য হয়ে গেলো। রানার এবং অন্য একটি কবিতা।

জ্যোতিশবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম : সুকান্তকে পড়ানোর জন্যে কি দেবো আপনাকে ?

তিনি ঈষৎ হাসলেন মাত্র, উত্তর দিলেন না। পরে জানালেন : সুকান্ত টাকা দিয়ে গেছে।

আমি বিস্মিত হলাম।

বিকেলেই সুকান্ত এলো। মনে বিস্ময় ও ক্ষোভ নিয়ে বললাম : টাকা কোথায় পেলে ?

সুকান্ত নতমস্তকে বললো : স্যার, আপনার অবস্থা তো আমাদেরই মতো। মাইনে পেয়েই দেশে সব টাকা পাঠিয়ে দেন। আপনার কাছ থেকে টাকা নিতে আমার লজ্জা হলো। 'বসুমতী'র সম্পাদক মশাই দুটি কবিতার জন্য পঞ্চাশ টাকা দিলেন। তা থেকেই মাস্টার মশায়ের টাকা শোধ করলাম।

সুকান্তকে খুব বকুনি দিলাম। কেনো পরের কাছে হাত পাততে গেলে, আমিই তো টাকা দেবো বলেছিলাম ?

সুকান্ত মাথা নত করেই রইলো। দেখলাম তার চোখ দুটি শ্রদ্ধা ও আনন্দে ছলছল করছে।

পরে জানতে পেরেছিলাম, সাহিত্যিক প্রাণতোষ ঘটক এসে তার কাছ থেকে 'চারাগাছ' কবিতাটি নিয়ে যান এবং আর একটি কবিতা সুকান্ত নিজেই দিয়ে আসে। তারই সম্মান-দক্ষিণা স্বরূপ ঐ টাকা পেয়েছিলো সে।

প্রগতি-লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো বেলেঘাটা মেন রোডের ১৩নং বাড়ীর বাইরের ঘরটিতে।

সেখানে আমি, সুকান্ত, অধ্যাপক সুবোধ রায়চৌধুরী, শিক্ষক

শিবপ্রসাদ দাস, ডঃ শিশির চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকেই সমবেত হতাম। সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয় ৪৬নং ধর্মতলা স্ট্রীট থেকেও প্রতিনিধি এসে যোগদান করতেন। সে আসরে সুকান্ত সকলের সঙ্গেই সুন্দর সংযোগ রক্ষা করে চলতে পারতো লক্ষ্য করেছিলাম। সেদিন আমার সঙ্গে সুকান্তর অনেক কথা হয়েছিল তার 'অকাল' কবিতা সংকলন সম্পর্কে।

শীতের বিকেলে একদিন সুকান্ত এলো। গম্ভীর। চোখে-মুখে দ্বিধার ভাব।

বললাম : কি সুকান্ত, কথা বলছো না যে?

একটা জরুরী কথা বলতে এসেছি। আপনার উপদেশ চাই স্যার। বলে সুকান্ত থামলো।

আমি অপেক্ষা করে রইলাম।

সুকান্ত অত্যন্ত সহজভাবে বলে যেতে লাগলো : আমাকে মাঝে মাঝে এক জায়গায় যেতে হয়। সেখানে প্রায় আমারই বয়সী একটি মেয়ে থাকে। অনেক লোকের মধ্যে তার সামনে কাজ করতে, তার সঙ্গে মেলামেশা করতে আমার কেমন লাগে। অথচ এড়িয়ে যাওয়া চলে না। একই সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামাও করতে হয়। তাতে আমি বড় চঞ্চল হয়ে উঠছি। এ অবস্থায় আমি কি সেখানে যাওয়া বন্ধ করে দেবো?

আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করলাম। মনে হলো যৌবনোন্মেষ-লগ্নের প্রথম শিহরণ বুঝি, কিংবা কিছুটা অনুরাগের স্পর্শ। আবার ভাবলাম, নাকি অন্য কিছু?

বাধা দিয়ে বললাম, না, না, যাওয়া বন্ধ করবে কেনো? তুমি একসঙ্গে কাজ করো, সহজভাবে মেলামেশা করো। দেখবে, তাতেই সব দুর্বলতা কেটে গেছে।

সুকান্ত যেন ভরসা পেলো। আশান্বিত হয়ে চলে যাবার উপক্রম করলো। বললাম, আর একদিন এসো কিন্তু

সুকান্ত আমার কাছে ঘন ঘন আসতো। আবার আসায় হঠাৎ ছেদ পড়ে যেতো বহুদিন। বুঝতাম, পার্টির কাজে ব্যস্ত হয়ে শরীরকে ধ্বংস করছে।

পরিপাট্যহীন বেশভূষা, ছেঁড়া স্যাণ্ডেল নিয়ে যখন সুকান্ত এসে হাজির হতো, তখন তাকে দেখে সত্যিই মায়ার সঞ্চার হতো।

সুকান্তকে সাবধান করে অনেক কথা বলেছিঃ সুকান্ত, ছ'পয়সার চানাচুর আর রাস্তার জল খেয়ে টালা থেকে টালিগঞ্জ হেঁটে আর শরীরকে নষ্ট করো না।

পদযাত্রা ছিলো তার দৈনিক কর্ম তালিকার অঙ্গীভূত। একদিকে অতিরিক্ত খাটুনি, অপরদিকে দৈহিক অবক্ষয় তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিলো। তখন সুকান্তর অভিভাবক ও পার্টির পরিচালকদের উপর রাগ হতো। অতিরিক্ত কাজের ভার চাপিয়ে এই মা-হারা নিরীহ ছেলেটার প্রতি কী নির্যাতনই না চালানো হচ্ছে!

—কিন্তু এই পর্যন্তই। সামনে এগিয়ে গিয়ে এর প্রতিকার করার স্পৃহা জাগলেও তা করার সাহস হয়নি। তাই আমাদের সকলের পাপের ফলে অকালে এই সংগ্রামী বীর কবিকে আমরা হারালাম। এই ক্ষতি সমস্যাবহুল একটা দেশের পক্ষে কতো বড় শোচনীয়, তা ভাববার দিন এসেছে।

রবীন্দ্রনাথ মাটির পৃথিবীতে অখ্যাত জনের মর্মবেদনা উদ্ধার করার জন্য যে কবির বাণীর অপেক্ষায় কান পেতে বসেছিলেন, সে কবি যে এই সুকান্ত, সে বিষয়ে কারো মনে আজ সংশয় নেই। সুকান্তর ছিলো অবিশ্বাস্য কবিত্বশক্তি। পারিবারিক প্রতিভার ধারায় সে পেয়েছে বিপুল শক্তি অথবা এ তার পূর্বজন্মার্জিত সুকৃতি।

সুকান্তর অধিকাংশ কবিতায় অনুরণিত হয়েছে অতি সাধারণ বঞ্চিত মানুষের মর্মবেদনা আর আশা-আকাঙ্ক্ষারই কথা।

সুকান্ত ছিলো উদ্দীপনার কবি। কবিতা রচনায় নিখুঁত শব্দচয়ন,

ছন্দে অভিনব ব্যঞ্জনা, বাকস্পন্দন, উপমাপ্রয়োগে সহজাত অদ্ভুত ক্ষমতা ও বলিষ্ঠ সুর-সংযোজনায় সুকান্ত ছিলো অনন্য।

সুকান্ত ছিলো সত্যই জনগণের কবি। একদিকে নতুন ধ্বনিঝঙ্কার, অপরদিকে অর্থগৌরবে, আত্মপ্রত্যয়ে, দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় তার কবিতা ছিলো সংহত ও ঋদ্ধ। জনগণের কাছে তাই সুকান্ত-কাব্যের আবেদন এক কথায় প্রাণ-প্রাচুর্যে উদ্দীপ্ত।

সুকান্তর জীবন ও কাব্য ছিলো একই সুরে গ্রথিত ও একই মন্ত্রে অনুরণিত। সংবেদনশীল মন নিয়েই সে লিখতো কবিতা, নাটক ও মিঠেকড়া ছড়া।

সুকান্ত ছিলো মানবদরদী। দুর্ভিক্ষের সময় সে পরের দুঃখে সমদুঃখী হয়ে পরের জন্য চাল ও কম্বলের ব্যবস্থা করে দিয়েছে; কিন্তু নিজের পরিবারের জন্য তা করেনি। তাইতো সে 'রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটিকে' উত্তাপ দেবার জন্য সূর্যের কাছে পরম আকুতি জানাতে পেরেছিলো।

সুকান্ত ছিলো আশাবাদী ও দৃঢ় প্রত্যয়ে সমুজ্জ্বল। তাই তার কবিতায় সেই সুরের আভাস সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে:

> ক্ষুদ্র আমি তুচ্ছ নই—জানি আমি ভাবী বনস্পতি,
> বৃষ্টির, মাটির রসে পাই আমি তারি তো সম্মতি।
>
> (চারাগাছ: ছাড়পত্র)

অথবা,

> আজ আছি নক্ষত্রের দলে,
> কাল জানি মুহূর্তের টানে
> চলে যাবো সূর্যের সভায়,
> ক্ষুব্ধ কালো ঝড়ের জাহাজে।
>
> (মুহূর্ত (ক): পূর্বাভাস)

সুকান্ত ছিলো ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মতোই অগ্রগামী কবি। তাই সে 'দিন পঞ্জিকা' লিখে গিয়েছিলো—'বিদ্রোহ আজ, বিদ্রোহ চারিদিকে।'

এই বিদ্রোহের ভূমি বা বিদ্রোহের ভূমিকা সেদিন তৈরী হয়েছিলো মাত্র। আজ সত্তর দশকের সমাজ ও রাজনৈতিক বিবর্তনের পট-ভূমিকায় সেই সুরই বুঝি প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠছে :

ঘরে তোল ধান বিপ্লবী প্রাণ, প্রস্তুত রাখ কাস্তে,
গাও সারিগান, হাতিয়ারে শান দাও আজ উদয়াস্তে।

'আসন্ন যুগের' নতুন চিঠি পেয়েছিলো আগেই। তাই সে নবজাতকের কাছে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে দৃপ্ত ঘোষণা করেছিলো এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাবে। তারপর সে ইতিহাস হবে।

সুকান্ত আজ সত্যিই ইতিহাস। বাংলাদেশের রক্তের সঙ্গে আজ সুকান্তর কবিতা ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে।

সুকান্তর সাহিত্য-জীবনের উন্মেষ থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে তার সুনিবিড় সম্পর্ক ছিলো। ডঃ শিশির চট্টোপাধ্যায় আমাদের মধ্যে ছিলেন একজন রসগ্রাহী সমালোচক। এবং আমার ছাত্র, বর্তমানে শিক্ষক শ্রীঅজিত চক্রবর্তী ছিলো একজন উৎসুক দর্শক।

কবি-জীবনের স্বল্পায়ু পরিধির মধ্যে সুকান্ত কাব্য-জগতে যে অবদান রেখে গেছে তার তুলনা নেই। স্কুল-জীবনের মধ্যে দেশ-বিদেশের বিদগ্ধজনের কাছ থেকে এতখানি সাফল্যের স্বীকৃতি আর কোনো কবির পক্ষে লাভ করা সম্ভবপর হয়নি। একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত।

সুকান্তর স্নায়ুতন্ত্রীতে উপলব্ধিজাত 'ঘামের, রক্তের আর চোখের জলে'র স্বতঃস্ফূর্ত কাহিনী আমি বারবার শুনেছি, পাঠ করেছি। আমি নীরব সাক্ষী হয়ে আছি তার অতন্দ্র সাধনার। ইতিহাস সৃষ্টির।

সুকান্ত আজ নেই। কিন্তু 'জনতার পাশে পাশে উজ্জ্বল পতাকা' হাতে নিয়ে যারা এগিয়ে যায় তাদের দেখলে হঠাৎ মনে হয়,—ঐ তো এগিয়ে চলেছে কবি-কিশোর আমার সুকান্ত।

আন্তর্দাহে জ্বলছে অহোরাত্র, কিন্তু কোনো রকম বহিঃপ্রকাশ নেই। অন্তরে দাউদাউ আগুন, বাইরে সদাহাস্য। সারল্যের প্রতীক যেন সেই মুখ। দেখলেই মনে হবে, পার্থিব কলুষ থেকে সে যেন মুক্ত। হাসিমুখে কথা বলতে বলতে সহসা স্তব্ধতায় গম্ভীর হয়ে ওঠে। জানলার বাইরে প্রোজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি চালিত হয়। কী অমন নির্নিমেষে দেখছে কে জানে। কই, কিছুতো নেই অদূরে। দুপুরের খটখটে শুভ্র আকাশে গোটা দুই চিল, স্থির ডানা মেলে ভেসে ভেসে পাক দিচ্ছে। লক্ষ্য করলাম ক্ষণেকের মধ্যে সেই নিষ্পলক চোখ দু'টিতে যেন বিদ্যুতের ঝলক ফুটে উঠলো। সুদূর শূন্যে হিমস্নিগ্ধ মেঘের বুকের ঐ আরামে আর আনন্দে ভাসমান চিল দুটো যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়, এমনই দৃষ্টিবাণ হানছে চিরকিশোর সুকান্ত। জন্মগত অধিকারে শুধু, ঐ হিংস্র আর রক্তপায়ী চিলজোড়াটা আসমানের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করবে, বিদ্রোহী কবিচিত্ত কী সহজে মেনে নিতে পারে? ধনতন্ত্রের দেশে আবার নরখাদক চিলই জাতীয়পক্ষীর সম্মানিত আসন পেয়েছে। কবিমানস্ তার, ধনুর্বাণ ধারণ করে না হাতে, তবে তীক্ষ্ণধার তরোয়ালের চেয়ে অধিকতর ক্ষুরধার লেখনী-চালনার দক্ষতা সে দখল করেছে। বেশ খানিক নিঃসাড়, নিশ্চপ সুকান্ত। মুক্ত জানলা থেকে নৈদাঘ তপ্তরৌদ্রের ধারালো একখণ্ড রেখা ছড়িয়েছে সম্পাদকীয় দপ্তরের টেবিলে।

আজ মনে নেই, সুকান্তর সঙ্গে ছিল কে। ছিল কেউ একজন। কেন না সুকান্ত একা কোনোদিন আসে না। সঙ্গীসাথী কেউ একজন সহযাত্রী থাকে। শূন্য কলস নয়, প্রতিভাধর; অনন্য কবিশক্তির অধিকারী। তাই সবাই যেন বিনয়নম্র, লজ্জা আর সঙ্কোচে একটু

যেন বেশি সুস্থির। অহেতুক আত্মপ্রচারের ধান্দায় ঘোরাঘুরি করে না। ক্বচিৎ কখনও নিঃশব্দে আসে সুকান্ত। সঙ্গে থাকে কোনোদিন তার দুই বন্ধুর যে কোনো একজন। হয় কবি অরুণাচল বসু কিংবা নয়তো কবি সিদ্ধেশ্বর সেন।

সুকান্তকে দেখলে, তাকে কাছে পাওয়া গেলে যেন এক অভিনব আবেগে প্রিয়সঙ্গ-সুখের আস্বাদ পাই। কিছুদিন দেখা না পেলে অদর্শনের ব্যথা বাজে মনে। কলকাতার শহরতলিতে সুকান্তদের বাসায় গিয়ে হাজির হই। লেখা হই ? তুমি কই ? অবিশ্রান্ত শ্রাবণধারায় ডুবুডুবু বেলেঘাটা অঞ্চল। গাড়ি যাওয়ার পথ নেই আর। জলে জলময় ; যেন এক বন্যাঞ্চল। হাঁটু-ভর্তি নোংরা জলে পথ-ঘাট নালা-নর্দমা থৈ থৈ। দেখে যেন বিশ্বাস করতে পারে না সুকান্ত, মধুর আপ্যায়নের হাসি ফোটে আর মুখে। লেখার খাতা বের করে। নতুন লেখা ধরিয়ে দেয় হাতে। শান্তকণ্ঠে বলে : আপনার যেটা পছন্দ হয় নিন। বেশি তো লিখতে পারি না।

আমি বেছে নিলাম 'চারাগাছ'। গদ্য কবিতা, কিন্তু একটি অসাধারণ বলিষ্ঠ কাব্যসৃষ্টি। নিপীড়িতদের চিরকালীন ক্ষুব্ধ অনুভূতির আত্ম-প্রকাশ এই চারাগাছের ছত্রে ছত্রে। কয়েকটি পঙ্‌ক্তি :

ভাঙা কুঁড়ে ঘরে থাকি :
পাশে এক বিরাট প্রাসাদ
প্রতিদিন চোখে পড়ে ;
সে প্রাসাদ কী দুঃসহ স্পর্ধায় প্রত্যহ
আকাশকে বন্ধুত্ব জানায় :
আমি তাই চেয়ে চেয়ে দেখি।
চেয়ে চেয়ে দেখি আর মনে মনে ভাবি
ঐ অট্টালিকার প্রতি ইটের হৃদয়ে
অনেক কাহিনী আছে অত্যন্ত গোপনে,
ঘামের রক্তের আর চোখের জলের।...

বসুমতীতে প্রকাশিত এই কবিতাটি সুকান্তর 'ছাড়পত্র' গ্রন্থে গ্রথিত হয়েছে।

কথায় কথায় বললাম: এবার পূজায় কোথায় কোথায় লিখবে?

সলজ্জায় মাথা নামালো সুকান্ত। নম্রস্বরে বললে: শারদীয়া আজকাল, স্বাধীনতা, পরিচয়, রংমশাল আর শারদীয়া বসুমতীতে যদি আপনি—

কথা শেষ করে না সুকান্ত। চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দেয় আমাকে।

একজন বর্ষীয়সী মহিলা সস্নেহে বললেন: বৃষ্টি-জল ভেঙে এসেছো, একটু চা খাও বাছা।

সুকান্ত বললে: ইনি লেখিকা সরলা বসু। অরুণাচলের মা। মা, যেন সর্বকালের তিনি। এঁর কিছু কিছু লেখা পরে বসুমতীতে ছাপা হয়েছে।

তিনি আবার বললেন: শুধু চা খেও না, মিষ্টি-মুখ করো একটু।

রেকাবীতে দুটি সন্দেশ। একটি নিজে খেলাম। অন্যটি সুকান্তর হাতে ধরিয়ে দিলাম। সে কী লজ্জা তার। প্রচুর হাসলো সে। নিষ্পাপ সরল হাসি। একটা সন্দেশ খাবে, তাও কত সঙ্কোচ।

: কবে যাবে তুমি?

চায়ের পেয়ারা মুখের কাছে তুলে প্রশ্ন করলাম।

সুকান্ত বললে: আপনি বলুন কবে যাবো।

বললাম: হেমেন্দ্রকুমার রায় তোমাকে দেখতে চেয়েছেন।

আনন্দের অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস ফুটন্ত বুদ্ধি-দীপ্ত মুখে, বললে: শিশু-সাহিত্যের দিক্‌পাল উনি। ওঁর অনেক লেখা আমি পড়েছি। ভীষণ ভাল লাগে। আলাপ হলে সুখী হবো।

: একটা ডেট দাও, হেমেনদাকে খবর দেবো। তিনি আসবেন বসুমতীতে।

: সামনের সোমবারে যদি যাই?

: অসুবিধা হবে না। হেমেনদা বলতে গেলে প্রায় প্রত্যহই আসেন।

সুকান্ত বললেঃ শুনেছি উনি শিশিরকুমার ভাদুড়ীর খুব বন্ধু।

বললামঃ হ্যাঁ, এক গেলাসের বন্ধু যাকে বলে।

ভাগ্য ভাল যে সরলা দেবী তখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন।

আবার হাসল সুকান্ত। বিরাট একটা রসিকতা শুনেছে সে যেন। হাসি থামিয়ে সুকান্ত বললেঃ শিশিরকুমার একজন দুর্লভ প্রতিভা। বাংলাদেশের গৌরব। আসল নাটক দেখা যায় তাঁর অভিনয়ে।

'চারাগাছ' পকেটে রেখে বললামঃ তা হলে সুকান্ত, ঐ কথা রইল। সামনের সোমবারে তুমি আসছো।

ঃ হেমেন্দ্রকুমার কখন আসবেন ?

ঃ উনি সাধারণত দুপুরের দিকেই আসেন।

ঃ আমিও যাবো ঐ সময়ে।

তক্তাপোশ ছেড়ে উঠতেই সুকান্ত অতি অন্তরঙ্গ সুরে বললেঃ

ঃ সুকুমারদা [সাংবাদিক সুকুমার মিত্র] ভাল আছেন ?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ বিমলদা [কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ] ভাল আছেন ? তাঁকে বলবেন আমার কথা।

ঃ হ্যাঁ।

ঃ বিনয়দা [সাহিত্যিক-সাংবাদিক বিনয় ঘোষ] ভাল আছেন ?

ঃ হ্যাঁ, সবাই ভাল আছেন। শুধু তুমিই ভাল নেই।

আবার নিঃশব্দ হাসি। হাসতে হাসতে বলেঃ মাঝে মাঝে ভাল থাকি।

এখানে উল্লেখ্য, উল্লিখিত তিনজনেই তখন বসুমতীর সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করছেন।

আগেই বলেছি অবরে-সবরে সুকান্তর আবির্ভাব হতো পত্রিকার কার্যালয়ে। লেখা দিতে আসতো, লেখার সম্মানদক্ষিণা নিতে আসতো। লক্ষ্য করেছি, উপস্থিত সকল খ্যাতিমান সাহিত্যিকরা

মুগ্ধচোখে দেখতেন সুকান্তকে। যেন এক দুষ্প্রাপ্য দুর্লভ। বয়স স্বল্প, লেখেও অল্প, তবু বয়স্কদের কাছে সে স্বীকৃত, বরেণ্য।

সেদিনও সে এসেছিল মধ্যাহ্নবেলায়। সঙ্গে কে ছিলো আজ মনে নেই। যতদূর মনে পড়ে কবি অরুণাচল বসু।

ঘরে আরও অনেকে ছিলেন। বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের মধ্যে ছিলেন সজনীকান্ত দাস, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, শিবরাম চক্রবর্তী।

হাসি আর আড্ডার তুফান বইছে ঘরে।

একখানি চেয়ার দখল করে বসে পড়ল সুকান্ত। যেন কত শ্রান্ত-ক্লান্ত। মুখখানি একটু বিমর্ষ।

ঃ লেখা এনেছো কিছু ?—বললাম সম্পাদকীয় কর্তব্যে।

এপাশে-ওপাশে মাথা দোলালো সুকান্ত। মুখে সেই অমলিন হাসি মাখিয়ে ধীরকণ্ঠে বললেঃ না, দেখা করতে এসেছি। যাদবপুরে টি. বি. হাসপাতালে বেড্ পেয়ে গেছি একটা। আসছে সপ্তাহে ভর্তি হবো। এখন থেকে চিঠি, পত্রিকা, টাকাকড়ি সবই ওখানে পাঠাবেন। ভর্তি হয়ে চিঠি দেবো বেড্ নম্বর জানিয়ে।

সাহিত্যিক রসালাপ চলছিলো। হঠাৎ যেন করুণরসের রাগিণী বেজে উঠলো সুকান্তর কথায়।

বললামঃ কতদিন থাকতে হবে ? ডাক্তার কী বলছেন ?

আর কোনো জবাব নেই সুকান্তর মুখে। সে যেন মূক। নির্বাক।

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। সকলেই স্তব্ধবাক।

কবি অরুণাচল বসু খানিক বাদে বললেনঃ চল সুকান্ত, আজ ওঠা যাক।

ওঠে পড়লো সুকান্ত।

অরুণাচল চুপি চুপি আমাকে বললেনঃ ও শুনতে পায়নি আপনার কথা। জানেন তো সুকান্ত ইদানীং কানে শুনতে পায় না।

জবাব মিললো না সুকান্তর।

কিছুকাল পরে জবাব এলো এক চিঠিতে।

লিখলে, 'ডাক্তার জবাব দিয়ে গেছেন'।

তারপর আর হাসপাতাল থেকে ফিরলো না। চিরকিশোর সুকান্ত কোথায় যে গেল কে জানে!

আজও মধ্যে মধ্যে সুকান্তর লেখা চিঠিগুলি পরশমণির মতো নাড়া চাড়া করি। বুঝতে পারি, কখনও কখনও চোখের জল কোনে বাঁধ মানে না।

একমাত্র সান্ত্বনা, সুকান্ত বাংলাসাহিত্যে তার নিজেরই প্রতিভা কৃতিত্বে স্থায়ী আসন অধিকার করেছে। এবং সে আসন অনড় অটল, অক্ষয়, অব্যয়।

ছোটো ভাইয়ের স্মৃতি

মনোমোহন ভট্টাচার্য

সুকান্ত আমার ছোটো ভাই। আর পাঁচটা বড় দাদা তার ছোটো ভাইকে যেমন করে কোলে-পিঠে করে মানুষ করে, সুকান্তও আমার কাছে তেমনি করেই বড় হয়ে উঠেছিলো। আমার যখন বিয়ে হয়, তখন সুকান্তর বয়স ছ'বছর। বিয়ের পর আমার স্ত্রীর ওপরেই সুকান্তর ছিলো যতো আদর-আবদারের নির্যাতন, ওই ছোট্ট দেবরটির অনেক বিরক্তিকর আবদার সে সময় আমার স্ত্রীকে সহ্য করতে হয়েছে।

হরমোহন ঘোষ লেনে আমাদের পৈত্রিক বাড়ীর পাশেই, সাম্প্রতিককালের প্রাক্তন এম. এল. এ, কে. জি. বসুদের বাড়ী। একসময় আমি আমাদের বাড়ী ছেড়ে ওই বাড়ীর একটি অংশ ভাড়া করে থাকি। তখন সুকান্তর দিন-রাতের আড্ডা ছিলো বলতে গেলে আমার ঘরেতেই। আমার ওই ভাড়া করা ঘরের চার-দেওয়ালের জমিতে সুকান্ত অনেক কবিতাও লিখেছিলো। সে সব লেখা 'দেয়ালিকা' নাম দিয়ে ওর 'পূর্বাভাস' বইতে কিছু-কিছু ছাপা হয়েছে।

আমাদের পরিবারের একটি টোল ছিলো, সেটি আমার জ্যাঠামশাই দেখাশোনা করতেন। আর ছিলো একটি বইয়ের দোকান, সেটির ভার ছিলো আমার বাবার ওপর। হ্যারিসন রোড-কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে 'সাহিত্য মন্দির' নাম দিয়ে আমি একটি আলাদা বইয়ের দোকান করেছিলাম।

রাস্তার মোড়ে আমার দোকান। তাই তখনকার, বিশেষ করে, শিশু-সাহিত্যিকরা অনেকেই এসে কিছুক্ষণ করে সময় কাটিয়ে যেতেন। যাওয়া-আসার পথে আসতেন হেমেন্দ্রকুমার রায়, সুবিনয়

রায়চৌধুরী, সুনির্মল বসু, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় আর আমার বন্ধু ও ভ্রাতৃস্থানীয়দের মধ্যে আসতেন বিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তর ছেলে সুধাংশু গুপ্ত।

সুকান্ত তখন একটু বড় হয়েছে। আমার দোকানের অবাক-করা গল্পের বইয়ের রাজ্যে এসে নিজেকে হায়িয়ে ফেলতো সে। এটা ওটা নাড়াচাড়া করে দেখতো। ও তখন সকলের আড়ালে খাতার পাতায় কাঁচা হাতের কবিতা লেখা মক্‌সো করছে!

কে. জি. বসুর মা নিভাননী দেবী—আমাদের মাসীমা, নিজের ছেলে-মেয়েদের মতো আমাকে, আমার স্ত্রীকে ভালবাসলেও, হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার সময় দোকানে আসার সুবিধার জন্য আমি তখন তাঁর বাড়ী ছেড়ে দিয়ে কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলে টেমার লেনে উঠে এসেছি নিজের সংসার নিয়ে। সুকান্ত প্রায়ই আসে আমাদের বাড়ীতে।

একদিন বললে, দাদা, তোমার বন্ধু বিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের তো একটা কাগজ আছে 'শিখা' বলে—তা ওতে আমার লেখা ছাপার ব্যবস্থা করে দাওনা।

এর আগেই আমাদের মা মারা গেছেন। মা-হারা ছোটো ভাইটির কথা শুনে বড় মায়া হলো। তাই ওর ওই আবদার রাখার জন্য একটা তারিখ ঠিক করে বললাম ওই দিন তুই আমাদের বাড়ীতে আসিস্, বিজনকেও ওখানে ওই দিন আসতে বলবো—তোর কবিতার খাতাটা নিয়ে আসতে ভুলিস্ না।

নির্দিষ্ট দিনে দেখি সুকান্ত ঠিক কবিতার খাতা হাতে এসে হাজির হয়েছে। আমার একটা রেডিও ছিলো, দেখি রেডিওর খুব কাছে বসে গান শুনছে সে। ও কানে কম শুনতো, তাই বসতো রেডিওর খুব কাছাকাছি।

বিজনকেও সেদিন আসতে বলেছিলাম। ও আসতে সুকান্তর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম। বললাম, বিজন, তোর শিখা কাগজে আমার ছোটো ভাইয়ের কবিতা ছাপিয়ে দে—

খাতা থেকে সুকান্ত কবিতা টুকে দিলো বিজনের হাতে। পরের মাসের শিখায় সে কবিতা ছাপা হয়ে বেরুলো।

এই হলো ওর জীবনের প্রথম ছাপা কবিতা।

এরপর রেডিওর 'গল্পদাদুর আসরে' ওর রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ করার প্রোগ্রামের ব্যবস্থাও আমার দোকানে বসে-বসেই আমি করে দিই। নৃপেনদা—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় তখন রেডিওর প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর, 'গল্পদাদুর আসর' তিনিই পরিচালনা করতেন তখন।

একদিন বললাম, নৃপেনদা, আমার ছোটো ভাই আপনার আসরের একটা প্রোগ্রাম পাবে না ?

নৃপেনদা তো উদার দাক্ষিণ্যের দু'হাত সবসময় বাড়িয়েই আছেন। বললেন, পাঠিয়ে দিস্ রেডিও অফিসে আমার কাছে।

পাঠিয়েছিলাম সুকান্তকে।

দু'একবার যাওয়ার পরেই রবীন্দ্রনাথের 'শীতের আহ্বান' কবিতাটি পড়েছিলো সুকান্ত রেডিওর গল্পদাদুর আসরে।

এরপর কলেজ স্ট্রীট এলাকা ছেড়ে শ্যামবাজার অঞ্চলে ১২ নম্বর বলরাম ঘোষ স্ট্রীটের বাড়ীতে উঠে যাই আমি। সুকান্তর তখন পরিণত মন। বসুমতী, অরণি—এই সব কাগজে ওর সিরিয়স কবিতা ছাপা হচ্ছে, পুরোদমে কমিউনিস্ট পার্টির কাজে নেমে পড়েছে সে। 'স্বাধীনতা'র 'কিশোর সভা'র পরিচালক সুকান্ত। সারা দেশের 'কিশোর বাহিনী'র সংগঠক-পরিচালক। তবু আমার তো ছোটো ভাই সে। তাই একদিন বাড়ী যাওয়ার পথে ওকে দেখে দিলাম খুব ধমক।

আজ ভাবি, সেদিন যদি ওইভাবে ওকে না ধমকাতাম, তাহলে ওর জীবনে আমার শেষ ধমকের দুঃখময়-স্মৃতি আজও আমার মনে এক গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে রাখতে পারতো না।

সেদিন ছিলো দুর্গাপূজার বিজয়া-দশমীর দিন। সন্ধ্যার মুখে

দোকান বন্ধ করে বাড়ী চলেছি মিষ্টি কিনে নিয়ে। বলরাম ঘোষ স্ট্রীটের মুখেই সুকান্তর সঙ্গে দেখা।

বললাম, কি রে, তুই, কোথায় যাচ্ছিস? আমাদের বাড়ী যাবি না?

বললে, হ্যাঁ যাবো, এদিকে একটু কাজ আছে, সেরে যাচ্ছি।

ওর কথা শুনে বুঝলাম ওই পাড়াতেই ভূপেন বসুর বাড়ীর কমিউনিস্ট পার্টি অফিসে যাচ্ছে ও।

বললাম, না, কোনো কাজ নেই, চল্ আমার সঙ্গে। তুই কি রে, এই ক'দিন আগে দিনাজপুর না কোথাকার ক্যাম্পে গিয়ে কালাজ্বর নিয়ে এলি, আর একটু ভালো না হতেই আবার রাস্তায় বেরিয়ে ঘোরাঘুরি শুরু করেছিস্? এই শীতের হাওয়া পড়েছে, আর তোর গায়ে সামান্য একটা পাত্লা জামা—কখন বাড়ী ফিরবি তারও কোনো ঠিক নেই—তুই কি আবার অসুখে পড়তে চাস্, না কি?

বকতে বকতে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে গেলাম ওকে। ওর বৌদিকে বললাম, এই মিষ্টি এনেছি, এর থেকে সুকান্তকে খেতে দাও।

সুকান্ত বললো, না, আমি খাবো না, তুমি ভৎর্সনা করলে কেন আমাকে?

অভিমান ছিলো ওর খুব। মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে রইলো। শেষে অনেক সাধ্য সাধনা করে ওর বৌদি খাওয়াতে পারলো।

সেইদিন রাত্রে ওর খুব জ্বর এলো। রাত্রে ওকে আমাদের কাছে আটকে রেখেছিলাম। কিন্তু ওর জ্বর আসাতে আমার ঘর ছোটো হওয়ার জন্য ওকে ওই অঞ্চলের রামধন মিত্র লেনে আমার জ্যাঠতুতো ভাই শ্রীরাখাল ভট্টাচার্যের বাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হলো।

সুকান্তর জ্বর বাড়তে লাগলো। জ্বরের ঘোরে ভুল বকতে শুরু

করলো সে—'ঐ দাদা আসছে', 'দাদা কেন আমাকে বকলো, আমি কি অন্যায় করেছি'—এই সব বলে।

আমি ওকে দেখতে গেলাম, কিন্তু ও বাড়ীর মেয়েরা বললেন, আপনি এখন যাবেন না। আপনাকে দেখলে ও আরো উত্তেজিত হবে।

এর ক'দিন পরেই সুকান্তকে যাদবপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হলো।

এই সময়ে আমার দোকানের সামনে ভবানী দত্ত লেনে বিখ্যাত পুস্তক ব্যবসায়ী ইউ এন. ধরের ছেলে ধীরেন্দ্রনাথ ধর আমার অনুরোধে, সুকান্তর চিকিৎসার জন্য একটি চ্যারিটি পারফরমেন্স করে কিছু টাকা তুলে দিয়েছিলেন। ওকে বাঁচাবার জন্য তখনকার কমিউনিস্ট পার্টিরও চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিলো না।

কিন্তু সকলের সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো।

সেদিন বৈশাখের এক সকালে দোকানে বসে আছি, জ্যাঠতুতো ভাই শ্রীরাখাল ভট্টাচার্য বাস থেকে নেমে এসে বললো, দোকান বন্ধ করে দাও। সুকান্ত—খবর পেলাম সুকান্ত মারা গেছে। আমরা হাসপাতালে যাচ্ছি।

সেদিন, সেই সময়ে, সুকান্তকে শেষ ধমকের স্মৃতি আমাকে দগ্ধ করছিলো।

সুকান্তর মৃত্যুর ক'দিন পরেই 'ছাড়পত্র' ছেপে বেরুলো একটি প্রকাশন প্রতিষ্ঠান থেকে।

ওই প্রতিষ্ঠানের সৌম্য-সুন্দর এক চশমাপরা ভদ্রলোক—শ্রীঅনিলকুমার সিংহ আমার কাছে আসতেন আমায় দোকানের বইয়ের অর্ডার নিতে। আমার দোকান থেকে 'ছাড়পত্র' খুব বিক্রি হতো। ওঁর কাছেই একদিন শুনলাম 'ছাড়পত্র' ফুরিয়ে গেছে, আবার ছাপা হচ্ছে।

সেদিন আমি ওঁকে আমার পরিচয় দিয়ে বললাম, অনিলবাবু,

আমার বাবা, মানে ছাড়পত্রের কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের বাবা এখনও বেঁচে আছেন, ছাড়পত্র আপনারা ছাপছেন ছাপুন, কিন্তু সেই দরিদ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে যদি এর জন্য কিছু টাকা দেন, তাহলে বাবার খুব উপকার হয়।

অনিলবাবু অবাক হয়ে বললেন, সুকান্ত আপনার ভাই, আপনাদের বাবা এখনও আছেন ? কোথায় তিনি ?

বললাম, শ্রীমানী বাজারের নীচে 'সারস্বত লাইব্রেরী' আমার বাবার দোকান, ওখানে গেলেই তাঁর দেখা পাবেন।

উনি ভালো করে জেনে নিয়ে চলে গেলেন।

এর ক'দিন পরেই অনিলবাবু ছাড়পত্রের দ্বিতীয় সংস্করণের ছাপা ফর্মাগুলি নিয়ে আমার বাবার দোকানে গিয়ে হাজির হলেন। বললেন, আপনাদের যখন বইয়ের দোকান রয়েছে, সুকান্তর ছাড়পত্র এবার থেকে আপনারাই ছাপুন।

বিদায় নেওয়ার সময় আমার বৃদ্ধ বাবার হাতে দুশোটা টাকা গুঁজে দিয়ে এসেছিলেন অনিলবাবু।

মৃত পুত্রের শোক সেদিন আমার বাবা নতুন করে অনুভব করেছিলেন।

সেই থেকে ছাড়পত্র ওই সারস্বত লাইব্রেরীই ছাপে। শুধু ছাড়পত্র কেন ? সুকান্তর সমস্ত বই-ই ওরা ছেপে বিক্রি করছে এখন।

অনুলিখন : বিশ্বনাথ দে

সঙ্কীর্ণ গলি থেকে প্রশস্ত রাজপথে

অনিলকুমার সিংহ

বলা বাহুল্য সুকান্তর জীবনের পরিসর সংক্ষিপ্ত। সেই সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার সঙ্গে আমার পরিচয়ের পরিধি আরও সংক্ষিপ্ত। খুব সম্ভবতঃ ১৯৪৪-এর মাঝামাঝি থেকে ১৯৪৭ সালে তার মৃত্যুকাল পর্যন্ত। এই কম-বেশি তিন বছরের পরিচয় ছড়িয়ে ছিলো প্রধানতঃ ডেকার্স লেনের পার্টি আপিস, ৪৬নং ধর্মতলা স্ট্রীটের ফ্যাসী-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের কার্যালয় আর মাঝে মধ্যে 'অরণি' পত্রিকার দপ্তরে। এর মধ্যে কোনো-না-কোনো জায়গায় তার দেখা অবশ্যই মিলতো। এ ছাড়া কলকাতা ও উপকণ্ঠের অসংখ্য মিটিং-মিছিল তো ছিলোই। কোনো মিটিং-মিছিলে সুকান্ত নেই, একথা ভাবাই যেতো না। মুখচোরা লাজুক ছোট্ট মানুষটি সবার ভিড়ে মিশে থাকতো। একটু পরিশ্রম করে খুঁজে নিতে হতো এই যা। অতি সাধারণ পোশাক-পরিচ্ছদ, তার চেয়ে আরও সাধারণ ও অনাড়ম্বর মুখভঙ্গি। তবে সবচেয়ে যেটা বেশি নজরে পড়তো তা হলো তার লাজুক মুখের বিস্ফারিত হাসি। শত দুঃখ কষ্ট, শত কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যেও যে হাসিটি তার শেষ দিন পর্যন্ত অম্লান ছিলো।

সুকান্তকে যে কালব্যাধিতে আত্মাহুতি দিতে হলো তা যদি না দিতে হতো তাহলে সুকান্তকে আজ আমরা কিভাবে পেতাম সে বিচার নাই করলাম। সুকান্ত তার অপরিসর শিল্পী-জীবনে কাব্য ও সাহিত্যের যে সম্ভার রেখে গেছে তার বৈভবই কি কম আমাদের কাছে? তাকে বাইরে থেকে দোখে কারো পক্ষে আন্দাজ করা সম্ভব ছিলো না যে, তার মনের গভীরে একটা প্রকাণ্ড আগ্নেয়গিরি প্রতিনিয়ত জ্বলছে। ঔপনিবেশিকতার অভিশাপ, পঞ্চাশের মন্বন্তর ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর সমাজজীবনের যে-ভাঙন সে ফাটল ধরা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রত্যক্ষ করেছিলো, তা তাকে টেনে এনেছিলো সংকীর্ণ গলি থেকে প্রশস্ত রাজপথে, যেখানে ব্যারিকেড রচনা করে মানুষকে সংগ্রামের দীক্ষা

গ্রহণ করতে হয়। এই ছিলো সেদিনের জীবন যার সঙ্গে সুকান্ত নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিলো।

সুকান্তর স্মৃতিচারণ করতে বসে বড় রকমের কোনো ঘটনা একটিও মনে পড়ছে না। বোধহয় ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলার মতো তেমন কোনো বড় ঘটনা ঘটেনি তার জীবনে। অন্তত আমার তা জানা নেই। আমার কাছে তার জীবনের বড় ঘটনা ছিলো তার এক-একটা কবিতার জন্ম, যা কাগজে প্রকাশিত অবস্থায় পড়ে চমকে উঠতে হতো। মনে :হতো, আরে, কালই তো দেখা হলো, অথচ কবিতাটির কথা কিছুই বললো না সুকান্ত! মাঝে মাঝে অবশ্য প্রকাশিত হবার আগেই লেখা পড়ে শুনিয়েছে। স্পষ্ট মনে আছে, তার 'লেনিন', 'দেশলাই কাঠি', 'আঠারো বছর বয়স' ও 'হে মহা-জীবন' কবিতাগুলির কথা। ছাপাখানার কালি লাগার আগেই কবিতাগুলি সুকান্তর মুখে শুনেছিলাম—দেখেছিলাম তার গোটা গোটা হরফে লেখা পাণ্ডুলিপি। আঠারো বছরের বল্গাহীন জীবনের তেজোদৃপ্ত ভাষণ ছড়িয়েছিলো কবিতাগুলির প্রতিটি ছত্রে।

আধুনিক বাংলা কবিতা জটিল থেকে জটিলতর পথপরিক্রমায় অবতীর্ণ হওয়ার আগেই সুকান্ত বিদায় নিয়েছিলো। সুতরাং, তাকে 'আধুনিকতা'র জটাজালে জড়িয়ে পড়তে হয়নি। ছড়িতে পড়তে হয়নি শুধুই মনের ক্লান্ত অন্বেষায়। খাপখোলা তরোয়ালের মতো তার কবিতার ছত্রগুলি তাই আমাদের বেদনায় ভারাক্রান্ত করেছে, প্রেরণায় প্রবুদ্ধ ও ক্রোধে উদ্দীপ্ত করেছে। এই কারণেই সবাই আপনার করে নিতে পেরেছে সুকান্তকে।

'ছাড়পত্র' প্রকাশিত হবার আগেই সুকান্তের মরদেহকে আমাদের কাশীমিত্তির ঘাটে রেখে আসতে হয়েছিলো। সুকান্ত বোধহয় একদিক থেকে ভাগ্যবান যে, তাকে ষাটের দশকের বাংলা দেশের মর্মান্তিক ও সর্বাত্মক অবক্ষয়কে প্রত্যক্ষ করতে হয়নি। সে এই পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করে যেতে চেয়েছিলো। ' সে সংগ্রাম আজও চলছে, আগামীকালও চলবে শত সহস্র মানুষের অমূল্য জীবনের বিনিময়ে।

একটি গৌরবময় সৌভাগ্য

বিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

এই সংকলনের সম্পাদকের অনুরোধ যে, কবি সুকান্তর লেখা আমিই সর্বপ্রথম প্রকাশ করেছি, এবং আমিই তাকে সাহিত্যের আসরে এনেছি বলে আমাকে তার সম্বন্ধে কিছু লিখে দিতে হবে। প্রস্তাবটি শুনে আনন্দের থেকে যে মনে মনে একটি গর্ব অনুভব করেছি সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এমন একজন কবিরত্নের যে আমিই আবিষ্কারক, এটা ভাবতে কার না ভালো লাগে!

সুকান্ত কতো বড় কবি, তা নিয়ে আমি এখানে আলোচনা করতে বসিনি। তাকে আমি কিভাবে, কোথায়, কোন্ পরিবেশে আবিষ্কার করি, সেইটুকুই শুধু বলবো।

কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে আমার এক প্রিয় পুস্তক ব্যবসায়ী বন্ধু মোনাদার [শ্রীমনোমোহন ভট্টাচার্য] 'সাহিত্য মন্দির' নামের বইয়ের দোকানে তখন আমি নিয়মিত যেতাম। তিনিও তাঁর সুখ দুঃখের সব কথা আমাকে না জানিয়ে থাকতে পারতেন না। মোনাদার খুব স্নেহভাজন আর প্রিয়জন ছিলাম আমি।

একদিন তিনি একটা নতুন রেডিও সেট কিনেছেন বলে সেটা দেখাবার জন্য আমাকে তাঁর বাড়ীতে যেতে বললেন। ওই অঞ্চলেই তিনি থাকতেন, কিন্তু বাড়ীতে যাবার দরকার কোনদিন এর আগে হয়নি। সেদিন গেলাম।

আমাকে দেখে মোনাদা খুব খুশী! তাড়াতাড়ি হাত ধরে নতুন কেনা রেডিও সেটের সামনে টেনে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে বললেন, ছাখ্ কেমন রেডিও কিনেছি!

ইতিমধ্যে ছোটোরা, অর্থাৎ মোনাদার ছেলে-মেয়েরা আমাকে ঘিরে ধরেছে, আমিও তাদের সঙ্গে আলাপ করার জন্য ব্যস্ত, কিন্তু

একটি ছেলের ওপর গোড়া থেকেই নজর রেখেছি, যে ঠিক রেডিওর ওপাশে বসে থেকে আমার সঙ্গে আলাপ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলো! ছেলেটির মনের অবস্থা বুঝতে পেরে আমি ওকে দেখিয়ে মোনাদাকে জিজ্ঞেস করলাম, ওর সঙ্গে তো পরিচয় করিয়ে দিলেন না?

মোনাদা এবার হেসে বললেন, শোন্ বিজন, এবার তবে সত্যি কথাই বলি। রেডিও দেখাবার নাম করে তোকে আমার বাসায় আসতে বললেও, আসলে ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যেই তোকে আজ আসতে বলেছিলাম। ও সকাল থেকে তোর জন্যে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে আর বার বার প্রশ্ন করছে, বিজনদা আসবে তো দাদা?

মোনাদার কথা শুনে আমার বুঝতে বাকী রইলো না যে, ছেলেটি ওঁরই ছোটো ভাই। তাই হাসিমুখে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, তাই নাকি, বিজনদার অপেক্ষায় তুমি বসে আছো? কি নাম ভাই তোমার?

আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই আমাকে প্রণাম করার জন্য ও হাত বাড়িয়েছে তখন। বুঝতে পেরে আমি সঙ্গে সঙ্গে ওর হাতটা চেপে ধরে সস্নেহে বুকে জড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, বিজনদার সঙ্গে কি দরকার তোমার?

আমার প্রশ্ন শুনে ও লজ্জায় মাথাটা নিচু করে ফেললো। উত্তর দিলেন মোনাদা। বললেন, ও আমার ছোটো ভাই সুকান্ত। কবিতা লেখে। ওর একটা কবিতার খাতা আছে, তোকে দেখাবে। তুই ওর লেখা তোর 'শিখা' কাগজে কিছু ছেপে দেবার ব্যবস্থা করে দে না।—সুকান্ত, তোর কবিতার খাতাটা দেখানা বিজনকে।

সুকান্ত লজ্জায় আর ভয়ে ভয়ে আমার হাতে একটি বাঁধানো খাতা তুলে দিলো।

দু'চারটে কবিতা পড়ার পর আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা

সুকান্ত ভাই, তুমি কবিতা ছাড়া আর কিছু লেখো না? ধরো ছোটদের জন্যে গল্প কি জীবনী?

ও জবাব দিলো, না, তা এখনো লেখার চেষ্টা করেনি। তবে কবিতা লিখতেই আমার ভালো লাগে। জীবনীটা লেখার চেষ্টা করা যায়।

আমি ওকে আবার জিজ্ঞেস করলাম, কার জীবনী তোমার কাছে সবচেয়ে ভালো লাগে?

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী।

কেন?

সুকান্ত সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো, স্বামীজি ছিলেন একজন খুব বড় দেশপ্রেমিক আর স্বদেশ-হিতৈষী মানুষ। তাঁর কর্মময় জীবন আলেচনা করলে দেখা যায়, তিনি সারা জীবন ধরে দেশবাসীকে উদার, মহৎ আর স্বদেশ-বৎসল করে তোলার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে গেছেন। তাঁর সে চেষ্টা খুব বেশীরকম সার্থক হয়েছে বলেই আজ জেগেছে ভারতবাসীর মধ্যে দেশাত্মবোধ আর চেতনা।

স্বামীজির প্রতি সুকান্তর এমন শ্রদ্ধা দেখে আমি ওকে ছোট্ট করে তাঁর জীবনীটাই লিখতে বললাম। আর বললাম, তোমার এই কবিতার খাতা থেকে সবচেয়ে ভালো কবিতাটি আলাদা কাগজে টুকে দাও, আমি 'শিখা'য় ছেপে দেবো।

আমার কথা শুনে সুকান্ত খুশী মনে কবিতার খাতা নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলো। আর কিছুক্ষণ পরে খাতা থেকে একটা কবিতা টুকে এনে দিলো আমার হাতে। বললো, বিজনদা, এটাই আমার সবচেয়ে ভালো কবিতা, আর এই সঙ্গে আর একটা কবিতাও দিলাম।

ওর পরের কবিতাটি দেবার ভঙ্গি দেখে আমি হেসে ফেললাম। তারপর ওর পিঠে সস্নেহে হাত বুলিয়ে বললাম, পাগল কোথাকার! এই বুঝি তোমার 'একটা কবিতা' দেওয়া হলো?

কবিতা দু'টি ওকে ছাপার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেদিন ফিরে এলাম।

ক'দিন পরে সুকান্ত আমার নির্দেশ মতো স্বামী বিবেকানন্দের ছোট্ট এক জীবনী লিখে মোনাদার মারফত আমার কাছে পাঠিয়ে দিলো। সেই সঙ্গে অনুরোধ করলো যে, শিখার পরবর্তী সংখ্যায় [পৌষ : ১৩৪৭] ওর লেখা স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী আর সেই সঙ্গে আমার হাতে দেওয়া ওর কবিতা দু'টি থেকে একটি—এই দু'টি লেখাই যেন ছাপা হয়। একই সংখ্যায় একই লেখকের দু'টি লেখা ছাপা হচ্ছে বলে পাঠকরা যদি কিছু মনে করে, সেইজন্য যেন কবিতার লেখকের নাম 'সুকান্ত ভট্টাচার্য' না ছেপে ওর ছদ্মনাম 'শ্রীসুচার্য' ছাপা হয়।

ওর সে অনুরোধ আমি সেদিন রক্ষা করেছিলাম।

এই হলো সুকান্তকে আবিষ্কার করার সংক্ষিপ্ত কাহিনী। মোনাদা সচেষ্ট না হলে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রথম রচনা ছাপার গৌরবময় সৌভাগ্য সেদিন আমার হতো না কিছুতেই।

এরপর আমার সীমানা ছাড়িয়ে সুকান্ত অনেক বড় হয়ে, তার অগণিত কাব্য-পাঠকের মন জয় করতে পেরেছে।

লাল রক্তকরবী

শান্তিময় রায়

সুকান্ত আমার কাছে একদিন রক্তকরবী-গুচ্ছ চেয়েছিলো। কিন্তু আমি তা সময় মতো তার হাতে পৌঁছে দিয়ে মুখে হাসি ফোটাতে পারিনি।

সেদিন অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিলো আমার।

যখন গেলাম, সুকান্ত তখন আর ফুল নেবার জন্য অপেক্ষা করে বসে নেই।

তাই আজো লাল রক্তকরবীর দিকে তাকালেই সুকান্তর কথা মনে পড়ে।

চিরকাল মনে পড়বে।

কিন্তু এ তো সব শেষের কথা। এর আগেও অনেক কথা আছে। অনেক ঘটনা। অনেক স্মৃতি।

১৯৪৩ সাল।

আমি তখন যশোর কলেজে অধ্যাপনা করি। কমিউনিস্ট পার্টির কাজও করি। সুকান্তকে ওই সময়েই প্রথম দেখি আমি। একটি মুখচোরা লাজুক ছেলে আমাদের কাছাকাছি আসতো, কাজ করতো উৎসাহ নিয়ে। নাম শুনলাম সুকান্ত ভট্টাচার্য। সে তখন আমাদের পার্টির সভ্য হয়েছিলো কিনা তাও জানতাম না ঠিক মতো।

কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ ছিলো তখন আমার কম। যশোর কলেজে সেনাবাহিনীর লোকেদের মধ্যে পার্টির কাজ করি। সেটা '৪৩এর আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাস। তখন দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে কলকাতার ছাত্র ও যুবসমাজ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছে।

এই রকম একটি স্কোয়াডের পরে, একদিন, কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের

এক চায়ের দোকানে সুকান্তর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হলো। অত্যন্ত নম্র আর লাজুক ছিলো সুকান্ত। তাই চায়ের টেবিলের একটি নিরালা কোণ বেছে নিয়ে বসেছিল' চুপটি করে।

আমাদের হাসি-গল্পের ফাঁকে একসময় সুকান্তর দিকে চোখ পড়লো আমার। দেখলাম টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে এক টুকরো সাদা কাগজে কি যেন লিখে চলেছে সে।

তখনও সুকান্ত কবি হিসাবে কোনো স্বীকৃতি পায়নি।

হঠাৎ আমাদের মধ্যে একজন কমরেড ওর কাছ থেকে লেখা কাগজটি টেনে নিয়ে চেঁচিয়ে পড়ে শোনালেন সকলকে। 'একটি মোরগের কাহিনী' :

একটি মোরগ হঠাৎ আশ্রয় পেয়ে গেল
বিরাট প্রাসাদের ছোট্ট এক কোণে,
ভাঙা প্যাকিং বাক্সের গাদায়—
আরো দু'তিনটি মুরগীর সঙ্গে।

আশ্রয় যদিও মিলল,
উপযুক্ত আহার মিলল না।
সুতীক্ষ্ণ চীৎকারে প্রতিবাদ জানিয়ে
গলা ফাটাল সেই মোরগ
ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত
তবুও সহানুভূতি জানাল না সেই বিরাট শক্ত ইমারত।···

আমি ঠিক কবি না হলেও অদ্ভুত ভালো লেগেছিলো সেদিন সুকান্তর ওই কবিতা। কিশোর কবির ঐকান্তিক প্রয়াস সেদিন আমাকে মুগ্ধ না করে পারেনি। সুকান্তর কবিতায় অসাধারণ আন্তরিকতা সেদিন আমি আবিষ্কার করতে পেরেছিলাম।

এর পর থেকে এখানে-সেখানে দেখা হলেই ওকে আমি প্রথমেই জিজ্ঞেস করতাম : নতুন কি লিখেছ ?

সুকান্ত তার সেই স্বভাবসুলভ লাজুক, মুখচোরা নম্র হাসি দিয়ে আমার কথার জবাব দিতো।

এরপর ১৯৪৪ সাল, যুদ্ধক্লান্ত বছর যখন গড়িয়ে পড়লো '৪৫ সালের শেষের দিকে, তখন কলকাতার দিকে দিকে বিদ্রোহ।

ওই সময় ধর্মতলার এক মিছিলের মধ্যে সুকান্ত আমায় মুখোমুখি হলো। সেদিন সুকান্তর চোখে ছিলো দীপ্তি, কিন্তু বড় ক্লান্ত মনে হলো তাকে। সুকান্তর মনের বয়স যেন অনেক বেড়ে গেছে, চোখে মুখে তারই আভা।

তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছিলো, মৌলালির বাঁক পেরিয়ে ক্যাম্বেল হাসপাতালের দিকে ব্যাফেল্ ওয়ালের কালো ছায়ায় অনেক ভীড় জমেছিলো। ঘন ঘন মিলিটারী ট্রাকের আনা-গোনা। এই সময় হঠাৎ আমার নজরে পড়লো অদূরে শিয়ালদা'র কোণে এক অসহায় ফিরিঙ্গী মেয়েকে ঘিরে কিছু ব্রিটিশ বিরোধী বিক্ষোভকারীর জটলার দিকে। ইংরেজ সরকারের ওপর ওদের যা কিছু ক্ষোভ আর ক্রোধ সব যেন ওই একা মেয়েটির ওপর অশুভ অপমান হয়ে ঝরে পড়তে চাইছে!

দেখে আমি চমকে উঠলাম। বেপরোয়াভাবে দৌড়ে গেলাম সেই ভীড়ের মধ্যে, মেয়েটিকে ওদের হাত থেকে ছাড়িয়ে আনার জন্য। চারদিক থেকে আমার ওপর বর্ষিত হলো শ্লেষ-ব্যঙ্গ-কটুমন্তব্য, দালাল-দালাল, ব্রিটিশের দালাল, দেশের শত্রু—

কিন্তু আমাকে বাধা দিতে পারলো না। হাতে ছিলো আমার একটি রিভলবার। সেদিকে তাকিয়েই তাদের নিশ্চুপ হতে হলো।

এই সময় আমার ঠিক পাশেই সুকান্তর সাহসী বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম: শান্তিদা, আপনি দাঁড়ান, আমি এক্ষুণি পার্টি অফিসে খবর দিচ্ছি।

কাছেই ছিলো আমাদের কমিউনিস্ট পার্টির অফিস।

আমি মুখ ফিরিয়ে সুকান্তর বিদ্যুৎজ্বলা চোখের দিকে তাকালাম।

ওর চোখে মুখে সেদিন ওই ফিরিঙ্গী মেয়েটির অপমানকারী দুর্বৃত্তদের প্রতি যে ঘৃণা আমি দেখেছিলাম, তা কোনদিনই ভোলবার নয়। ইংরেজ হোক, তবু তো সে অসহায় মেয়ে। সুকান্ত সেই অপমানকারী দুর্বৃত্তদের জন্য ঘৃণার থুথু নিক্ষেপ করেছিলো সেদিন।

ওই অসহায় বৃটিশ মহিলাকে বাঁচাবার জন্য সুকান্তর সেদিনের সেই ব্যগ্রতাকে আমি তার চরিত্রের একটি দিক হিসাবেই এখানে চিহ্নিত করছি।

এর পর '৪৫-৪৬ সালের সব ক'টি বড় গণ-আন্দোলনে সুকান্তকে সামিল হতে দেখেছি। যেখানে বিপ্লব সেখানেই সুকান্ত, যেখানে আন্দোলন সুকান্ত সেখানেই। অস্থির হয়ে অনবরত চরকির মতো ঘুরতো সুকান্ত।

কিছুদিন পরে কলকাতার বুকের ওপর নেমে এলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার হানাহানি। কমিউনিস্ট পার্টি আর 'স্বাধীনতা'র অফিস আট নম্বর ডেকার্স লেনই ছিলো তখন একমাত্র জায়গা, হিন্দু-মুসলমান নির্ভয়ে যেখানে মিলিত হতে পারতো। আমরা ওই বাড়ীটিকে বলতাম 'শান্তির দ্বীপ'—'আয়লাণ্ড অব পিস্'।

ওখান থেকে 'স্বাধীনতা'য় 'কিশোর সভা'র কাজের ফাঁকে কতোদিন আমাদের সঙ্গে রিলিফ এ্যাণ্ড রেস্কিউ-এর কাজে যোগ দিয়েছিল সুকান্ত। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিদিনের পাশবিকতার যন্ত্রণা কাঁটার মতো বিঁধেছিলো তার মর্মে মর্মে।

সুকান্ত যেন হঠাৎ বিমর্ষ, বেদনার্ত হয়ে উঠলো।

তার কিছুদিন পরেই সুকান্তকে দেখতে যেতে হলো যাদবপুর টি. বি. হাসপাতালে।

: কি হবে শান্তিদা, দাঙ্গা থামবে? আবার আমরা বিপ্লবের পথে এগিয়ে যেতে পারবো?—এই ছিলো সেদিন সুকান্তর একমাত্র প্রশ্ন। তার সারা মন প্রাণ জুড়ে-এই একটি ভাবনাই তোলপাড় করেছিলো সেদিন।

দিন যতো এগিয়ে আসছিলো, সুকান্তর চোখে মুখে ফুটে উঠছিলো এক বিপ্লবী দীপ্তি। মানুষের প্রতি ছিলো তার গভীর মমতা, আর ছিলো মহান প্রত্যাশা।

সুকান্ত একদিন আমার কাছে রক্তকরবী-গুচ্ছ চেয়েছিলো। যাই-যাই করেও নিয়ে যাওয়া হয়ে ওঠেনি নানা কাজের মধ্যে। তারপর হঠাৎ একদিন বন্ধুবর গিরীন চক্রবর্তী খবর নিয়ে এলেন: চলুন, সুকান্তকে নিয়ে যেতে হবে।

আমি জানতাম এদিন আসবে। কিন্তু এতো শিগ্‌গির আসবে, ভাবতে পারিনি। একটা ছোট্ট রক্তকরবীর গুচ্ছ নিয়ে সুকান্তকে শেষ স্নেহার্ঘ্য দিয়েছিলাম সেদিন।

সুকান্ত চিরদিনের মতো চলে গেলো, কিন্তু দীর্ঘজীবি হয়ে রইলো আমাদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন।

তাই কবি সুকান্ত আজ বাংলার ঘরে ঘরে। বাংলার বাইরেও, ভারতের প্রান্তে প্রান্তে।

কিন্তু আজো, লাল রক্তকরবী দেখলেই আমার সুকান্তর কথা বেশী করে মনে পড়ে।

অনুলিখন: বিশ্বনাথ দে

কবি সুকান্ত

শিশির চট্টোপাধ্যায়

বাংলাসাহিত্যে সুকান্ত ভট্টাচার্য একটি বিশিষ্ট উজ্জ্বল নাম। উদ্গত যৌবন-পর্বেই কবি সুকান্তর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। জীবনের যে পর্বে কবি-প্রতিভার সম্পূর্ণ বিকাশের সুযোগ ঘটে—অকাল-মৃত্যুতে সুকান্ত তা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তবু বলা যায়, একুশ বৎসর আয়ুষ্কালের মধ্যে তিনি বাংলাসাহিত্যকে যা দান করেছেন তা সত্যই অপরিমেয়। এই রকম প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন কবি যদি আরও কিছুকাল জীবিত থাকতেন তাহলে যে বাংলাসাহিত্যের ভাণ্ডার অনেকটা সমৃদ্ধ হতো তা নির্দ্বিধায় বলা চলে।

সুকান্তের জীবিতকালে তার কবিকর্মকে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি—এটাই অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। অবিশ্যি দুঃখ করে কোনো লাভ নেই—কেননা এইটাই চিরাচরিত আমাদের জাতীয় রীতি। স্রষ্টার তিরোধানের পর আমরা তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে সচেতন হই। সুকান্তর ক্ষেত্রেও তার কোনোরকম ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'ছাড়পত্র' তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বাংলাসাহিত্যে কবি হিসেবে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। তারপরই তাঁর 'ঘুম নেই', 'পূর্বাভাস' কাব্যগ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়।

যৌবনের প্রারম্ভলগ্নে সুকান্তর জীবনান্ত যেন তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর জীবনচিন্তার একটি বলিষ্ঠ বিদ্রোহ ঘোষণা। মত্যুর ক্ষণ অবধি তিনি জীবিকা-নির্বাহের কী নিরবচ্ছিন্ন দুর্জয় সংগ্রামই না করেছেন! তাঁর ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে যাঁরা নিবিড়ভাবে জড়িত ছিলেন তাঁরাই জানেন। শুধু তাই নয়, এই নিরন্তর সংগ্রামের জন্য তাঁর জীবনের বহু আশা-আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ এবং বহু কর্মও

অসমাপ্ত থেকে গেছে। সত্যিই তিনি ছিলেন জীবন-সংগ্রামী। তাঁর ব্যক্তিজীবনের এই সংগ্রামশীল চেতনাই তাঁকে কাব্যচিন্তায় বিদ্রোহী করে তুলেছিল। কাব্যের ললিতশোভন রূপে তিনি কোনোদিন বিমোহিত হতে চান নি। অন্তরে অন্তরে কবি হয়েও স্বপ্নের মধ্য দিয়ে তিনি দেখতে চেয়েছেন পৃথিবীর এক উদ্ভাসিত গদ্যময় রূপ। তাই লিখেছেন :

কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি,
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় ঃ
পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝল্‌সানো রুটি।

(ছাড়পত্র)

সুকান্ত সত্যই জনদরদী কবি—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায় 'যে আছে মাটির কাছাকাছি'। সংসারের যে অগণিত মানুষ দিনের পর দিন নির্বিচারে লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত হয়েছে, তাদেরই ব্যথা ও বেদনাকে বাণীমূর্ত করেছেন সুকান্ত তাঁর কাব্যের দৃপ্ত ভাষায়। মানবজাতির অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর কাব্যের ছন্দে ছন্দে আছে যেন জেহাদের বলিষ্ঠ ঘোষণা। তাই তো তিনি সমাজের শোষক সম্প্রদায়কে প্রশ্ন করেছেন :

শোন্‌ রে মালিক,
শোন্‌ রে মজুতদার !
তোদের প্রাসাদে জমা হল কত
মৃত মানুষের হাড়—
হিসাব কি দিবি তার ? (বোধন)

তাঁর এই যুগান্তকারী চিন্তাধারাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁকে আজীবন বহু প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। তবু তিনি ছিলেন তাঁর জীবনাদর্শের প্রতি অবিচল ও অনড়। তিনি আদর্শের প্রতি সেই অবিচল দৃঢ় মনোভাব প্রকাশ করেছেন তাঁর কাব্যের এই কয়টি ছত্রে :

প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা
ভেঙেছিস ঘরবাড়ি,
সে কথা কি আমি জীবনে মরণে
কথনো ভুলতে পারি ? (বোধন)

সুকান্ত চেয়েছিলেন আমাদের সমাজব্যবস্থার এক নবরূপায়ণ। বিদ্রোহের সুরে সেই নবরূপায়ণের অভীপ্সাকে তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর কাব্যে। পৃথিবীকে তিনি জঘন্য কলুষিত পরিবেশ থেকে সুস্থ প্রশান্ত এক পরিবেশে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সমগ্র কাব্য সেই উর্ধ্বায়নের সংগীতে মুখরিত। তিনি এটা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন যে পৃথিবীতে যতদিন মানবসমাজে বৈষম্য, অত্যাচার ও অন্যায় রাজত্ব করতে থাকবে ততদিন কবিতার কোনো সত্তা অনুভব করা যাবে না। তাই তিনি সর্বাত্মকভাবে ঐগুলির প্রতি নিরন্তর আঘাত হেনে মানবসমাজ থেকে নির্মূল করতে চেয়েছিলেন তাদের অস্তিত্বকে। পৃথিবীকে সুন্দর করে তোলার জন্য তিনি ছিলেন নিরন্তর প্রয়াসী। তাই তাঁর আশাবাদী মন দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছে :

এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান,
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে
চলে যেতে হবে আমাদের।
চলে যাব—তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি—
(ছাড়পত্র)

সুকান্ত মনেপ্রাণে ছিলেন বিদ্রোহী। প্রতিকূল পরিস্থিতি ও মানসিক অস্থিরতা তাঁর বিদ্রোহী জীবনকে প্রবলতর করে তুলেছিল। কিন্তু একটা কথা, তাঁর জীবনের এই বিদ্রোহী চিন্তা তাঁকে কোনোদিন বিশৃঙ্খল করে তোলে নি।

সমগ্র বিশ্ব উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলছিল যুদ্ধোন্মত্ত হয়ে। এই উন্মত্ত জাগতিক পরিস্থিতির কুপরিণামের কথা চিন্তা করে তিনি অন্তরে অন্তরে ব্যথিত হয়ে উঠেছিলেন। তবু তিনি অনাগত ভবিষ্যৎকালের শুভদিনের প্রত্যাশার বাণী শুনিয়েছেন তাঁর কাব্যের মরমী ভাষায় :

যে পথে নিত্য সূর্যোদয়
আনে প্রলয়,
সেই সীমান্তে বাতাস বয় ;
তাই প্রতীক্ষা—ঘনায় দিন
স্বপ্নহীন।

(উদ্বীক্ষণ)

'আগ্নেয়গিরি' কবিতায়ও দেখা যায় সেই একই সুরের প্রতিধ্বনি :

আর,
আমার দিনপঞ্জিকায় আসন্ন হোক
বিস্ফোরণের চরম, পবিত্র তিথি।

নির্বস্তুক চিন্তার প্রতি সুকান্তর ছিল গভীর অনীহা। তিনি ছিলেন মাটির পৃথিবীর সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। কী কাব্যে, কী কর্মে তিনি কোনো দিন মাটির মানুষের কাছ থেকে দূরে যাওয়ার চেষ্টা করেন নি। তাই তৎকালীন যাবতীয় রাজনৈতিক ঘটনা তাঁর কবি-মনকে প্রগাঢ়ভাবে আলোড়িত করেছিল। কলকাতায় ধর্মতলা স্ট্রীটে পুলিসের গুলিচালনা, চীন ও ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা-আন্দোলন, জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি ঘটনা তাঁর কবি-মনের উপর গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। কবি হলেও তিনি নিছক কল্পনার দ্বারা লালিত হন নি। বাস্তবাশ্রিত জীবনধারার সঙ্গে ছিল তাঁর নিবিড় সম্পর্ক। তাই ভবিষ্যৎ-চিন্তায় তিনি ছিলেন অটল বিশ্বাসী। বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে সমগ্র মানবজাতির স্বাধীনতা লাভের বিশ্বাসে তিনি ছিলেন একান্ত নির্ভরশীল। তারই অভিব্যক্তি আছে তাঁর 'ঠিকানা' কবিতার এই কয়টি পঙ্‌ক্তিতে :

বন্ধু, আজকে বিদায় !
দেখেছ উঠল যে হাওয়া ঝোড়ো,
ঠিকানা রইল,
এবার মুক্ত স্বদেশেই দেখা কোরো।

কবি সর্বদাই তাঁর সমসাময়িক কালের পূর্বগামী। শুধু তাই নয়, তিনি ত্রিকালদর্শী। তিনি বর্তমানের সীমাতীত জগৎকে উপলব্ধি করেন, বর্তমানকে প্রত্যক্ষ করেন ও অনাগত ভবিষ্যৎকে তাঁর মানস-কল্পনায় রূপায়িত করেন। তাঁর দৃষ্টির জগৎ বহুপ্রসারিত! তাই জগতের বহু আসন্ন ঘটনার সংকেত তাঁর মানসপটে বহু পূর্বেই অঙ্কিত হয়ে ওঠে। সুকান্ত ছিলেন এই কবিধর্মের এক সার্থক অধিকারী। ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল যাবৎ বিদেশী সাম্রাজ্যলোলুপ শক্তির দ্বারা ছিল প্রপীড়িত। সুকান্তর জন্ম হয় সেই বিদেশী পদানত রাজ্যে। শতাব্দীব্যাপী দাসত্ব ও তজ্জনিত আত্মমর্যাদাহীনতা ও অবমাননার পাপের যে বোঝা আমরা বয়ে বেড়িয়েছি তা তাঁকে মর্মবিদ্ধ করেছে। কবি সুকান্ত দেশের কোটি কোটি মানুষের এই জীবন-যন্ত্রণা হৃদয়ের গহন গভীরে অনুভব করেছেন। তার মধ্যেই আবার দেখেছেন আমাদের দেশের মানুষের জীবনে কী অপরিসীম ঔদাস্য, আলস্য ও নিষ্ক্রিয়তার নির্লজ্জ রূপ। তাই তাদের এই ম্রিয়মাণ সত্তাকে উজ্জীবিত করে তোলার জন্য তাঁর বিদ্রোহী কবি-মন সোচ্চার হয়ে উঠেছে :

তার চেয়ে পোষমানাকে অস্বীকার করো,
অস্বীকার করো বশ্যতাকে।
চলো, শুকনো হাড়ের বদলে
সন্ধান করি তাজা রক্তের,
তৈরী হোক লাল আগুনে ঝল্‌সানো আমাদের খাদ্য।
শিকলের দাগ ঢেকে দিয়ে গর্জিয়ে উঠুক
সিংহের কেশর প্রত্যেকের ঘাড়ে।

(১লা মে'র কবিতা '৪৬)

আবার 'বিদ্রোহের গান' কবিতায় :

ছিঁড়ি, গোলামির দলিলকে ছিঁড়ি,
বেপরোয়াদের দলে গিয়ে ভিড়ি
খুঁজি কোন্‌খানে স্বর্গের সিঁড়ি
কোথায় প্রাণ!

* * *

জানি রক্তের পেছনে ডাকবে সুখের বান।

সুকান্ত যে একজন প্রকৃত কবি সে বিষয়ে দ্বিরুক্তির কোনো অবকাশ নেই! তাঁর পরিণত কাব্যচিন্তাই তার পরম সাক্ষ্য বহন করছে। তাঁর কবিকর্ম অনাগত ভবিষ্যৎকালের মানুষের কাছে স্বমহিমায় পরিচিত হয়ে উঠবে। কালের ইতিহাসে তাঁর কৃতির থাকবে উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

সুকান্তর শেষ জীবন

রাখাল ভট্টাচার্য

সুকান্ত আমার চেয়ে বয়সে ষোল বছরের ছোট ছিল। সুকান্তর বাবা অর্থাৎ আমার কাকা এবং আমার বাবা যখন পৃথক হন, তখন সুকান্তর বয়স সাত বছর। যেহেতু গৃহান্তর হলেও মনান্তর হয়নি, সুকান্ত বেশির ভাগ আমাদের বাড়িতেই থাকতো।

সবে যখন বসতে শিখেছে, তখনই কোন গান বা সুরেলা আবৃত্তি শুনলে সুকান্ত তালে তালে দুলতো, যার জন্য আমাদের এক আত্মীয়, যিনি তখন আমাদের যৌথ পরিবারে থাকতেন, তিনি সুকান্তকে আদর করতেন ঝুলনমণি বলে। সেই সহজাত সুরপ্রিয়তা ক্রমে সুরেলা রামায়ণ মহাভারত পাঠের প্রতি তাকে আকৃষ্ট করে। এই সব কারণে সে আমার ও আমার সহোদর মনোজের প্রিয় হয়েছিল। আর তার সবচেয়ে আকর্ষণ ছিল তার বৌদি সম্পর্কে। সে আকর্ষণ কাটিয়ে তাকে তার বাবা-মার কাছে পঠোনো খুব কঠিন ছিল।

বয়সে অনেক বড় হয়েও ছোটদের আদর আব্দার বায়না সহ্য করবার ব্যাপারে আমার সহজ প্রবণতাই সুকান্তকে আমার সঙ্গে অতি শৈশব থেকে মানসিক ঘনিষ্ঠতা অর্জনে সাহসী করেছিল।

কিন্তু শৈশব পেরিয়ে কৈশোর আসতেই সুকান্তর সব সময়ের অন্তরঙ্গতা হল সমবয়সীদের সঙ্গে, আমি হয়ে গেলাম তার অভিভাবক স্থানীয় বন্ধু। রাজনীতি ও কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে যুগচিন্তার ধারক আমার অগ্রজ গোপাল ভট্টাচার্যের মৃত্যু হয় ১৯৩৮এ, এবং তাঁর উত্তরাধিকার পড়ে আমার উপর। বারো বছরের সুকান্ত তার যুগচিন্তা ও কাব্যসাহিত্যের আগ্রহে আমার সঙ্গে প্রশ্নোত্তরে বহু আলোচনা করতো। কিছুদিন বাদেই ওর মায়ের মৃত্যুর পরে আমার মাকে কেন্দ্র করে আমাদের পরিবারের সঙ্গে অনেক বেশি জড়িয়ে গেল সুকান্ত।

কিন্তু আমার সঙ্গে তার মানসিক ঘনিষ্ঠতা কমতে থাকলো, কারণ বয়স বাড়তে না বাড়তেই ও ছাত্র আন্দোলন ও কমিউনিস্ট মতবাদের সূত্রে যাদের সঙ্গে বাঁধা পড়লো, তারাই হল ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমি অভিভাবক-বন্ধু মর্যাদা না হারালেও, সুকান্ত বাড়তে লাগলো মোটামুটি আমার চোখের ও প্রভাবের আড়ালে।

তবু ছাত্রনেতা অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্যর কাছ থেকে কমিউনিজমের যুক্তি শুনে এসে তারই প্ররোচনায় ও সেই সব যুক্তি আউড়ে আমাকে ওদের মতবাদে টানবার চেষ্টা করতো। স্বভাবতই তর্কে পারতো না। আমার সঙ্গে তর্ক করতে যে পরিমাণ সমীক্ষা ওকে স্বভাবগুণে রক্ষা করতে হত, সেই ত্রুটি কাটাবার জন্য ও এনে আমাকে পড়তে দিত ওদের মতবাদের পুস্তক-পুস্তিকা ও পত্র-পত্রিকা।

কিন্তু 'রমা-রাণী দুই বোন পরীর মতন'-এর যুগ থেকে 'আকাশের খাপছাড়া ক্রন্দন' পার হয়ে কবি সুকান্তর ছাড়পত্রের পর্যায়ে উন্নয়ন ঘটেছে আমার প্রভাবের বাইরে আমার অজ্ঞাতে, যদিও নতুন কবিতা লিখে আমাকে দেখিয়ে আমার মতামত ও প্রায় সব সময়েই নিত।

এত কথা যে উপক্রমণিকা হিসেবে লিখলাম, তার কারণ সুকান্তর জীবনের শেষ ক'টা বছরে আমি মোটামুটি বন্ধুর চেয়েও অভিভাবক হিসেবেই ছিলাম। আমার প্রতি তার বন্ধুভাব চালান হয়ে গিয়েছিল আমার স্ত্রীর প্রতি। আমার কাকা অর্থাৎ সুকান্তর বাবাও পরিবারের বড় ছেলে হিসেবে, বিশেষ করে সুকান্ত সম্পর্কে আমাদের আকর্ষণের সুবাদে, আমার উপরই সুকান্তর অভিভাবকত্ব মোটামুটি চালান করে দিয়েই নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন।

আর এই অভিভাবকত্বের সুবাদে, বিশেষ করে সুকান্তর জীবনের শেষ তিন বছর আমি বেকার ছিলাম বলে, সুকান্তর সংগ্রামের দিনগুলি, তার রোগের দিনগুলি এবং যক্ষ্মা হাসপাতালের দিনগুলির আমিই প্রধান সাক্ষী এবং অনেক কিছুর একমাত্র সাক্ষী।

অনেক জটিলতা ও অনেক মুখচাওয়াচায়ির কথা চিন্তা করে সুকান্তর শেষ দিনের কথাগুলি আজও স্বরূপে প্রকাশ করা যায়নি এবং হয়নি। কিন্তু সত্যের খাতিরে তা কোনদিন না প্রকাশ করলে ভবিষ্যৎ আমাকে ক্ষমা করবে না, এই বোধ থেকেই আজ আমি সুকান্তর জীবনের শেষ দিনগুলির সত্য উদ্ঘাটনের প্রয়াস পাচ্ছি। বিশেষ করে আমার জীবনাবসানে তা জানার কোন উপায়ই আর থাকবে না।

সুকান্ত নামকরণ করেছিল আমার কিশোর বয়সে লোকান্তরিতা সহোদরা রানী। কথাসাহিত্যিক মণীন্দ্রলাল বসু তখন আমাদের প্রিয় লেখক, তাঁর গল্প 'সুকান্ত'র অনুসরণেই এই নামকরণ হয়েছিল। কিন্তু ভাগ্যের কি নিদারুণ পরিহাস। মণি বোসের সুকান্তর মতই আমাদের সুকান্তও যক্ষ্মারোগেই মারা গেল!

আজ যক্ষ্মারোগ হয়ও কম, সেরেও যায়। সুকান্তর সময়ে ফুসফুসের যক্ষ্মার চিকিৎসা সবে বেরিয়েছে, কিন্তু পেটের যক্ষ্মা তখনও চিকিৎসার বাইরে। দুর্ভাগ্যক্রমে সুকান্তকে যক্ষ্মাবীজাণু একধারে বুকে ও পেটে আক্রমণ করেছিল।

সুকান্তর যক্ষ্মা প্রসঙ্গে দু'টি প্রশ্ন স্বভাবতই আসে। রোগ কেন হল? এবং চিকিৎসায় সারলো না কেন? হাসপাতালে ভর্তির মাস দেড়েকের মধ্যে সুকান্তর মৃত্যু হয়েছে শুনে তখনকার বিখ্যাত চিকিৎসক ৺তাপস বোস, যিনি বাড়িতে ওর চিকিৎসা করতেন, আর্তনাদ করে উঠলেন—'অ্যাঁ, এরি মধ্যে? বাঁচবে না জানতাম, পেটের টি. বি. তো? কিন্তু তাতে এত শীগ্‌গির তো মরার কথা নয়।' যে অবস্থায় ও হাসপাতালের যে সব অব্যবস্থায় সুকান্তর মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়েছিল, ওর মৃত্যুর পর আমার কাছ থেকে তা শুনে কবি অমিয় চক্রবর্তী বলেছিলেন, আপনি সাক্ষ্য সংগ্রহ করুন। আমি নিজে হাসপাতালের ট্রাস্টীদের কাছে লিখবো। সুকান্ত আর ফিরবে না ঠিকই, কিন্তু ভবিষ্যতে অনুরূপ মৃত্যু রোধের চেষ্টা অবশ্য করণীয়,

আমি সাক্ষ্য সংগ্রহে হাসপাতালে গিয়ে ওই ওয়ার্ডের সুকান্ত সম্পর্কে সহানুভূতিসম্পন্ন রোগীদের খোঁজ করি। ততদিনে কিছু কিছু রোগী সুকান্তর অনুগমন করেছে, আর বাকীরা সেরে বাড়ী চলে গেছে। আমার সাক্ষ্য সংগ্রহ হল না, আর অমিয় চক্রবর্তী মহাশয়ের সাধু সংকল্পও মনেই লীন হল।

চিকিৎসায় কেন সারলো না বা এত শীগ্‌গির কেন শেষ হয়ে গেল, তার জবাব যে অচিকিৎসা, অথবা তখনকার যক্ষ্মা চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ শুশ্রূষার বদলে চূড়ান্ত অযত্ন—সেকথা পরে আলোচনা করবো। তার আগের প্রসঙ্গ, সুকান্তর যক্ষ্মা ধরলো কেন ?

কিশোর মন তখন গৃহপলাতক। বাইরে সে পেয়ে গেছে কমিউনিজমের মত প্রবল আকর্ষণ। কে তাকে ধরে রাখবে, কে রাখবে তাকে আগলিয়ে! সুকান্তর মনে তখন সেই তার আহ্বান ধ্বনিত হচ্ছে—'যার লাগি রাত্রি অন্ধকারে চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে, ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে অন্তর প্রদীপখানি', ওর মনে তখন প্রবল আবেগ হাতুড়ি মারছে—'বলো মিথ্যা আপনার সুখ, মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থমগ্ন যেজন বিমুখ বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে। মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা। মৃত্যুরে না করি শঙ্কা।' নাৎসী আক্রমণ প্রতিহত করে রুশ কমিউনিজমের আদর্শ অত্যাচারিত নিপীড়িত সর্বহারাদের নিজস্ব সমাজ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কল্পনায় উদ্ব দ্ধ করেছে। সেদিনকার মহাবিশ্ব-জীবনের তরঙ্গ সেই আশাও কল্পনা।

কাক-ডাকা ভোরে সুকান্ত বেরিয়ে যায় পার্টির কাজে, কি যে কাজ আমি তা আজও জানি না, আর এত ব্যস্ততা যে বাড়ি এসে খেয়ে যাবার সময়টুকুও নেই। আমাদের শ্যামপুকুরের বাড়িতে তখন ঘরোয়া আড্ডা সবই বসতো দোতলায়। একদিন বিকেলে সেই আড্ডায় শোনা গেল সুকান্তর কণ্ঠস্বর, নিচের তলা থেকে একবার ডাকলো, মেজবৌদি!

মেজবৌদি জবাবে বললেন, ওপরে চলে এস।

তারপর সব নীরব। মেজবৌদি আবার ডেকে সাড়া না পেয়ে নিচে নেমে এলেন। কোথায় সুকান্ত? শুধু দেওয়ালের গায় পেন্সিলে লেখা দু'লাইন কবিতা সাক্ষ্য দিচ্ছে সুকান্ত এসেছিল :

হে রাজকন্যে তোমার জন্যে এ জনারণ্যে নেইকো ঠাঁই
জানাই তাই।

ক'দিন বাদে সুকান্ত ফের আসতে বৌদি প্রশ্ন করলেন সেদিনের প্রসঙ্গে। সুকান্ত প্রসন্নভাবে জবাব দিল : সাজ্যাতিক খিদে পেয়েছিল তাই এসেছিলাম, কিন্তু তোমাদের আড্ডায় পাছে আটকে পড়ি, তাই খাবার ঘর থেকে পেট ভরে জল খেয়ে পালালাম! ভীষণ কাজ ছিল কিনা, সারাদিন অনেক কাজ করতে হয়েছে।

আরেকটি ঘটনা। চট্টগ্রাম থেকে ছাত্র সম্মেলন সেরে সবে ফিরলো সুকান্ত। জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন হল? ও বললো—আসবার পথে দু'দিন খিদের ভীষণ কষ্ট পেয়েছি। কিছুই খাইনি, একটাও তো পয়সা ছিল না। তারপর একটু থেমে বললো—ভালো কথা, 'স্বাধীনতা' ফাণ্ডে তুমি যে দশটাকা চাঁদা দিয়েছিলে, টাকাটা ওদের ওখানে দিয়ে অসবার সময় পাইনি।

টাকা কোথায়?—আমি প্রশ্ন করলাম।

আমার কাছেই আছে।—জবাব করলো সুকান্ত।

হতভাগা ছেলে! বললি একটা পয়সা ছিল না বলে দু'দিন উপোস করেছিস, ওই টাকা ভেঙে খেলিনা কেন?

বেশ রেগেই বললাম আমি।

ধীরে শান্ত সুরে জবাব করলো সুকান্ত : ও টাকা তুমি পার্টিকে দিয়েছ, সে টাকা আমি খেয়ে খরচ করবো?

আমি ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, যতক্ষণ টাকা পার্টিফাণ্ডে জমা না দেওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ তা আমার টাকা, সে টাকা ভেঙে আমার ক্ষুধার্ত ভাই যদি খায়, তার মধ্যে অন্যায় নেই।

কিন্তু সুকান্ত মানবে না কিছুতেই, তার এক কথা : আমার পার্টি-ডিসিপ্লিন আমাকে অন্য শিক্ষা দিয়েছে।

অনেক গল্পকথা রটানো হয়েছে। সুকান্ত বস্তিতে থাকতো, দারিদ্র্যবশত খেতে পায়নি। সব নির্জলা মিথ্যা। ওর বসন্ত কেন, একটা দিনের একটি ঘণ্টাও খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায় কাটেনি। খাদ্যের সারিতে সরকারী খয়রাতির চাল বিলোতে ও বরং সারাদিন স্বেচ্ছাসেবকগিরি করেছে। স্বেচ্ছাসেবীর প্রাপ্য যে এক সের চাল তা পর্যন্ত ও নেয়নি। তখন চালের খাঁই ঘরে ঘরে। ওর বাবা বলেছেন, সেই এক সের চালটা আনলে তো পারতিস।

সুকান্ত বলেছে, আমাদের ঘরে তো চাল আছে, ও চাল, যাদের এক দানাও নেই, তাদের জন্যে।

সুকান্ত প্রাণ দিয়ে খেটেছে। সেকি আদর্শের জন্য না পার্টির জন্য ? পার্টির জন্য হলে নেতৃস্থানীয়রা, আর আদর্শের জন্য হলে সেই আদর্শের অগ্রজ ধারকেরা যদি একটু ভাবতেন, দেখতেন, চেষ্টা করতেন, জোর করে কিছু খাওয়াতেন বা ধমকে বাড়ি পাঠাতেন খেয়ে আসবার জন্য, তাহলে হয়তো সুকান্তর ক্ষয়রোগ নাও হতে পারতো।

সুকান্তের মৃত্যুর ক'দিন বাদেই ৪৬নং ধর্মতলা স্ট্রীটের সব উঁচু তলার হলে অনুষ্ঠিত শোকসভায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন :

সুকান্তর বেলায় আমরা যে ত্রুটি, যে ভুল করেছি তা যেন আর কখনো না করি, এই হলো আমাদের সুকান্তর মৃত্যুর শিক্ষা। সুকান্ত চুটিয়ে কাজ করেছে, আমরা খুশী হয়ে বাহবা দিয়েছি। কিন্তু ওর মুখের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেই বুঝতে পারতাম, সুকান্তর সারাদিন খাওয়া হয়নি। ও যে সারাদিন এত কাজ করেছে, কিছু খেয়েছে তো—এ প্রশ্নটুকুও আমাদের মনে উঁকি মারেনি। আমাদের এই দোষের জন্য ওকে আমরা হারালাম।

[স্মৃতি থেকে উদ্ধার করেছি। বক্তব্য এই, ভাষা হয়তো এক নয়]

সুকান্ত ফুলের মালাগাছি বিকোতে এসেছিল। সবাই পরখ করেছে, স্নেহ করবে কার এমন দায় পড়েছে।

দু'দুবার ম্যাট্রিক ফেল করলো সুকান্ত।

দ্বিতীয়বার বললো— অঙ্কে দু-চার নম্বর যোগ হলেই হয়ে যাবে।

গেলাম হেড এগ্‌জামিনার সতীশ ঘোষ মহাশয়ের কাছে আবেদন নিয়ে, একটা মনীষাসম্পন্ন ছেলে অঙ্ক পারে না বলে আণ্ডার-ম্যাট্রিক থেকে যাবে, অথচ ম্যাট্রিক পাশ করলে বি. এ, এম. এ.-তে নিজস্ব বিষয়ে ফার্ষ্টও হতে পারে।

স্বভাব গাম্ভীর্যে সতীশবাবু ভিতরে গিয়ে দেখে এসে জানালেন— অঙ্কে চার পেয়েছে। কত বাড়াতে হবে বল ?

মাথা হেঁট করে চলে এলাম।

সুকান্ত তখন স্বাধীনতার পাতায় 'কিশোর সভা' পরিচালনা শুরু করেছে। ওর বৌদিকে এসে সোল্লাসে জানালো, পার্টি-ওয়ার্কার হিসেবে মাসে ত্রিশ টাকা করে দেবে বলেছে। সেই ত্রিশ টাকা দিয়ে কত কি করবার কল্পনার ফানুস ওড়াচ্ছে বাস্তববাদী সুকান্ত : কাজ করার মধ্যে খাওয়া এবং প্রয়োজনবোধে ট্রামে বাসে চড়ে সময় ও পরিশ্রম বাঁচানোর খরচও সেই পরিকল্পনার মধ্যে।

মাস শেষ হল। সুকান্ত মাত্র পাঁচটি টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরলো। হতাশায় মুখ কালো করে বৌদিকে বললো,······দা বললেন তুমি তো ঘরের ছেলে, তোমাকে আর কি পয়সা দেবো। তাছাড়া জানো তো পার্টির অবস্থা। এই পাঁচ টাকা ট্রাম ভাড়া বরং নাও।

পাঁচ টাকা অন্তত সুকান্তকে কাজের মধ্যে কিছু খাবার উপায় করে দিয়েছিল। পরের মাসে সেই নগদ টাকা ক'টাও জুটলো না। পেল পাঁচ টাকার ট্রামের কুপন। তা ভাঙিয়ে খাবার মেলে না। অতএব হাঁটা একটু-আধটু বাঁচলেও উপবাস কায়েম হয়ে গেল। এই প্রসঙ্গে সুকান্তর হতাশা, বিরক্ত ও ক্রোধ অরুণাচল বসুকে লেখা এক পত্রে ফেটে পড়েছে [সুকান্ত সমগ্র, ৩৪৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য]।

উপবাসক্লিষ্ট দেহে, পূর্ব কলকাতায় মহামারীরূপে প্রকাশিত ম্যালেরিয়ার বীজাণু অতি সহজে প্রবেশলাভ করেছিল। আর মারাত্মক ম্যালেরিয়া আক্রমণ (যথা সময়ে ইনজেকশান না পড়লে বাঁচানো যেত না, বলেছিলেন ডাক্তার) থেকে সেরে উঠতেই এবং শরীর না সারতেই আবার কাজ, হাঁটা এবং উপবাস শুরু।

'ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও ক'দিন ধরে খুব ঘোরাফেরা করেছি এখানে ওখানে, যার ফলে কাল রাত্তিরে অনেকদিন পরে জ্বর এল।' এই স্বীকারোক্তি সুকান্ত লিখে জানিয়েছিল বন্ধু ও মাসতুতো ভাই ভূপেনকে [সুকান্ত সমগ্র, ৩৫৫ পৃঃ]।

পার্টি অবস্থা দেখে ওকে রেড এইড কিওর হোমে রেখেছিল ১০নং রওডন স্ট্রীটের সেই হাসপাতালে। পরিবেশ ছিল মনোরম, পার্টি-হিরোদের সঙ্গে সংযোগ তাকে আত্মতৃপ্তি দিল, কিন্তু সে হাসপাতালের কোমল শয্যা ছিল ওষুধ-পথ্যহীন। [সুকান্ত সমগ্র, ৩৪৫ পৃঃ]।

রেড এইড কিওর হোম থেকে ছাড়া পেয়ে সুকান্ত গেল নারিকেল-ডাঙায় ওর বাবার কাছে। সেখানে পার্টির ডাক্তার আসবে পরীক্ষা করতে ও ইনজেকশান দিতে। রোজই গিয়ে শুনি, ডাক্তার আসেনি। ডাক্তারের না আসা এবং অচিকিৎসা যখন অসহ্যরকম ক্রনিক হয়ে গেল, তখন সুকান্তকে নিয়ে আসা হল শ্যামপুকুরে।

চিকিৎসার ভার নিলেন ডাঃ তাপস বোস, বিশেষজ্ঞ কন্‌সাল্টাণ্ট ডাঃ রাম অধিকারী। অর্থ ব্যবস্থা হল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াসে। আমি তখন বেকার, চূড়ান্ত অর্থকৃচ্ছ্রতায় দিন কাটছে। এই সময় সুভাষ মুখোপাধ্যায় সুকান্তর চিকিৎসার জন্য একটি ফাণ্ড করেন, বিশেষ রাজনৈতিক দলের কর্মী সুকান্তর জন্য ফাণ্ড নয়, কবি সুকান্তর জন্য। তাই মতবাদ নির্বিশেষে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, যামিনী রায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, সন্তোষ সেনগুপ্ত এবং আরো অনেকে সাগ্রহে সহযোগিতা করেছেন এমন কথা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাছেই জেনেছিলাম।

বাড়িতে চিকিৎসা চললেও স্যানাটোরিয়াম ছাড়া ঠিকমত চিকিৎসা সম্ভব নয়। বৌদির সেবা শুশ্রূষা ও পরিজনের সান্নিধ্য ছেড়ে হাসপাতালে যাওয়ার নামে সুকান্তর কিন্তু চোখ ছল ছল করে ওঠে। তবু স্যানাটোরিয়াম যাওয়া চাই-ই।

ডাঃ রাম অধিকারী প্রস্তাব করলেন এবং নিজে চেষ্টা করতে লাগলেন—মাদার স্যানাটোরিয়াম, মিশনারীদের প্রতিষ্ঠান, যেখানে কিছুটা সেবা-প্রবৃত্তি আছে, যত্ন হবে!

প্রসঙ্গ উঠতেই সুকান্ত ঝর ঝর করে কেঁদেছিল। বলেছিল, সেই আত্মীয়-বন্ধু বর্জিত দূর দেশে [মাদার আজমীরের উপকণ্ঠে] নির্বাসন দিওনা বৌদি। তোমরা কেউ কোনদিন যেতে পারবে না। বেঁচে যদি ফিরি, তবু কথা। কিন্তু নির্বান্ধব-মৃত্যু মরতে পাঠিও না আমায়। মাদারের প্রস্তাব তখনকার মত ছাড়তে হল যখন জানা গেল সীট পেতে দু'তিন মাস লাগবে। অতএব সাময়িক ব্যবস্থা যাদবপুর। আর যাই হোক, সবাই যাতায়াত করতে পারবে তো।

বোধ হয় ১লা কি ২রা এপ্রিল [১৯৪৭] সুকান্তকে যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে ভর্তি করা হল। ছল ছল চোখে বিদায় নিয়ে গেল সুকান্ত। ও হাসপাতালে চলে যেতে ওর বিছানা ওঠাতে গিয়ে ওর বৌদি বালিসের তলায় এক টুকরো কাগজ কুড়িয়ে পেলেন। সুকান্তর হাতের লেখা, সন, তারিখ, সময়, ক্ষণ, নামকরণ কিছুই নেই, শুধু ছোট দৈর্ঘ্যের আটটি পংক্তি, অধুনা যা অনেকের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়, যার শেষ লাইন—পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

যাদবপুরে সবার যাতায়াতের আশায় ছাই পড়লো। ৪৬-এর দাঙ্গার পরিশিষ্ট হিসেবে, যখন-তখন লড়াই বাধছে। সবচেয়ে বেশি পূর্ব কলকাতায়। ফলে একটানা ৭২ ঘণ্টা পর্যন্ত কার্ফিউ সার্কুলার রোডের সমগ্র পূর্বাঞ্চলে।

শিয়ালদা গিয়ে দেখি স্টেশন কার্ফিউ এলাকাভুক্ত, অতএব রেল বন্ধ। বাসে করে কোনমতে যদিবা যাদবপুরে পৌঁছতে পারলাম,

ফেরার পথে কার্ফিউ নামবে, অতএব চোখের দেখা দেখে ও দেখা দিয়েই পালানো। এরই মধ্যে অনেক হুজ্জোত করে ওর বৌদি যেদিন গেলেন, আবেগে কোন কথা বলতে পারলো না সুকান্ত। জ্যাঠাইমা (আমার মা) ও মাসীমাকে (আমার মামীমা) যেদিন নিয়ে গেলাম, সেদিন ওকে এ. পি. দিয়েছে, কথা বলা বন্ধ।

১৪ই এপ্রিল আমাকে জানালো, গতকাল জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস স্মরণে একটি কবিতা লিখেছে। পড়েও শোনালো আমাকে, বললাম, সুভাষবাবু এলে তাঁকে দিয়ে দিস ছাপার জন্য। পরে আর সে কবিতা সম্পর্কে তল্লাস করার মানসিক অবকাশ পাইনি। ওর মৃত্যুর পর সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করায় তিনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। সুকান্তর সেই সর্বশেষ কবিকৃতীটি কোথায় হারিয়ে গেল, আজও তার হদিশ পাওয়া যায়নি।

প্রসঙ্গত ওর আরো দু'টি হারিয়ে যাওয়া কবিতার কথা মনে পড়ছে। ১৯৪৩ সালে আমাদের পরিবারের রাঁচি বেড়াতে যাওয়া উপলক্ষে সুকান্তও গিয়েছিল সবার সঙ্গে জোনা-ফল্‌স্‌ [বর্তমান নাম গৌতম-ধারা] দেখতে। সদ্য বৃষ্টি হয়ে যাওয়া সেই উন্মত্ত জোনা দেখে কবিতা লিখেছিল সুকান্ত। অরুণকে লেখা পত্রে [সুকান্ত সমগ্র, ২৯২ পৃঃ] তার উল্লেখ আছে। সেই রাতেই আমাকে সেখানকার রেষ্ট হাউসের স্তিমিত আলোয় পড়ে শুনিয়েছিল কবিতাটি। ব্যাস, ওই পর্যন্ত। আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি সে কবিতার।

১৯৪৪ সালে আমাদের পরিবারের সঙ্গে সুকান্তও কাশী বেড়াতে যায়, সেখানে গিয়েই ও 'রেল ইঞ্জিন' কবিতা রচনা করে আমাকে পড়ে শোনায়। প্রতীকধর্মী কবিতা রচনার সেই প্রথম প্রয়াসও হারিয়ে গেছে!

পেটের টি. বি.-র রোগী। কিছুই হজম হয় না। কিন্তু খাদ্য বরাদ্দ 'তাকিয়াভোগ' চাল। হাসপাতাল সুনারিণ্টেণ্ডেণ্ট জানালেন, কোন বিশেষ রোগীর জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা সম্ভব নয়। অগত্যা

তাঁর অনুমত্যানুসারেই বাড়ি থেকে সরু চাল নিয়ে গিয়ে হাসপাতালের রাঁধুনীর সঙ্গে নগদ টাকায় বন্দোবস্ত করা গেল।

ওয়ার্ডটি লম্বা ব্লক। একহারা ছোট ছোট পাশাপাশি ঘর। দু'পাশে বারান্দা।

ব্লকের পশ্চিমপ্রান্তে ওয়ার্ড অ্যাসিষ্ট্যান্ট বা পুরুষ নার্সের ঘর। বিপরীত দিকে পূর্বপ্রান্তে সুকান্তর ঘর।

সুকান্তর ঘরের দক্ষিণ বারান্দায় হাত মুখ ধোয়ার বেসিন ও জলের কল। ঘরের মধ্যেই কমোড। একটি ঠুন্ ঠুন্ ঘণ্টা বাজাবে রোগী, আর তা শুনে নার্স আসবে—এই ব্যবস্থা।

ঘণ্টা শোনা যেত কিনা জানি না, নার্স প্রায়ই সেই ডাকে সাড়া দিত না। রোগীকে নিজেই হাত বাড়িয়ে খাবারটা, ওষুধটা নিয়ে নিত হত, রোগা-পেটে প্রবল বেগের তাড়া সামলিয়ে ঝট্‌পট কমোডে বসাতে হতো।

অগত্যা একদিন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে জানালাম, স্পেশাল নার্স ওর জন্য দেওয়া যায় কিনা।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বললেন, দিতে পারেন, তবে সে নার্স আপনারা কোন আপনজনকে নিয়ে আসুন। যক্ষ্মা হাসপাতালে যেখানে চোখের সামনে নিত্য রোগী মরছে, সেখানে রোগীর প্রতি দরদ বোধ করবে এখানকার নার্স? তা কি হয়! মানুষ মরা দেখতে দেখতে মৃত্যু বা মৃত্যু-যন্ত্রণা ওদের হৃদয় স্পর্শও করে না।

তখনকার মত স্পেশাল নার্স রাখার বিলাস ত্যাগ করতে হল, যদিচ চিকিৎসাফাণ্ড থেকে খরচের টাকা অনুমোদন করেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

১১ই মে (২৮এ বৈশাখ) যথারীতি গিয়েছি সুকান্তকে দেখতে। নির্জীব শুয়ে আছে। মুখ-চোখ ভীষণ বিপর্যস্ত। সব কথা ও বলতে পারলো না। ওর কাছ থেকে ও অন্য ঘরের কথঞ্চিত সুস্থ রোগীদের কাছ থেকে বিবরণ পেলাম।

পেটে প্রবল বেগ অনুভূত হতেই সুকান্ত ঘণ্টা বাজিয়েছিল। নিয়মমতই কেউ আসেনি। কমোডে বসবার জন্য একটু তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠতেই হুমড়ি খেয়ে মেঝেয় পড়ে গেছে। নিজে উঠতে পারেনি। ঘণ্টা-দুয়েক ওইভাবে পড়ে থাকার পরে যখন অন্য রোগীরা বেসিনে মুখ ধুতে এসেছে, দেখতে পেয়ে তারা ধরে তুলে বিছনায় শুইয়ে দিয়েছে সুকান্তকে। বেগ সামলাতে না পেরে যে ময়লার মধ্যেও ওকে মেঝেতে পড়ে থাকতে হয়েছিল,তাও জমাদার ডেকে সাফ করিয়ে এবং ওকে ধুইয়ে মুছিয়ে দিইয়েছে।

সব শুনে আমি সুপারিণ্টেণ্ডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। প্রস্তাব করলাম, স্পেশাল কটেজ দিন, পরিকল্পনা—আমার মা এসে নিজে সুকান্তকে নিয়ে থাকবেন।

সুকান্তকে বললাম, সুভাষবাবু এলে (তিনি অধিকাংশ দিন সকালের দিকে আসতেন এবং দু-একদিন অন্তরই আসতেন) তাঁকে নতুন বন্দোবস্তর কথা জানাতে। খরচপত্র কিভাবে চলবে আমি তাঁর সঙ্গে আলোচনা করবো।

জমাদারকে ডেকে তার হাতে একটি টাকা গুঁজে দিলাম। সযত্নে ওকে সাফ্-সুত্রো করেছে বলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। এবং প্রভূত আবেগ দিয়ে মানবতার নামে আবেদন করলাম, সে যেন সুকান্তর ঘরের দরজার ঠিক বাইরেই বারান্দায় ঘুমোয়। জমাদার রাজীও হল। খুব মন খারাপ করে বাড়ি ফিরে এলাম।

পরদিন সকাল ন'টা নাগাদ প্রতিবেশী কাটু বোস (প্রখ্যাত কমিউনিস্ট কর্মী) টেলিফোনে প্রাপ্ত সুকান্তর মৃত্যু সংবাদ নিয়ে এলেন আমার বাড়িতে। তার সঙ্গে গাড়ি ছিল। পথে ডেকার্স লেন (তখন স্বাধীনতা পত্রিকা ও কমিউনিস্ট পার্টির অফিস) থেকে মুজাফ্ফর আহ্মেদকেও সঙ্গে নেওয়া হল।

হাসপাতালের শয্যায় সুকান্তর মৃতদেহ। পাশে দাঁড়িয়ে আছে সেই জমাদার। বললে, রাতে খাবে বলে আমাকে দিয়ে দই

আনিয়েছিল বাবু।—চেয়ে দেখি মীট-সেফে শালপাতা ঢাকা ছোট এক ভাঁড় দই, যেমনকে তেমন পড়ে আছে।

কখন কি অবস্থায়, কিভাবে সুকান্তর প্রাণ বেরিয়ে গেল তা কেউ জানলো না। আর মৃত্যুর মুহূর্তে বাইরের দিকে চেয়ে নিশুতিরাত্রে সুকান্ত কি ভেবেছিল, তা কবি-কল্পনাই রয়ে গেল।

কমিউনিস্টরা একজন নিষ্ঠাবান সহকর্মী হারালেন। রসিক সমাজ একজন অসাধারণ কবিপ্রতিভার অকাল তিরোধানে ব্যথিত ও আশাহত হলেন। আমরা প্রতিভাধর ভাই হারালাম। সুকান্তর বিপত্নীক পিতা মাতৃহারা পুত্র হারালেন। আমার পুত্রশোকাতুরা মা দ্বিতীয়বার পুত্রশোকে অধীর হলেন। সুকান্তর বৌদি নির্বাক হয়ে গেলেন। যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে একটি বেড খালি হল, একজন অপেক্ষমান যক্ষ্মারোগীর মৃত্যুপথযাত্রাশিবিকার জন্য সাগ্রহ-প্রতীক্ষা শেষ হল।

যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী—
আর সুকান্ত—শূন্য নদীর তীরে রহিল পড়ি।

তাকে যেমন পেয়েছিলাম

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

চৈত্র তখন শেষ হয়ে এসেছে।

একদিন দুপুরের দিকে একখানি বইয়ের পাণ্ডুলিপি শেষ করছি, বাইরে একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর আমায় ডাকলে।

বেরিয়ে গিয়ে দেখি আমার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত গিরীন চক্রবর্তী আর তাঁর সঙ্গে এক অপরিচিত কিশোর।

ছেলেটি কালো, কিন্তু তার মুখখানি কোমল, মাথায় লম্বা চুল, উস্কোখুস্কো। - যেন সে বহুদূর থেকে ঝড় ঠেলে আসছে, চোখ দুটি উজ্জ্বল, গায়ে শাদা শার্ট, পায়ে স্যাণ্ডেল।

বন্ধু বললেন, 'এর নাম সুকান্ত ভট্টাচার্য। আপনাকে কি বলবার জন্যে এসেছে।'

নামটি মিষ্টি। একবার 'কিশোর সভা'-র নিমন্ত্রণ পত্রে নামটি লেখা দেখি। সেদিন থেকে মনে করে রেখেছিলাম। তারপর 'স্বাধীনতা'-য় পড়েছিলাম তার একটি সুন্দর কবিতা।

বাড়ির সামনে গলিটার একধারে একটু রোয়াক।

ছায়া পড়েছিলো।

তাকে বললাম, 'বোসো।'

সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সহাস্যে নিঃসংকোচে আমার পাশটিতে বসে পড়লো।

বললাম, 'কি বলতে চাও?'

সে বললে, 'কিশোর সভার নববর্ষ-উৎসবের উদ্বোধন করতে হবে আপনাকে।'

কথা ক'টি সে এমনভাবে বললে, যেন আমার ওপর তার দাবী আছে, যেন আমি তার আপনজন!

বললাম, 'বেশ,- এ তো আমার ভাগ্য যে তোমরা আমায় মনে করে ডাকছো, নিশ্চয় যাবো।'

সে বললে, 'আমি আপনাকে নিয়ে যাবো, তৈরী থাকবেন।'

তারপর আরও দু'চারটি কথার পর সে চলে গেলো।

বুঝলাম, ছেলেটি কেবল সু-কবিই নয়, সু-কর্মীও। তার মধ্যে দেখলাম কেমন একটা তেজ ও দৃঢ়তা যা তার মুখের কালো রঙ ঢেকে রাখতে পারছে না।

সেই থেকে তার মুখখানিও বিশেষ করে মনে রইলো।

তারপর নববর্ষের প্রথম দিনটি এলো। সভায় যাবার নির্দিষ্ট সময়ে বাইরে থেকে এলো সসম্ভ্রম ডাক। বেরিয়ে দেখি সুকান্ত। সেই মূর্তি, সেই বেশ, মুখে হাসি।

বললে, 'তৈরী হয়েছেন?'

—'হ্যাঁ, চলো।'

সে হাতছানি দিয়ে গলির মোড়ে কাকে যেন ডাকলে।

একটু পরেই টং-টং শব্দ করতে করতে একখানি রিক্সা এসে আমার বাড়ীর সামনে দাঁড়ালো।

প্রথমে বুঝতে পারলাম না, কার রিক্সা। সে বললে, 'উঠুন।'

বিস্মিত হয়ে বললাম, 'রিক্সা কেন? কি দরকার? হেঁটেই যাবো।'

সুকান্ত বললে, 'আমার শরীর ভালো নয়!'

তখন আর আপত্তির কোনো কারণই খুঁজে পেলাম না।

রিক্সা চড়ে যেতে যেতে সে আমাকে 'কিশোর সভার' ইতিহাস ও উদ্দেশ্য বলতে লাগলো।

বললাম, 'আমি যা বলবো তা বেশি নয়। দু-একটি স্লিপে লিখেছি। পড়ে ছাখো, ঠিক হবে কি-না।'

সে সাগ্রহে লেখাটি হাতে নিয়ে খানিকদূর পড়েই সোৎসাহে বলে উঠলো, 'আপনাকে ধরে ফেলেছি। আপনি আর আমাদের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে পারবেন না।'

কিন্তু আজ সে-ই নেই।

তারপর আরও কয়েকটি ঘটনায় ও উপলক্ষে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে। তাকে 'কিশোর সভা'য়ও দেখেছি। তার কথা শুনতে সারা সভা কি রকম আকুল হয়ে উঠেছে!

আরও একদিনের কথা না বলে থাকতে পারছি না।

সেদিন সন্ধ্যায় জনৈক বন্ধু-গৃহে সে আমাকে পড়ে শুনিয়েছিলো তার 'রানার' কবিতাটি। সে সুর এখনও আমার মনে বাজে। শুন্‌তে শুন্‌তে মনে হচ্ছিলো কবি সুকান্ত রানারের দুঃখ ও ডাকের বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে তার সঙ্গে চলেছে অন্ধকার ঝড়ের রাতে প্রান্তর-নদী-অরণ্যপথে—

তার সেই কবিতাটি আমাকে একটি রচনায় অনুপ্রেরণা দিয়েছে। 'স্বাধীনতা'র 'কিশোর সভা' হঠাৎ ভেঙে গেছে, তার সুন্দর কবিতাও আর পড়তে পাই না। তাই তাকে খুঁজেছি অনেক। শেষে যখন জানলাম তখন খেদ রাখবার ঠাঁই রইলো না।

তবে সে বলে গেছে, রেখে গেছে তার 'আগামী'তে এই ক'টি কথা:

অঙ্কুরিত বন্ধু যত মাথা তুলে আমারই আহ্বানে
জানি তারা মুখরিত হবে নব অরণ্যের গানে।
আগামী বসন্তে জেনো মিশে যাবো বৃহতের দলে
জয়ধ্বনি কিশলয়েঃ সম্বর্ধনা জানাবে সকলে।

হে কিশোর কবি! সার্থক হোক তোমার আশা ও আহ্বান আজ যারা 'অঙ্কুরিত বীজ' আছে তাদের জীবনে।

স্বাধীনতা। ১৮ই মে ১৯৪৭

আমাদের সুকান্ত

ধীরেন্দ্রলাল ধর

সুকান্ত মারা গেছে।

কথাটা সহসা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না।

বছর কুড়ি বয়সের একহারা ছেলেটি উজ্জ্বল চোখ দুটি তুলে যে ভবিষ্য-ভারতের স্বপ্ন দেখে—যে দেশে দারিদ্র্য নেই, শোষণ নেই, সে এতো শীঘ্র এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে, তা ভাবা যায় না।

জীবনের জনতার মাঝে এক একজন আসে যাদেরকে ভালো না বেসে পারা যায় না।

সুকান্ত ছিলো সেই দলের।

'স্বাধীনতা'-র আপিসে বসে যেদিন প্রথম পরিচয় হলো, সেদিন বিস্মিত হয়েছিলাম, এতো কম বয়সের একটি ছেলে একখানি দৈনিক কাগজের ছোটদের বিভাগের সম্পাদনা করছে! ছেলেটিকে ভালো করে জানার ইচ্ছা হলো, একদিন বাড়ীতে আসতে বললাম।

সুকান্ত বাড়ীতে এলো।

ছিটের সার্ট গায়, আধময়লা কাপড়-জামা, বেশের পারিপাট্য কিছু নেই। এমনভাবে ঘরের মধ্যে এসে বসলো যেন অনেকদিনের জানাশোনা।

সরলভাবে সে শুরু করলো তার কাগজের কথা, তার আদর্শের কথা।

সুকান্তর প্রাথমিক বিদ্যা ছিলো মাট্রিক পর্যন্ত। প্রথম আলাপেই সেকথা স্বীকার করতে তার বাধেনি।

যা সে বুঝতো না, তা নিয়ে মিছে বাগাড়ম্বর সে করতো না। নিজের দারিদ্র্যকে ঢাকবার মতো চালিয়াতি 'সে শেখেনি। এখনকার

কালে বাংলার এই ধাপ্পাবাজীর যুগে, এতো কম বয়সের এমন মানুষ দৈবাৎ দেখা যায়।

সুকান্তর সঙ্গে সেদিন প্রায় দু'ঘণ্টা কথা হলো। এই দেশে রাশিয়ার পায়োনিয়ার্সের মতো সে কিশোর বাহিনী তৈরী করবে। দারিদ্র্যকে সে ভেঙে ফেলবে, ছেলেদের শিক্ষা ও আনন্দের একটি সুখদায়ক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করবে।

তারপর সুকান্তর সঙ্গে আরো বারকয়েক দেখা হয়েছে, বলতো—বাড়ী যাবার পথে এদিক দিয়ে ফিরছিলাম।

সুকান্ত থাকতো নারকেলডাঙায়। মেছুয়াবাজার স্ট্রীট দিয়েই তার বাড়ী যাবার পথ।

শেষ দেখার কথাটা এখনো মনে আছে।

আমাকে একটি কবিতা পড়ে শোনালো। বেশ মিষ্টি লেখা। ভালো লাগলো। বললাম, এতো কম বয়সে এমন কবিতা লিখতে পারো, এ জামা-কাপড় তো তোমাকে মানায় না, এটা বাংলা দেশ। আদ্দির পাঞ্জাবী পরো, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল রাখো, চশমা নাও, সিগার ধরো—না হলে কবি বলে কেউ মানবে না।

সুকান্ত হেসে বললো, ছেলেরা আমার কবিতা পড়ে খুশি হলেই আমি খুশি, আমাকে নাই-বা চিনলো।

সান্ধ্য ভ্রমণে বেরুচ্ছিলাম, সুকান্তকে রাজাবাজার অবধি এগিয়ে দিলাম।

তখনও কলকাতায় দাঙ্গা বাধেনি।

পথে চলতে চলতে সে তার আদর্শের কথা পাড়লো—সাম্যবাদের কথা। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের মনের মাঝে নতুন চিন্তা আনতে হবে, যাতে তারাই একদিন এই ধনিকদের শোষণ থেকে আত্মরক্ষা করবে। খাওয়া-পরা-থাকা ও শিক্ষার দুঃখ থাকবে না।

সুকান্ত তার আদর্শে বিশ্বাস করতো।

বিশ্বাসই অর্থ ও সামর্থ্য সঞ্চয় করে। সেদিক থেকে 'স্বাধীনতা'র সম্পাদকমণ্ডলী একজন নিষ্ঠাবান কর্মী হারালেন।

বাংলার কিশোর পাঠক-পাঠিকারা হারালো একজন প্রতিভাবান কবি-বন্ধুকে।*

২

মানুষের ভাবনা এক জায়গায় থেমে থাকে না, কবির ভাবনাও তার কাব্যের প্রকাশে নব নব দিকের দৃষ্টি খুলে দেয় কালের গতির সঙ্গে। কোন কোন প্রতিভা সেই নতুন দিকের উৎস হয়, কাব্যের সেই যুগটা তখন সেইখানেই কেন্দ্রীভূত হয়। এই যুগে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই উৎস। তার ধারা কয়েকটা দশক সমভাবে বহে চলেছে। ইতিমধ্যে সেই উৎসের একটা ধারা নতুন মুখে চালিয়ে দিয়েছেন নজরুল, তারপর আরেক মোড় ফিরিয়েছে সুকান্ত। রবীন্দ্রনাথ যেখানে 'দুই বিঘা জমি'র পর 'প্রশ্ন' তুলেছেন দেবতার কাছে—'তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ'—সেখানেও রবীন্দ্রনাথ পদলালিত্যে মধুর। নজরুল 'সাম্যের গান' গেয়ে বজ্রকণ্ঠে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন—'আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন।' সুকান্ত আরো সহজ স্পষ্টতার নেমে এসেছে :

প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা।—
কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি।
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় ঃ
পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি !

—এই সুকান্তর রচনা বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে।

কৈশোরের সীমান্তে পৌঁছে মাত্র একুশ বছর বয়সে যে প্রতিভার উপর সমাপ্তির ছেদ পড়লো, তার রচনার ঝোঁক যে ছোটদের দিকেই

* প্রথম প্রকাশ : স্বাধীনতা, ১৮ই মে. ১৯৪৭। পরবর্তী অংশ নতুন সংযোজন।

বেশী থাকবে এ তো স্বাভাবিক। সুকান্তরও তাই লেখা আরম্ভ ছোটদের নিয়েই। তবে সে ছোটদের রচনা গতানুগতিক ভাবধারার মধ্যে হারিয়ে যায় না।

ঘরে আমার চাল বাড়ন্ত
তোমার কাছে তাই,
এলাম ছুটে, আমায় কিছু
চাল ধার দাও ভাই!

—এই যে ছড়া, এর মধ্যে রূপকথার রেশ নেই, আছে বাস্তব কাঠিন্য।

বলতে পারো বড়মানুষ মোটর কেন চড়বে?
গরীব কেন সেই মোটরের তলায় চাপা পড়বে?

এমন ধাঁধা ছোটদের কাছে সুকান্তর আগে আর তো কেউ উপস্থাপিত করেনি! ছোটদের কাছে কে কবে বলেছে—'বড়লোকের ঢাক তৈরী গরীব লোকের চামড়ায়।' রবীন্দ্রনাথ যে 'পুরাতন ভৃত্য'-র কেষ্টাকে দেখেছিলেন, সুকান্তর কাছে সে-ভৃত্য আর নেই, সুকান্তর চাকর হরি বলে 'আপনারই দেখাদেখি ব্ল্যাক-মার্কেট করি।' সুকান্তর জমিদার ধনপতি পাল হাসতে হাসতে বলে—

'বলা ভারি শক্ত,
সবচেয়ে ভাল খেতে গরীবের রক্ত।'

সুকান্ত চারপাশে যাদের দেখেছে ভাবের চশমা এঁটে দেখেনি। সে দেখেছে যা ঘটেছে:

কুঁড়েঘরের মা সারাদিন খাটে
কাজ করে সারা বেলা এ,
পরের বাড়ীতে ধোয়া মোছা কাজ—
বাকীটা পোষার সেলায়ে।

তবুও ভাঁড়ার শূন্যই থাকে,
থাকে বাড়ন্ত ঘরে চাল,
বাচ্ছা ছেলেরা উপবাস করে
এমনি করেই কাটে কাল।

ছোটদেরকেও নতুন চোখে দেখতে শেখায় সুকান্ত :

পুরুত শেখায়, ভগবানই জেনো প্রভু
(সুতরাং চুপ ; কথা বলবে না কভু)
সকলেরই প্রভু—ভাল আর খারাপের
তাঁরই ইচ্ছায় এ ; চুপ কর সব ফের।
শিক্ষক বলে, শোন সব এই দিকে,
চালাকি করো না, ভাল কথা যাও শিখে।...

তারপরেই সুকান্ত চোখের সামনে তুলে ধরে নতুন আদর্শের কথা —রাশিয়া।

সুকান্ত এই জন্য তার সমকালীন শিশুসাহিত্য স্রষ্টাদের থেকে ভিন্ন। এবং এই বিভেদটুকুর জন্যই একুশ বছরের জীবনের মধ্যেও সে রসিক-জনের স্বীকৃতিতে সার্থক। যদি শুধু শিশুসাহিত্যের ছোটদের মধ্যেই তার ভাবনা ফুরিয়ে যেত তা হলে এ স্বার্থকতা আসতো না, তার লেখা বয়স্কদেরও মনে রঙ ধরায়, অবশ্য যদি সে বয়স্কের মনে বাল্যজীবনের রসানুভূতির অবশেষ কিছু থাকে। কারণ ইংরাজ সমালোচকের মতে No book is really worth reading at the age of ten which is not equally worth reading at the age of fifty. আর আমাদের বয়স তো এবার ষাটের কোঠায় গিয়ে পড়ছে। আমাদের কাছে সুকান্তর লেখা ভাল লাগে কেন? অকাল-মৃত্যুর জন্য আমাদের দুর্বলতা, না অন্য কিছু—সে বিচার পাঠক-পাঠিকার রসবোধের উপর ছেড়ে দিলাম।

ছড়ার জগতেও সুকান্ত অনন্যসাধারণ। সংস্করণের পর সংস্করণ হচ্ছে তার 'মিঠে-কড়া' বইটির। বস্তুনিষ্ঠ, যুগনিষ্ঠ, জনতানিষ্ঠ এমন মজাদার বই শুধু ছোটদের নয়, বড়োদেরও প্রিয়। স্বচক্ষে দেখেছি, আদ্যোপান্ত বইখানি রুদ্ধনিশ্বাসে পড়ার পর বড়োরা সুকান্তর রচনা-ভঙ্গীকে তারিফ করেছেন। আর ছোটদের তো কথাই নেই। ছড়ার মধ্যেই সুকান্তর সঙ্গে তাদের হৃদয় বিনিময় হয়ে গিয়ে। পছন্দসই কয়েকটি স্তবক তারা স্বচ্ছন্দে আবৃত্তিও করে দিতে পারে।

পৃথিবী ছেড়ে দূর নীহারিকার লোকে কবেই না সুকান্ত চলে গিয়েছে। কিন্তু যে-যুগ নিয়ে সে ছড়া লিখেছে, সে-যুগ এখনো আছে। হয়ত এদেশে ইংরেজ শাসক এখন নেই, কিন্তু বন্দুকের গুলির সঙ্গে ছেলেদের রক্ত রাঙানো খেলা এখনো আছে। আছে ভেজাল, আছে চোরাকারবার। তাই সুকান্তর ছড়া পড়লে রূপকল্প, শব্দচিত্র, কিছুই বুঝতে ভুল হয় না। কালধর্মের ট্রাডিশনের এমন একটা রূপকে সে ছড়ায় ধরে রেখেছে, যা সত্যনিষ্ঠ এবং ইতিহাসনিষ্ঠ। মানুষের দুঃসহতম যন্ত্রণার বিষ-রসে এই ছড়াগুলি নীলকণ্ঠ। বলা চলে, সুকান্তও স্রষ্টা হিসেবে নীলকণ্ঠ। অথচ, এই ছড়াগুলির মধ্যেই জাতির জন্য সে অমৃত পরিবেশন করে গিয়েছে। সীমাবদ্ধ বাংলা ছড়ার জগতে সে এনেছে বিপ্লব।

কাব্যের জগতে সুকান্ত এক মসিধারদীপ্ত চমক। সল্লায়ুর মধ্যে প্রতিভার যে-উজ্জ্বল নিদর্শন সে রেখে গিয়েছে তার তুলনা বিশ শতকের গোটা ভারতবর্ষে আছে কিনা, আমার জানা নেই। মানুষের যুগযুগান্তের লাঞ্ছনা তার কবিতায় সংবেদনশীল ভাষা পেয়েছে। লোকায়ত যন্ত্রণাকে কবিতার প্রাণস্পর্শী ব্যঞ্জনায় সে ব্যক্ত করেছে।

মানুষের সত্যকারের কবি সে। কবিতা তার প্রাণবৃক্ষ। সে বৃক্ষের একটি ডাল হল তার ছড়া।

কবিতার পৃথিবীতে সুকান্ত নিজেই একটা দিক-চিহ্ন, একটা যুগ। স্বচ্ছন্দ সৃষ্টির দিগন্ত দেখবার জন্য তার হাতে ছিল নাবিকের কম্পাস বা দিক্-নির্ণয়ের যন্ত্র। কবিতার সামাজিক ফলকে বহু কবির সামনেই তুলে ধরতে পেরেছিল আমার ধারণা। তার নিরভিমান, জীবনমুখী কবিতাগুলি বাংলার বহু আত্ম-আবর্তিত কবিতার সামনে চ্যালেঞ্জস্বরূপ। সুকান্ত এসে লেখনী না ধারণ করলে বাংলা-কাব্যের একটা দিক অপূর্ব থাকত। তার কচি ও কোমল হাতে-গড়া বাংলা-কাব্যের একটি মিঠে-কড়া মূর্তি আমরা দেখতে পেতাম না।

সুকান্ত বেশীদিন বাঁচেনি। তার জীবনের ষোলকলা পূর্ণ হয় নি। জীবনের স্তরে স্তরে অজস্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয়েয় সুযোগ সে পায় নি। আঙ্গিক ও প্রকরণের সযত্ন ও পরিচর্যা করার অথবা ভাবের জগতে স্বর্গ-মর্ত আলোড়নের হিসাব-নিকাশ করার উপযুক্ত বয়সে সে পৌঁছতে পারে নি। ফলে, ষোলকলা চাঁদের কলঙ্কও তার ভাবজগতে বর্তায় নি! লেখার লাবণ্য ছিল বরাবর অনাবিল ও অনাবৃত। ভাবের সত্যভঙ্গ সে একদিনের জন্যও করে নি। সে যে-বিশ্বাসের উপরে কবিতা লিখেছে, সেই একই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে ছড়াও লিখেছে। বিশ্বাসের ঐকান্তিকতাই তার নিজস্ব ঐতিহ্য।

তার মনের মধ্যে ছিল এক শান্ত-স্নিগ্ধ, বিবাদ-বিহীন পৃথিবীর স্বপ্ন, যেখানে সকলেই ভাই ভাই হয়ে বাস করবে। এই স্বপ্নসাধনার যারা প্রতিবন্ধক, তারাই তার শত্রু। রাজনীতি ও অর্থনীতির নিয়ত ছলাকলায় যারা গরীব ও মজুরের জীবনকে বিষিয়ে তুলেছে, তাদের বিরুদ্ধেই সুকান্তর ছড়া-বিদ্রোহ। নির্যাতিত মানুষের যন্ত্রণাকে একদিকে যেমন সে ছড়ায় ব্যক্ত করেছে, অপরদিকে নির্যাতকের মুখোস খুলে ধরেছে। তাই তার ছড়াগুলি মুখ্যত দ্বি-স্রোতা।

সুকান্তর ছড়ার সংখ্যা খুব যে বেশী, তা নয়। তথাপি, কবিতা বা ছড়ায় তার সাহিত্যকীর্তির সামগ্রিক গভীরতা বিস্ময়ের বিষয়। সামান্য আয়ুর মধ্যে অসামান্য সৃষ্টির কাজই সে করে গিয়েছে। লেখার সংখ্যা প্রচুর, বিষয়বস্তুও অনেক। তার সৃষ্টি-সমগ্রের কথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

বাংলা-কাব্যজগতে সুকান্ত একটি অপর নাম। এই নামটি বাংলা ছড়ার জগতেও যুক্ত হবার'দাবী রাখে। 'মিঠে-কড়া' বই থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

'ভেজাল, ভেজাল, ভেজাল রে ভাই, ভেজাল সারা দেশটায়,
ভেজাল ছাড়া খাঁটি জিনিস মিলবে নাকো চেষ্টায়।' (ভেজাল)

'হিং-টিং-ছট্' প্রশ্ন এসব, মাথার মধ্যে কামড়ায়,
বড়লোকের ঢাক তৈরী গরীব লোকের চামড়ায়।'
(পুরোনো ধাঁধা)

'হাত ক'রে মহাজন, হাত ক'রে জোতদার,
ব্ল্যাক-মার্কেট করে ধনী রাম পোদ্দার,
গরীব চাষীকে মেরে হাতখানা পাকালো
বালিগঞ্জেতে বাড়ি খান-ছয় হাঁকালো।' (ব্ল্যাক-মার্কেট)

'ধনপতি পাল, তিনি জমিদার মস্ত,
সূর্য রাজ্যে তার যায় নাকো অস্ত,

*　　　*　　　*

নায়েবের অনুরোধে ধনপতি চরিদিক
দেখে নিয়ে বার-কয় হাসলেন ফিক্-ফিক্ ;
তারপর বললেন : বলা ভারি শক্ত,
সবচেয়ে ভালো খেতে গরীবের রক্ত॥' (ভালো খাবার)

'মজুররা দ্রুত খেটেই চলেছে—
খেটে খেটে হল হন্যে ;
ধনদৌলত বাড়িয়ে তুলছে
মোটা প্রভুটির জন্যে।' (পৃথিবীর দিকে তাকাও)

'নানাসাহেব, তাঁতিয়াটোপি, ঝাসীর রাণী লক্ষ্মী,
এঁদের নামে দৃপ্ত কিশোর, খুলবে তোমার চোখ কি ?'
(সিপাহী বিদ্রোহ)

'ডাংগুলি খেলা নয়, গুলির সঙ্গে খেলা,
রক্ত-রাঙানো পথে, দু'পাশে ছেলের মেলা ;'
(আজব লড়াই)

'মজুরের সেনা 'লাল ফৌজ' দেয়
পাহারা দিন ও রাত,
গরীবের দেশে সইবে না তারা
বড়লোকদের হাত।
শান্ত-স্নিগ্ধ, বিবাদ-বিহীন
জীবন সেখানে, তাই
সকলেই সুখে বাস করে আর
সকলেই ভাই ভাই।' (পৃথিবীর দিকে তাকাও)

উপরে মোট আটটি উদ্‌ধৃতি দিলাম। এসব অংশগুলির মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে সুকান্তর বৈশিষ্ট্য। জাতীয় সমাজচেতনাই শুধু নয়, রয়েছে সুস্থ আন্তর্জাতিকতা বোধও।

সুকান্তর কাল এখনো কেটে যায়নি। শুধু সুকান্ত নেই। ছড়ার মধ্যে যে-মনোদীপ সে জ্বালিয়ে রেখেছে, সেই আলোয় নিত্যকালে তার আরতি হবে।

সুকান্ত ঃ কয়েকটি স্মৃতির পাতায় — মোহিত আইচ

সুকান্ত এতো কাছের মানুষ ছিলো যে, তাকে কালি-কলমের সাহায্যে কারিগরি দক্ষতায় ফুটিয়ে তোলা যায় না। আর যায় না বলেই কিছু লিখিনি তার সম্বন্ধে এই পঁচিশটা বছর। ওর কথা মনে হলে একসঙ্গে হঠাৎ এতোগুলো স্মৃতিকথা ভীড় করে আসে যে, কোন্‌টাকে আগে আর কোন্‌টাকে পরে লিখবো, কিছুই ঠিক করতে পারি না। এতোদিনের ঘটনাস্রোত চুঁইয়ে চুঁইয়ে যে কঠিন শিলাস্তরের সৃষ্টি করেছিলো মনের গহনলোকে, আজকে তা গালিয়ে দিতে হবে। কী যেন একটা গচ্ছিত ধন ভাঙতে চলেছি। মন তাই সাড়া দিচ্ছে না।

১৯৪২-৪৩ সালের কথা। কলকাতার পথে পথে মৃত মানুষের স্তূপ। ডাষ্টবিনের আনাচে-কানাচে কুকুর-বেড়ালের সঙ্গে লড়াই করে মানুষগুলোর বিজয়গর্বে স্ফীতকায় জীর্ণ হাড়ের খাঁচায় দ্রুত নিঃশ্বাসের গর্বিত-স্পন্দন কিন্তু বেশ বোঝা যায়, রোজ পথ চল্‌তে দুটো-একটা মৃত্যু চোখে পড়েই।

সকালে জনরক্ষা সমিতির স্বেচ্ছাসেবকের কাজ সেরে, বাড়ির জন্য এক সের চাল ধরে দিয়ে চলে এসেছি সুকান্তর কাছে। আগের দিন হাতিবাগানে জাপানী-বোমা পড়েছিলো। জাপান বোমা ফেলেছে অথচ আমাদের জাতীয় চেতনায় তার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই কেন, এই ছিলো আমাদের প্রশ্ন। নেই কোন শত্রুর প্রতি ধিক্কার? তাই চলে গেলাম সুকান্তদের বাড়ি। নারকেলডাঙা মেন রোডের রেলপুলের ধারে কাঁচা নর্দমার পাড়ে এক দোতলা বাড়ি। ওরা থাকতো দোতলায়, নিচে কলঘর। ওপরের বারান্দার রেলিঙগুলো ছিলো ভাঙা। ইচ্ছা করলে বাচ্চারা অবাধে হামা দিয়ে চলে আসতে পারে এবং তাতে

সমূহ বিপত্তিরও আশঙ্কা থাকে। কিন্তু বিপদকে তাচ্ছিল্য করা বা গ্রাহ্য না করাই ছিলো ওদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সিঁড়ি দিয়ে অতি কষ্টে ওঠা যেতো। উঠতে পারলে একবার, আড্ডা জমানো যেতো দেদার। আর আড্ডা আমাদের জমতো প্রায়ই।

বোমা কি জিনিস এর আগে জানতাম না। আমাদের চেতনায় এ-এক নতুন অভিজ্ঞতা।

শুনেছি বর্মায় মানুষের আকুল ক্রন্দনের কথা। স্বামী তার স্ত্রীকে ছেড়ে গেছে, শিশু মরে আছে তার মায়ের কোলে, চারদিকে আগুনের লেলিহান শিখা মানুষকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মেরেছে।

সুকান্তকে বললাম, সুকান্ত, আমাদের দেশে তাহলে ফ্যাসিস্ট আক্রমণ এসে গেলো, কি বলো ?

তৈরী থাকুন, যে কোনো সময়ে আর্ত-মানুষের সেবায় আমাদেরও নেমে পড়তে হবে,—দীপ্ত কণ্ঠে সুকান্ত বলে চললো, আজকে বিকেলে 'কিশোর বাহিনী'-র কুচকাওয়াজের আয়োজন করুন।

ও আমাকে 'আপনি' 'আপনি' করেই কথা বলতো।

বিকেলে সেদিন সুকান্ত কিশোর বাহিনীর কুচকাওয়াজের সমাবেশে বুঝিয়ে বললো. দেশ স্বাধীন নয় বলে কি ঘরে আগুন লেগেছে জানলেও আমরা চুপ করে থাকতে পারি ? আমরা পারি না, তাই সংগঠন গড়ে তুললাম, গান গাইলাম :

বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ
রুখবো জাপানী দস্যু আজ।

সেদিন আমাদের গানে, আমাদের চলাফেরায় 'জাপানকে রুখতে হবে'—এই উগ্র ভঙ্গীটুকু অনেকেরই বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গের খোরাক জুগিয়েছিলো। তবু কিন্তু সেদিনের সাংগঠনিক প্রতিভা এবং আন্তর্জাতিকতাবাদে উদ্‌বুদ্ধ মানবতাবোধ আমাদের ছিলো একান্ত দুর্লভ সম্পদ। আর সুকান্ত সেই সম্পদের সবটুকুরই অধিকারী ছিলো, এ সত্য, আমি ওকে যখন দেখেছি বার বার তার প্রমাণ

পেয়েছি। ওর মৃত্যুভয়হীন সাংগঠনিক প্রতিভা সত্যিই আমাকে সেদিন মুগ্ধ করেছিলো। মুগ্ধ করেছিলো ওর অজস্র কবিতায় ছড়ানো জ্বলন্ত দেশপ্রেমের বার্তা।

সুকান্তর হৃদয়-উজাড়-করা ভালোবাসা দিয়ে বন্ধুর বিপদে দাঁড়ানোর মতো সাহসিকতাও সেদিন আমাকে কম আকৃষ্ট করেনি।

ব্যক্তিগত জীবনে আমাকে প্রায়ই বাড়ির সঙ্গে লড়াই করতে হতো। দোষটা কখনো-কখনো আমাদের বোহিমিয়ান জীবনযাত্রার জন্যও যে ছিলো না, এমন না, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে ঘটনাটি ছিলো একেবারে বিপরীত এবং মর্মান্তিক। বাড়ির মধ্যযুগীয় পরিবেশের সঙ্গে এসে জুটেছিলো নিদারুণ দারিদ্র্য, আরো সঙ্গে ছিলো নাগরিক উচ্ছৃঙ্খলতার উত্তপ্ত কিছু-কিছু পরিবেশ। একবার তাই বিদ্রোহ করে চলে এলাম বাড়ি ছেড়ে। কিন্তু কোথায় আর যাবো? সুকান্তকেই বললাম সব বুঝিয়ে।

যতোদিন ইচ্ছে থাকুন না এখানে, এই আমাদের বাড়িতে। —নির্বিবাদে রাজী হয়ে গেলো সুকান্ত। ও কিন্তু জানতো কিছু দিনের মধ্যেই বাড়ির সঙ্গে আমার আপোষ-রফা কিছু-না-কিছু একটা হয়ে যাবেই।

সাতদিন পর আবার বাড়ি ফিরে গেলাম। বাড়ির লোক ভেবেই পেলো না, বাড়ি ছেড়ে সাতদিন কোথায় রইলাম!

মনে আছে, সুকান্তই শেষ পর্যন্ত বাড়িতে এসে সব কিছু মিটিয়ে দিয়ে গিয়েছিলো।

এর পর থেকে ধীরে ধীরে ও হয়ে উঠলো আমাদেরই বাড়ির ছেলে। কিছুদিন আমার দুরন্ত মেজো ভাইটাকে পড়াতেও ছাড়লো না সুকান্ত।

এম্‌নি করেই সুকান্ত মিশে যেতো মানুষের অস্থি-মজ্জা ভেদ করে, কবি-মনের রস-শিকড় চালিয়ে দিতো মানুষের চেতন-অবচেতন মনের অতল তলে। তাই তো তার কাব্যে দেখি মানুষের ছায়া।

স্মৃতিচারণায় আরো একটি ছবি ভেসে আসছে, যা আজকে আমরা অনেকেই হয়তো ভুলতে বসেছি। আমাদের কয়েকজনের ওপর বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র-ফেডারেশনের পক্ষ থেকে দায়িত্ব পড়েছিলো প্রতি শনিবারে অসুস্থ শয্যাশায়ী সুকান্তকে রামধন মিত্র লেনে রাখালদার বাসায় গিয়ে গান শুনিয়ে আসতে হবে, একটু গল্প-গুজব করতে হবে ওর সঙ্গে। আমি যাঁর সঙ্গে যেতাম, তিনি আজকে রবীন্দ্র-সঙ্গীতশিল্পীদের মধ্যে একজন সুগায়িকা বলেই পরিচিতা। সুকান্তকে তিনি নিশ্চয়ই ভুলে যান নি, ভুলে যান নি নিশ্চয়ই সেই দিনগুলির কথা, বৌদির [রাখালদার স্ত্রী রেণুকা দেবী] মাঝে মাঝে এসে জোগান দেওয়া, মধুমাখা আপ্যায়ন, হাসিমুখের মেলামেশা—আমাদের সে বৌদি আজ আর নেই। রামধন মিত্র লেনের প্রাণসম্পদের আধারটা খালি হয়ে গেলেও, আজও কিন্তু ওখানে প্রাণ খুঁজে পাওয়া যায়। অনায়াসেই মনে হয়, বৌদি—সুকান্তর বৌদি, বুঝিবা এখুনি এসে হাজির হবেন একমুখ হাসি নিয়ে।

কিন্তু সত্যি তো আর আসবেন না!

ওই বাড়িতেই সুকান্তর রোগশয্যায় আমরা ওকে গান শুনিয়ে আসতাম। শুনিয়ে আসতাম ছাত্র-আন্দোলনের এটা-সেটা খবর। তখনকার গার্লস্ স্টুডেন্টস্ ফেডারেশনের সম্পাদিকা অলকাদি' [অলকা মজুমদার, বর্তমানে চট্টোপাধ্যায়] সুকান্তকে একটি কলম উপহার দিয়েছিলেন বাংলাদেশের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে। বোধহয়, বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের দেওয়া ওই কলমই সুকান্তকে দেওয়া শেষ উপহার।

সুকান্ত গান শুনতে ভালবাসতো। শুনেছি, ও কাশীতে থাকার সময় দিন-রাত রেডিওর কাছে কান দিয়ে বসে থাকতো। সুকান্তর সঙ্গে আড্ডা জমাবার আমারও একটা পুঁজি ছিলো, সেটা হলো আমার জোরালো কণ্ঠস্বর। সুকান্ত বলতো, আপনাকে দিয়ে রবীন্দ্র-

সঙ্গীত হবে না। আবার আই. পি. টি. এ-র গানগুলি আপনাকে ছাড়া আর কারুকে দিয়ে হবে না।—সত্যই ও আই. পি. টি. এ-র গান আমাকে দিয়েই গাওয়াতো বেশী। সব কিছুর মধ্যেও আমাকে উৎসাহিত করার ব্যাপারে ওর একটা স্বতন্ত্র দায়বোধ ছিলো।

রামধন মিত্র লেনে সুকান্তকে প্রায়ই দেখতাম কখনো খুবই অসুস্থ, কখনো আবার সতেজ। রোগ-যন্ত্রণার সঙ্গে লড়াই করে ও বোধহয় শেষদিন পর্যন্ত সংগ্রামী সৈনিকের দায়িত্বই পালন করে গেছে। ক্রমশঃ শরীর খারাপ হতে থাকে, ওকে রেড্ এড্ কিওর হোমে স্থানান্তরিত করা হয়। রওডন স্ট্রীটে প্রায়ই যেতাম, গল্প-স্বল্প করতাম আমি আর অরুণাচল। ভাবতাম, আবার ওকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবো। কিন্তু তা আর হলো কই? ও চলে গেলো, সত্যিই চলে গেলো।

ওর সম্বন্ধে লেখা যায় নাকি সব কথা গুছিয়ে? হেসেছি, খেলেছি, কাজ করেছি! ফলে সত্তার সঙ্গে মিশে ও কোথায় যে জড়িয়ে আছে, খুজতে গেলে তাই আমার নিজেকেও খুঁড়ে বার করতে হয়। তাই সুকান্তর চেয়ে 'আমি'র সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া সুকান্তকে টেনে বার করতে হলে পাছে আত্মপ্রচারণা হয়ে যায়—এতোদিন পর্যন্ত সেটাই ছিলো আমার মস্ত ভয়। তাই, আমার পক্ষে লেখা নয়, বরং একটি আবেগপূর্ণ মুহূর্তে ওকে স্মরণ করতে পারি—আবেগে বেপথুমান হতে পারি, কিন্তু লিখতে পারি না।

সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কয়েকদিন আগে সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা আবার পড়লাম। বেশ ভালো লাগলো! সত্যি কথা বলতে কি, নিজেই আশা করিনি যে সুকান্তর কবিতা আবার ভালো লাগবে।

সুকান্তকে আমি চোখে দেখিনি। আমার চেয়ে সুকান্ত কয়েক বছরের বড়। সুকান্ত যখন টিউবারকুলোসিসে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে শয্যাশায়ী, আমি তখন হাফপ্যান্ট পরা ছেলে—তখন কলকাতায় রেশান দোকানে লাইন, কাপড়ের দোকানে লাইন, এমন কি কয়লার দোকানেও লাইন দিয়ে দাঁড়াতে হতো—সেইসব লাইনে দাঁড়িয়েই আমার অনেক সময় কেটে যায়। লাইনে দাঁড়াবার একটা আনন্দও ছিল, দু'চার পয়সা মার্জিন করা যেত।

মৃত্যুর পর সুকান্তর প্রথম কবিতার বই বেরোয়, 'ছাড়পত্র'। সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন এই বইয়ের ভূমিকা। সুকান্ত নিজের কাব্যগ্রন্থ দেখে যেতে পারেনি। কিন্তু এই বই আমাদের নিজস্ব বই হয়ে গেল, এই বই হলো আমাদের নিত্যসঙ্গী, কবিতাগুলো মুখস্ত করে আমরা বন্ধুরা পরস্পরকে শোনাতাম। আমাদের এক বন্ধু দাবি করেছিল যে, সুকান্তর সঙ্গে তার ব্যক্তিগত চেনাশুনো ছিল, কিশোর বাহিনীতে এক সঙ্গে কাজ করেছে সুকান্তর সঙ্গে—এই জন্য আমাদের কাছে বন্ধুটি বিশেষ খাতির পেতে শুরু করে।

বুদ্ধদেব বসু সুকান্ত সম্পর্কে একটি ছোট লেখা লিখেছিলেন—তার মধ্যে সুকান্তর জীবন্ত ছবি দেখতে পেয়েছিলাম। আরও নানান লেখা। সুকান্ত সম্পর্কে গল্পও প্রচলিত হয়েছিল অনেক, যেমন অতি দারিদ্র্যে. প্রায় বিনা চিকিৎসায়, অবহেলায় মৃত্যু হয়েছিল তার—পরে অবশ্য জেনেছিলাম—এসব অধিকাংশই সত্যি নয়,

কিন্তু তখন এসব বিশ্বাস করতে বেশ ভালো লাগতো। একজন কবির জীবনের সঙ্গে এসব গল্প বেশ মানিয়ে যায়। মনে পড়ে কীটসের কথা। কিশোর কবি চ্যাটারটনের কথাও তখন সদ্য পড়েছি। চ্যাটারটনের কথা ভাবলেই আমার সুকান্তর গালে হাত দেওয়া রোগা চেহারার ছবিটি মনে পড়তো।

সুকান্তর কবিতা যখন হঠাৎ খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠলো, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় হিট গানের রেকর্ড করলেন, ওর কবিতা একজন ছায়া-নৃত্যে দেখাতে লাগলেন—তখন আমরা কেউ কেউ সুকান্তকে অপছন্দ করতে চেষ্টা করলাম। এই রকমই হয়, একজন কবি বা লেখক যখন খুব জনপ্রিয় হয়ে যায়, তখন তাঁর প্রথম দিককার পাঠকরা খানিকটা ক্ষুণ্ণ বোধ করবেই। তারা মনে করে, আগে এই কবি ছিল আমাদের নিজস্ব, এখন তিনি বারোয়ারি, অনেক দূরের।

এ ছাড়াও আরও অনেক কবিতা পড়ার পর, সুকান্তর কবিতার কিছু কিছু স্থূলতা আমাদের চোখে পড়েই। সুকান্তর কবিতা বড় বেশী সোজাসুজি, বড় সরল, কোথাও কোথাও ভাবপ্রবণতা কাব্যরসে রূপান্তরিত হতে পারেনি। কবিতার রহস্যময়তা, শব্দের ধ্বনি-মাধুর্য —যে কারণে একটি ছোট কবিতাও অনেকক্ষণ ধরে বা অনেকদিন বা বহু বছর ধরে মনের মধ্যে তরঙ্গ তুলে যায়—সুকান্তর কবিতায় সেই গুণগুলি অনুপস্থিত। বক্তব্য যা-ই হোক, শব্দই কবিতার প্রাণ, বিশুদ্ধ শব্দের সেই অনুসন্ধানের জন্য সুকান্ত বেশী সময় দিতে-পারেনি। বলাই বাহুল্য, বক্তব্য জোরালো করার সঙ্গে এই শব্দ নির্বাচনের কোনো সম্পর্ক নেই। যিনি বিশুদ্ধ কবি, তিনি যে বক্তব্যই কবিতার মর্ম করুন না কেন ঐ শব্দের মাধুর্য তিনি কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারবেন না। যেমন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কবিতাকে তিনি সহজ ও সর্বজনবোধ্য করার জন্য অনেক পরীক্ষা করেছেন। সেই পরীক্ষাতে সার্থক হয়েও তিনি বিশুদ্ধ শব্দের কবি—তাঁর যে-কোনো কবিতাই প্রকৃত কবিতা। বামপন্থী সাহিত্য বা দক্ষিণপন্থী সাহিত্য—

এ বিভাগ আমি একেবারেই বিশ্বাস করি না। তবু তথাকথিত-ভাবে যাঁদের বামপন্থী কবি বলা হয়, তাঁদের মধ্যে মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতায় এই বিশুদ্ধ শব্দ ব্যবহারের রীতি সব সময়ই দেখা যায়।

যাই হোক, এতদিন পর সুকান্তর কবিতা পড়ে কিন্তু আবার ভালো লাগলো। কবিতা কি, এ কথার উত্তরে জীবনানন্দ দাশ বলেছিলেন, কবিতা অনেক রকম। সেই হিসেবে, এক রকম কবিতায় সুকান্ত অত্যন্ত সার্থক। এবার পড়ার সময় সুকান্তর কবিতার রহস্যময়তা পাবার প্রত্যাশা করিনি। ঐ কবিতাগুলি রচনার পর অনেক বছর কেটে গেছে, কিন্তু খুবই সুখের কথা, সহজ সরল আবেগের কবিতা হিসেবে সুকান্তর রচনা আজও বিশেষ প্রাণবন্ত। এখন যেটা সবচেয়ে মনে বেশী দাগ কাটে, সুকান্তর রচনায় কোথাও আত্মপ্রত্যয়ের অভাব ছিল না। যাদের বিশ্বাসের ভিত আলগা, কিংবা যারা পরের মুখে ঝাল খায়, তারা অনেকেই কিছু ইনটেলেকচুয়াল কচকচি এনে জগাখিচুড়ি করে একটা ধোঁয়াটে বস্তু তৈরী করেন। কিন্তু আত্ম-প্রত্যয় এবং তেজই সুকান্তর কবিতাকে প্রাণ দিয়েছে।

যাঁরা মন দিয়ে কবিতা পড়েন, তাঁরা জানেন যে, সুকান্ত ভট্টাচার্য বা জীবনানন্দ দাশ বা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বা শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় —এঁদের কারুর কবিতার বক্তব্যই আলাদা নয়। যাঁরা দলে টানাটানির স্থূল প্রশ্ন তোলেন, তাঁদের কথা এখানে বিচার্য নয়। কিন্তু প্রত্যেক কবিই মানুষের মুক্তির জয়গান করে যান, সবাই, এমন কি এজরা পাউণ্ড পর্যন্ত। কে কি রকমভাবে বলবেন, সেটা তাঁদের চরিত্রের ধাতুর ওপর নির্ভর করে। সুকান্ত সরাসরি মুখের ওপর ছুঁড়ে মারার মতন বলতে ভালোবাসতেন—নিশ্চিত এরও একটা বিশেষ আবেদন আছে। সেই আবেদন আমাকে স্পর্শ করলো। তবে দুঃখের বিষয়, বাংলা কবিতায় সুকান্তর কোনো উত্তরাধিকারী পাওয়া গেল না।

দেশ। ১২ই ভাদ্র, ১৩৭৭

পত্রগুচ্ছে সুকান্ত মিহির সেন

যে কোন শিল্পীর পরিচয় তাঁর সৃষ্ট শিল্প। কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে তাঁকে জানতে হলে তাঁর ব্যক্তিগত চিঠিপত্রকে একটি বিশ্বস্ত অবলম্বন হিসেবে মেনে নেওয়া যায়। সৃষ্টির ক্ষেত্রে মানুষ সচেতন। শিল্পের ব্যাকরণ প্রসঙ্গে সতর্ক। তাছাড়াও, অবচেতনে আড়াল এক সার মুখ সব সময় তাঁকে সাবধান রাখে। কিন্তু চিঠিপত্রে সেই মানুষই সহজ, সচ্ছন্দ, অনাড়ষ্ট। যে লেখে ও যাকে লেখা, তাদের মাঝে তৃতীয় কোন অদৃশ্য অস্তিত্বের পাহারা থাকে না বলে। অবশ্য খ্যাতির সেই শীর্ষের কথা আলাদা, যেখানে পৌঁছালে মানুষের আড়াল বলে কিছু আলাদা রাখা কষ্টসাধ্য। জীবনের সর্বত্রই সহস্র অনুরাগীর উৎসুক দৃষ্টির উঁকিঝুঁকি যখন এক অস্বস্তি।

মাত্র একুশ না পেরোতে যে-সুকান্ত মারা যায়, প্রচণ্ড এক সম্ভাবনা হিসেবেই সবে মাত্র পাঠকদের কাছে আত্মপ্রকাশ করছিল সে। ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের ক্ষেত্রেও সতর্ক থাকার মত খ্যাতি-সচেতন হবার অবকাশ পায়নি। তার প্রকাশিত পত্রগুচ্ছে তাই ব্যক্তি সুকান্তর মানস-চরিত্রের অকৃত্রিম পরিচয় সহজলভ্য।

সুকান্তর প্রকাশিত পত্রগুচ্ছের অধিকাংশই লেখা তার অভিন্ন-হৃদয় কবিবন্ধু অরুণাচল বসুকে। একটি চিঠিতে সুকান্ত বন্ধুকে স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে, 'আমার চিঠি সাধারণত একটু উচ্ছ্বাস বর্জিতই।'

কিন্তু সুকান্তর সমগ্র পত্রগুচ্ছ একথা অস্বীকার করছে। তারুণ্যের আবেগে, উচ্ছ্বাসে সুকান্তর প্রতিটি চিঠি প্রাণবন্ত; উপভোগ্য। বিভিন্ন পত্রের শুরুর সম্ভাষণেও তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। অনাবিল এক কৌতুকপ্রবণ মনেরও পরিচয় বহন করছে তা। যেমন,—এ

আনন্দদায়কেষু, শ্রীরুদ্র শরণম, সবুরে মেওয়াফলদাতাসু, আশানুরূপেষু, শ্রীশ্রীশ্রী ১০৮ অর্ণবস্বামী গুরুজী মহারাজ সমীপেষু [অরুণাচল এ সময় গৃহত্যাগ করে সৎসঙ্গের আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছিলেন] ইত্যাদি।

সুকান্তর পত্রগুচ্ছের ভেতর সবচেয়ে আকর্ষণীয় বোধহয় তাঁর ব্যক্তিগত প্রেম-প্রসঙ্গ। এসব চিঠির প্রতি ছত্রে ছড়িয়ে আছে চিরন্তন এক কিশোর-প্রেমের আবেগ, উচ্ছ্বাস, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, চাপল্য, সঙ্কোচের স্বাক্ষর।

অবশ্য বন্ধুকে লেখা চিঠি থেকেই অনুমান করা যায়, বয়সের সঙ্কোচে এই নবলব্ধ প্রেমানুভূতিকে কিশোর-কবি আপন মনের মণিকোঠাতেই গোপন রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একদিন 'আবেগের বেগে', বন্ধুর কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করে বসে— 'এখন শোন, যে "আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছে দান" তার পরিচয়।'

মেয়েটি ছিল সুকান্তর বাল্যসঙ্গিনী। খেলার সাথী। সুকান্তর যখন বয়স এগারো, মেয়েটির নয়, তখন, সুকান্তর ভাষায়, 'একবার আমাদের উভয়কেই······যেতে হয়, সেখানেই আমরা আরো অন্তরঙ্গ হয় পড়ি এবং আমি সেখান থেকেই লাভ করি ওর সান্নিধ্যের আকর্ষণ।'

অবশ্য সে আকর্ষণ প্রসঙ্গে সুকান্তর নিজেরই বিশ্লেষণ—'বাস্তবিক আমাদের সম্পর্ক তখনও অন্য ধরনের ছিল, সম্পূর্ণ অকলঙ্ক, ভাই বোনের মত।'

কিন্তু সুকান্তর বয়স যখন তের-চোদ্দ, এই অকলঙ্ক আকর্ষণই তখন একদিন এল প্রেমের অনুভূতি নিয়ে। সুকান্তর কাব্যময় বর্ণনায়—'শেষে একদিন, যখন সবে এসে দাঁড়িয়েছি যৌবনের সিংহদ্বারে, এমনি একদিন, দিনটার তারিখ জানি না, পাশাপাশি শুয়ে ছিলাম, ঘুমিয়ে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতেই দেখি ভোর হচ্ছে আর সেই

ভোরের আলোয় দেখলাম পার্শ্ববর্তিনীর মুখ। সেই নবপ্রভাতের পাণ্ডুর আলোয় মুখখানি অনির্বচনীয়, অপূর্ব সুন্দর মনে হল। কেঁপে উঠল বুক, যৌবনের পদধ্বনিতে। হঠাৎ দেখি ও চাইল আমার দিকে চোখ মেলে, তারপর পাশ ফিরে শুলো। আর আমি যেন চোরের মত অপরাধী হয়ে পড়লাম ওর কাছে। লজ্জায় সেই থেকে আর কথা বলতে পারলাম না—আজ পর্যন্ত।'

অনেক বয়স্কের কাছেই হয়তো প্রেমের ক্ষেত্রে এ-বয়সটা কিছুটা অস্বস্তি বা কৌতুকের। কিন্তু কিশোর-চেতনায় সেটাই এক জীবন-মৃত্যু সমস্যা। এক অসহ্য যন্ত্রণা।

'...তোর কাছে ক্ষমা চাইছি, তোর কাছে এতদিন ছলনার প্রয়োজন ছিল বলে। কিন্তু আর নয়, এই জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আর কপটতার আশ্রয় নিলুম না এই জন্যই যে, কথাটা গোপন হলেও ব্যথাটা আর গোপন থাকতে চায় না, তোর কাছে—উলঙ্গ, উন্মুক্ত হয়ে পড়তে চায়।'

কিন্তু এই আবেগের সঙ্গেই ছিল বয়সোচিত দ্বিধা, কুণ্ঠা। একই চিঠিতে পুনশ্চে তাই সুকান্তর দ্বিধা, 'আমি যে তার উপযুক্ত নই।' কুণ্ঠা—'আমার প্রধান সমস্যা, আমি আজও জানি না ও আমায় ভালবাসে কি না। কতদিন আমি ভেবেছি, ওর কাছে গিয়ে মুখোমুখি জিজ্ঞাসা করব, এই কথার উত্তর চাইব; কিন্তু সাহস হয় নি।'

কিশোর-প্রেমের আর এক সমস্যা বয়স্করা। এ সমস্যা সুকান্তরও ছিল—'আমার দ্বিতীয় সমস্যা আরো ভয়ঙ্কর। যদি আমার আত্মীয়রা জানতে পারে একথা, তবে আমার লাঞ্ছনার অবধি থাকবে না।'

অবশেষে এই দ্বিধা, কুণ্ঠা পেরিয়ে প্রথম যেদিন অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করে সুকান্ত, পত্রে সেদিনের বর্ণনাও কৌতুকপ্রদ। বর্ণনার গুণে দৃশ্যময়। বহুক্ষণ একই ঘরে বসে আছে দুজনে। মেয়েটি বসে রেডিও শুনছে। বহুক্ষণ অপেক্ষার পর সুকান্তর মনে হল, 'এক ঘরে থেকেও দুজনে কথা না বলা লোকচক্ষে নিতান্ত অশোভন। তাই অনেকক্ষণ

ধরে মনে বল সঞ্চয় করে' 'মেয়েটিয় নাম ধরে ডাকল সে।' 'কিন্তু গলা দিয়ে অত্যন্ত ক্ষীণ, কম্পিত স্বর বেরুল, ও তা শুনতে পেল না অবশেষে বেশ জোর দিয়ে আর একবার ডাকতে মেয়েটি চমকে ফিরে তাকাল, 'এবং আমিও এতক্ষণ ধরে ক্রমাগত মুখস্থ করা কথাট' কোন রকমে বলে ফেললাম, ইচ্ছে হলে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে পার।'

কিন্তু যে বয়স প্রেমের পূর্ণবোধ ও গম্ভীরতা দেয় মানুষকে, কৈশোর সে বয়স নয়। কিশোর-প্রেমের স্বধর্ম তাই যতটা বহিরাঙ্গিক বা তাৎক্ষণিক উচ্ছ্বাস, ততটা স্থিরায়ু নয়। সুকান্তও এর ব্যতিক্রম নয়। বেশ কিছুদিন পরের এক চিঠিতে তাই প্রেম-প্রসঙ্গে তার নির্মোহ মূল্যায়ণ—'ওটা কাব্যরোগের লক্ষণ। মানুষের যখন কোন কাজ। থাকে না, তখন কোন একটা চিন্তাকে আশ্রয় করে বাঁচতে সে উৎসুক হয়, তাই এই রকম দুর্বলতা দেখা দেয়।'

জীবনের অন্য এক অধ্যায়ে উপক্রমণিকা নামে (দুই বন্ধুর দেওয়া ছদ্মনাম) একটি মেয়ে ক্ষণিক মোহ সৃষ্টি করেছিল সুকান্তর মনে। সুকান্তর 'মনের অন্ধকারে ফুটে উঠেছিল একটি রৌদ্রময় ফুল' হয়ে। কিন্তু মেয়েটি বিদায় নেবার পর সুকান্ত নিজের আত্মমূল্যায়ণ করে বন্ধুকে লিখল, 'সে ক'দিন কেটেছিল যেন এক মূর্ছার মধ্য দিয়ে, সমস্ত চেতনা হারিয়ে গেছল কোনও অপরিচিত সুরলোকে! তোমরা একে পূর্বরাগ আখ্যা দিতে পার, কিন্তু আমি বলব এ আমার দুর্বলতা।'

মাঝে মাঝে প্রেম-প্রসঙ্গে সুকান্তকে বয়সের তুলনায় অনেক বেশি সতর্ক, বয়স্ক বলে মনে হয়। বন্ধুর নতুন প্রেমের সংবাদ পেয়ে উত্তরে একবার জানিয়েছিল, 'তোর তৃতীয় (!?) প্রেমের ইতিবৃত্ত পড়লাম, পড়ে খুশিই হলাম···যদিও এ জাতীয় প্রেমোপাখ্যানের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আমি বরাবর অতি সতর্কতার দরুণ সন্দিহান, তবুও এর উপকারিতাকে আমি অস্বীকার করি না। তবে, ঐ ব্যাপারে উৎসাহ

দিতে গিয়েও আমি তোকে একটা প্রশ্ন করছি—এইভাবে এগোলে জীবনের জটিলতা কি আরো বেড়ে যাবে না?'

প্রেম-প্রসঙ্গেই আর একটি জিনিস লক্ষ্যণীয়। প্রেমের প্রয়োজনীয়তা জীবনে উপলব্ধি করলেও, প্রেম-প্রসঙ্গে পূর্ণ শ্রদ্ধা থাকলেও, প্রেমের উচ্ছ্বাসে কবিতা লেখায় রীতিমত অনিহা ছিল তার। বন্ধুর কাছে অকপটে স্বীকার করেছিল, 'প্রেমে পড়ে কবিতা লেখা আমার কাছে নক্কারজনক মনে হয়।'

অনুভূতির দিক দিয়ে সুকান্ত ছিল আবেগপ্রবণ। রোমাঞ্চপ্রিয়। বিশেষ করে যুদ্ধের মুখোমুখি কলকাতা থেকে লেখা তার চিঠিগুলি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

জাপানী-আক্রমণের আতঙ্কে, উত্তেজনায়, অনিশ্চয়তায় কলকাতা তখন রুদ্ধশ্বাস। দলে দলে লোক পালাচ্ছে কলকাতা থেকে।

অভিভাবকরা সুকান্তর ভাইদের কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু সুকান্ত কিছুতেই গেল না। সুকান্তর এই সিদ্ধান্তের জবাবদিহি—'কিন্তু আমি গেলুম না মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াবার এক দুঃসাহসিক আগ্রহাতিশয্যে, এক ভীতি-সংকুল, রোমাঞ্চকর পরম মুহূর্তের সন্ধানে।'

পাছে 'কলকাতার ভয়ঙ্কর দিনগুলি হারিয়ে' ফেলে, তাই কিশোর সুকান্ত কলকাতায়ই থেকে গেল।

এ যেন রুদ্রের জন্য কৈশোরের এক বেপরোয়া প্রতীক্ষা, অজানা রোমাঞ্চের জন্য জীবনপণ উৎকণ্ঠা।

এবং তারই সঙ্গে অস্পষ্ট এক জাতীয়-গর্ব। 'ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে কলকাতা...।' 'আজ রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে পৃথিবী কলকাতার দিকে চেয়ে...।'

অবশ্য কলকাতার সম্ভাব্য পরিণতি তখন পর্যন্ত কিশোর সুকান্তর চেতনায় এক রোমান্টিক কল্পনা, আপন মৃত্যু-কল্পনাও তাই কাব্য-মণ্ডিত। 'সত্যি অরুণ, বড় ভাল লেগেছিল পৃথিবীর স্নেহ, আমার

ছোট্ট পৃথিবীর করুণা। বাঁচতে ইচ্ছে করে, কিন্তু নিশ্চিত জানি কলকাতার মৃত্যুর সঙ্গেই আমিও নিশ্চিহ্ন হব।···তবু একটা বিরাট পরিবর্তনের মূল্য যে দিতেই হবে।'

শুধু মৃত্যু বা ধ্বংস নয়, তার পরের চিত্রও স্বপ্নালু কিশোর চোখে পূর্ণ-প্রতিবিম্বিত—'আবার পৃথিবীতে বসন্ত আসবে, গাছে ফুল ফুটবে। শুধু তখন থাকব না আমি, থাকবে না আমার ক্ষীণতম পরিচয়। তবুও জীবন দিয়ে এক নতুনকে সার্থক করে গেলাম।···এই আমার আজকের সান্ত্বনা।'

অবশেষে সত্যিই একদিন কলকাতার ওপর নেমে এল সেই প্রতীক্ষিত দিন। জাপানী বোমায় আক্রান্ত হল কলকাতা। প্রথম তিন দিন বোমা বর্ষণের সময় সুকান্ত ঘটনাস্থল থেকে দূরে ছিল। কিন্তু চতুর্থ দিন ছিল কাছাকাছি, দাদা-বৌদির বাড়ীতে। সেদিনের বর্ণনায় বন্ধুর কাছে অবশ্য অকপটে স্বীকার করেছে সুকান্ত তার 'অবিরাম কাঁপুনি'র কথা!

তবে ঐ একদিনই। কল্পিত-ভয় যখন সত্যিই আবির্ভূত হয় তখন 'কঠিন বাস্তব হিসেবেই তাকে মোকাবিলা করে মানুষ। সুকান্তর চিঠিতেও তার আভাস পাই—'এখন আর ভীরুতা নয়, দৃঢ়তা।'

আগের চিঠিগুলোর আবেগ প্রসঙ্গে নিজেও সচেতন তখন। তাই স্বীকৃতি, 'তখন ভয়ের কুশলী বর্ণনা দিয়েছি, কারণ সে সময়ে বিপদের আশঙ্কা ছিল, কিন্তু বিপদ ছিল না। তাই বর্ণনার বিলাস আর ভাষার আড়ম্বর প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিল, এখন ত বর্ষমাণ বিপদ।'

সুকান্তর পত্রগুচ্ছে আর একটি জিনিসও লক্ষ্যণীয়—কলকাতার প্রতি তাঁর প্রচণ্ড আকর্ষণ। গভীর ভালবাসা।

—'কলকাতাকে আমি ভালবেসেছিলাম, এক রহস্যময়ী নারীর মত, ভালবেসেছিলাম প্রিয়ার মত, মায়ের মত। তার গর্ভে জন্মানোর পর আমার জীবনের এতগুলি বছর কেটে গেছে, তারই উষ্ণ নিবিড় বুকের সান্নিধ্যে তারই স্পর্শে আমি জেগেছি, তার স্পর্শে আমি

ঘুমিয়ে পড়েছি। বাইরের পৃথিবীকে আমি জানি না, চিনি না, আমার পৃথিবী আমার কলকাতার মধ্যেই সম্পূর্ণ।'

তাই যুদ্ধকালীন দিনগুলোর প্রায় জনহীন, অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতের কলকাতা সুকান্তর কাছে এক বিষণ্ণ অনুভূতি। 'সেই আলোকময়ী নগরীকে আজকাল স্মরণ করা কঠিন; যেমন একজন বৃদ্ধা বিধবাকে দেখলে মনে করা কঠিন তার দাম্পত্য-জীবন।'

তাই কলকাতার সম্ভাব্য ধ্বংস প্রসঙ্গে ব্যথিত সুকান্ত। 'বাস্তবিক ভাবতে অবাক লাগে, আমার জন্ম-পরিচিত কলকাতা ধীরে ধীরে তলিয়ে যাবে অপরিচয়ের গর্ভে, ধ্বংসের সমুদ্রে, তুমিও কি তা বিশ্বাস কর, অরুণ?'

অবশ্য এ থেকে এ-সিদ্ধান্তে আসা উচিত নয় যে, সুকান্ত-মানস মূলত ছিল নগর-কেন্দ্রিক। প্রকৃতির প্রতিও ছিল তাঁর সমান আকর্ষণ। গভীর আসঙ্গ-লিপ্সা। রাঁচী থেকে বন্ধুকে লেখা চিঠির প্রতি ছত্রে ছড়িয়ে আছে সেই ভাব-গম্ভীর অনুভূতির স্বাক্ষর।

রাঁচির 'অরণ্যসঙ্কুল পাহাড়ে' জোন্‌হা প্রপাত দর্শনের প্রথম অভিজ্ঞতা সুকান্তর—'গিয়ে যা দেখলাম তা আমার স্নায়ুকে, চৈতন্যকে অভিভূত করল। এতদিনকার অভ্যস্ত গতানুগতিক দৃষ্টির ওপর এ একটা সত্যিকারের প্রলয় হিসেবে দেখা দিল। মুগ্ধ সুকান্ত তাই একটা কবিতা না লিখে পারল না।'

শুধু আবেগ নয়, সেই কিশোর বয়সেই সুকান্তর মানস-প্রকৃতির গভীরতারও পরিচয় বহন করছে এ চিঠি। জোন্‌হা থেকে বিদায়-পর্বের অনুভূতি তার—'এ থেকে বুঝলাম, কোন কিছুর আসাটাই স্বপ্ন—আর যাওয়াটা কঠোর বাস্তব। খুব কম জিনিসই কাছে আসে; কিন্তু যায় প্রায় সব কিছুই। জোন্‌হাই তার বড় প্রমাণ।'

এই আবেগপ্রবণ স্পর্শকাতরতা ছিল সুকান্তর চারিত্রিক-বৈশিষ্ট্য। এমনকি বন্ধুদের ছেড়ে-আসা পুরোন বাড়িটিও যেন ওর কাছে এক বিরহ-যন্ত্রণা।

—'যেখানে তোরা ছিলি গত চার বছর নিরবিচ্ছিন্ন নীরবতায়, যেখানে কেটেছে তোদের কত বর্ষণ-মুখর সন্ধ্যা, কত বিরস দুপুর, কত উজ্জ্বল প্রভাত, কত চৈতালি হাওয়ায়-হাওয়ায় রোমাঞ্চিত রাত্রি, তোর কত উষ্ণ কল্পনায়, নিবিড় পদক্ষেপে বিজড়িত সেই বাড়িটি ছেড়ে দেওয়া হল আপাত নিষ্প্রয়োজনীয়তায়।···দেখলাম স্তব্ধ বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে, সদ্যবিয়োগ-ব্যথাতুরা বিরহিণীর মত বাড়িটার এক অপূর্ব মুহ্যমানতা।'

মাকে হারিয়েছিল সুকান্ত অল্প বয়সে। এই অপূরণীয় অভাব ওর কিছুটা মিটিয়েছিলেন বন্ধু অরুণাচলের মা, সরলা বসু। সুকান্তকে ছেলের মতই স্নেহ করতেন তিনি। শুধু স্নেহ নয়, নিজেও লিখতেন বলে সুকান্ত ও অরুণাচলের সাহিত্যচর্চার প্রতি ছিল তাঁর সস্নেহ প্রশ্রয়। এই স্নেহের প্রভাব যে সুকান্তর ওপর কত গভীর ছিল তা জানা যায় সুকান্তর বন্ধুকে লেখা চিঠির সূত্রে, মাকে লেখা চিঠি থেকে। পরবর্তী সময় সুকান্ত বন্ধুর মাকে মা বলেই সম্বোধন করত।

বন্ধুর মা-র প্রতি সুকান্তর যে কী প্রচণ্ড শ্রদ্ধা ছিল তা জানা যায় বন্ধুকে লেখা একটি চিঠির অংশ থেকে—'চিঠিটা লিখেই তোর মা-র কাছে যাব। বাস্তবিক, তোর মা তোর জীবনে স্বর্গীয় 'সম্পদ। তোর জীবনে যা কিছু, তা যে তোর মাকে অবলম্বন করেই—এই গোপন কথাটা আমি জেনে ফেলেছি।'

লেখিকা হিসেবেও সরলা বসুর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল সুকান্তর। তাঁর একটি গল্প পড়ে বন্ধুকে সঙ্গে সঙ্গে জানিয়েছিল সুকান্ত, 'তোদের (তোর এবং তোর মা-র) দুজনের লেখা গানটা পড়লুম ; বেশ ভাল। কালকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলুম 'পাঁচটি ফাগুন সন্ধ্যা ও একটি কোকিল' গল্পটি। আজ দুপুরে সেটি পড়লুম। বাস্তবিক এ রকম এবং এ ধরনের গল্প আমি খুব কম পড়েছি (ভালর দিক দিয়ে)।···গল্পটা বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাবার যোগ্য।'

মা-র কাছে লেখা চিঠিগুলো থেকেও মা-র প্রতি সুকান্তর আন্তরিক শ্রদ্ধা ও আত্মিক নির্ভরতার পরিচয় পাওয়া যায়।

এক মানসিক বিপর্যয়ের মুখে মা-র কাছে লেখা সুকান্তর একটি চিঠি—'যেখানে যাই, সেখানেই দেখি কুশ্রীতা মলিনতা—এক দুর্নিবার গ্লানিতে আমি ডুবে আছি। আপনাকে এত কথা বলছি তার কারণ আপনার কাছে সান্ত্বনা, আশ্বাস চাই বলে; আপনার আশীর্বাদ চাই যাতে এই দূষিত আবহাওয়া কাটিয়ে উঠতে পারি।...ঠিক এই সময় আপনার পবিত্র সান্নিধ্য পেলে আমি নিজেকে এতটা অসহায় মনে করতুম না—।'

কবি সুকান্তর এই ক্লান্ত কণ্ঠস্বর অনেককেই হয়তো বিস্মিত করবে। কিন্তু কবিতায় যে-সুকান্ত অদম্য বিদ্রোহী, জনতার জয়ধ্বনিতে ঋজু কণ্ঠ; পত্রগুচ্ছে তার আর এক পরিচয়—জীবনে বীতস্পৃহ, জনতায় আস্থাহীন, ক্লান্ত সৈনিক।

মৃত্যুর একবছর আগে বন্ধুকে লেখা একটি চিঠিতে উচ্চারিত এই হতাশা মর্মস্পর্শী। 'আমার খবর : শরীর মন দুই-ই দুর্বল। অবিশ্রান্ত প্রবঞ্চনার আঘাতে আঘাতে মানুষ যে সময় পৃথিবীর ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে, ঠিক সেই সময় এসেছে আমার জীবনে।...আজকাল চারিদিকে কেবল হতাশার শকুনি উড়তে দেখছি। হাজার হাজার শকুনি ছেয়ে ফেলেছে আমার ভবিষ্যৎ আকাশ।'

যে-পার্টির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিল, বিপর্যয়ের মুখে তার বিরুদ্ধেও সুকান্তর মনে ক্ষোভ জমেছিল। বন্ধুকে দুঃখ করে লিখেছিল তাই, '...অবিরাম আন্তরিক খাটুনির পুরস্কার হিসাবে... কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পেলুম যাতায়াতী খরচের জন্য পাঁচটি টাকা! আর পেলুম চারদিনের জন্যে পার্টি হাসপাতালের "ওষুধপথ্যিহীন" কোমল শয্যা। এতবড় পরিহাসের সম্মুখীন জীবনে আর কখনও হই নি।'

ফলে, যে-সুকান্ত কোনদিন অর্থকে জীবনের মোক্ষ বলে ভাবেনি,

নিজের আর্থিক অনটনকে চরম উপেক্ষায় গ্রহণ করে বন্ধুকে যে অকপটে লিখতে পারত, 'সঙ্গে Govt. Art school-এ exibition দেখতে যাবার মত গাড়ি ভাড়াও আনিস', বন্ধুকে সে চরম হতাশায় লিখছে, 'কেবলই অনুভব করছি টাকার প্রয়োজন। শরীর ভাল করতে দরকার অর্থের, ঋণমুক্ত হতে দরকার অর্থের, একখানাও জামা নেই, সে জন্যও যে বস্তুর প্রয়োজন তা হচ্ছে অর্থ। সুতরাং অর্থের অভাবে কেবলই নিরর্থক মনে হচ্ছে জীবনটা।'

কিন্তু এই হতাশার কাছে শেষ পর্যন্ত অসহায় আত্মসমর্পণ করতে চায় নি সুকান্ত। দারিদ্র্য, নৈরাশ্য, শারীরিক যন্ত্রণার ভিতরও সে অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্মুখীন।—'আমার লেখকসত্তা অভিমান করতে চায়, কর্মীসত্তা চায় আবার উঠে দাঁড়াতে! দুই সত্তার দ্বন্দ্বে কর্মীসত্তাই জয়ী হতে চলেছে; কিন্তু কি করে ভুলি, দেহে আর মনে আমি দুর্বল, একান্ত অসহায় আমি?'

কিন্তু নিজের সঙ্গে লড়ে অল্প দিনের ভিতরই এ দুর্বলতা কাটিয়ে উঠেছিল সুকান্ত। নিজের জীবন-বিশ্বাস ফিরে পেয়েছিল। না হলে মুক্ত বিপ্লবীদের ওকে দেখতে আসার ঘটনাটা এমন উত্তপ্ত আবেগ ও গর্বের সঙ্গে জানাতে পারত না বন্ধু ভুপেনকে—'তবে কাল আমার জীবনে সবথেকে স্মরণীয় দিন গেছে। মুক্ত বিপ্লবীরা সদলবলে (অনন্ত সিং বাদে) সবাই আমাদের এখানে এসেছিলেন। অনুষ্ঠানের পর তাঁরা আমাদের কাছে এলেন আমাকে শুভেচ্ছা জানেতে। বিপ্লবী সুশীল চ্যাটার্জী আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আর একজন বিপ্লবী তাঁর গলার মালা খুলে পরিয়ে দিলেন আমায়। আমি তো আনন্দে মুহ্যমান প্রায়। সত্যি কথা বলতে কি এতখানি গর্বিত কোন দিনও নিজেকে মনে করিনি। ফ্রান্স আর আমেরিকায় আমার জীবনী বেরুবে যেদিন শুনলাম সেদিনও এত সার্থক মনে হয়নি আমার এই রোগজীর্ণ অশিক্ষিত জীবনকে। কাল সন্ধ্যার একটি সন্ধ্যা পরিপূর্ণতায় উপচে পড়েছিল।'

এই আত্মতৃপ্তির ভেতরও কিন্তু পার্টির কথা ভোলেনি সুকান্ত। একই চিঠির শেষ অংশ, 'মেজদার মুখে শুনলাম—তুই নাকি প্রায়ই "স্বাধীনতা" কিনে পড়ছিস? শুনে খুব আনন্দ হল। নিয়মিত "স্বাধীনতা" রাখলে আরো খুশী হবো।'

কতখানি মানসিক জোর থাকলে, বুকে যক্ষ্মার কীট নিয়ে, একটি কিশোরের 'পক্ষে এই আত্মপ্রত্যয় অর্জন করা সম্ভব, ভাবতেও অবাক লাগে।

পার্টির প্রতি, নিজের আদর্শের প্রতি সুকান্তর নিষ্ঠা, ভালবাসা, আনুগত্যের বহু নিদর্শন ছড়িয়ে আছে পত্রগুচ্ছের বিভিন্ন চিঠিতে। আর আছে বন্ধুদের, সহকর্মীদের, আত্মীয় স্বজনদের প্রতি তার দরদ, ভালবাসা, উৎকণ্ঠার প্রমাণ।

এবং সর্বোপরি, জনতার প্রতি তার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। যে বিশ্বাসের কথা মেজ-বৌদির কাছে লেখা চিঠিতে সুকান্ত সগর্বে ঘোষণা করছে—'আর আমি কবি বলে নির্জনতাপ্রিয় হব, আমি কি সেই ধরণের কবি? আমি যে জনতার কবি হতে চাই, জনতা বাদ দিলে আমার চলবে কি করে? তাছাড়া কবির চেয়ে বড় কথা আমি কমিউনিস্ট, কমিউনিস্টদের কাজ-কারবার সব জনতা নিয়েই।'

হয়তো এ ঘোষণায় কিছুটা তারুণ্যের উচ্ছাস আছে। কিন্তু ভুললে চলবে কেন, সুকান্তও বয়সে তরুণই ছিল। সুকান্তর পত্রগুচ্ছ সেই তাজা তারুণ্যেরই এক অনন্য স্বাক্ষর।

আমার চোখে সুকান্তর ছবি

বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী

সুকান্তর কবিতার সঙ্গে যখন আমার পরিচয় ঘটেছিলো, তখন সুকান্ত আর বেঁচে নেই। 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হবার ঠিক কতোদিন পরে সেটি আমার হাতে এসেছিলো সেটাও সঠিক স্মরণ নেই। অন্য কোনো পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সুকান্তর কোনো কবিতা তার আগে, আমার নজরে পড়েছিলো কিনা তাও ঠিকঠিক মনে করতে পারছি না।

সুকান্তর মৃত্যুর পর তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ছাড়পত্র' প্রকাশিত হয়। মাত্র একুশ বছর বয়সে কিশোর কবি সুকান্ত যখন মারা যায়, আমি তখন শৈশব-কৈশোরের সন্ধিক্ষণে। স্কুলের ছাত্র। পাঠ্যপুস্তকের কবিতার বাইরে একমাত্র রবীন্দ্রনাথকেই তখন কবি বলে জানতাম।

যতদূর মনে হয়, পনেরো-ষোল বছর বয়সে সুকান্তর কবিতার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। 'ছাড়পত্র'-র অনেক কবিতাই ১৯৪০ থেকে ১৯৪৬ সালের বিক্ষুব্ধ স্বদেশ তথা বিশ্বযুদ্ধে মত্ত বিশ্বের পটভূমিকায় রচিত। এই প্রসঙ্গে আরো কয়েকটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন। সুকান্ত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলো। এ-কথা আমরা সবাই জানি। সুকান্তও সে-কথা তার লেখায় কোনোদিন গোপন করার কোনো প্রয়োজন অনুভব করে নি, বরং সগর্বে প্রচার করেছে। পার্টির মতাদর্শ, এমনকি নির্দেশ পর্যন্ত তার কবিতার ছত্রে ছত্রে চিহ্নিত। সুকান্তর কবিতা যখন প্রথম পড়ি, আমি তখন নিজেও মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাসী একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত। বলা বাহুল্য সে-দল ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি নয়। তার চেয়েও বড় কথা,

'৪০ থেকে '৪৬ সালের ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির বহু কার্যকলাপেরই ঘোরতর বিরোধী ছিলাম আমি। স্কুলের ছাত্র হিসাবে আশৈশব ছাত্র-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আমার স্মৃতিপটে সে-সব বিরোধ ও সংঘাতের তিক্ত অভিজ্ঞতা তখনো বড় বেশী স্পষ্ট। স্বাভাবিকভাবেই তাই সুকান্তর বেশ কিছু কবিতার সঙ্গেই আমি নিজের সুর মেলাতে পারি নি।

অস্বীকার করার উপায় নেই, তবু সুকান্তকে ভালোবেসেছিলাম মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করছি, সুকান্তর কবিতার চেয়েও সুকান্তকে আমার বেশী ভালো লেগেছিলো। অন্য দলের নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক কর্মীকে যে-কারণে আমরা সকলে শ্রদ্ধা করি, সুকান্তকে সেই কারণেই প্রথমে শ্রদ্ধা করেছিলাম। সুকান্তর সঙ্গে আমার রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্যকে আলোচনার মুখবন্ধে বর্ণনা করার প্রয়োজন আছে। নিজের বিশ্বাস ও আদর্শকে কৌশলে প্রচারের জন্য নয়, আমার চোখে সুকান্তর ছবিকে স্পষ্ট করে তোলার জন্যই এর প্রয়োজন।

সুকান্তর কিছু কবিতার সঙ্গে যেমন আমার মতের অমিল আছে, তেমনি তার অধিকাংশ কবিতার সঙ্গে নিজের মনের মিলও খুঁজে পেয়েছি। কেন এবং কোথায় এ-মিল, সে-সব বোঝার সময় সেদিন ছিলো না। সে-সময় রবীন্দ্র-প্রতিভার সঙ্গে সুকান্ত-প্রতিভার একটা তুলনামূলক আলোচনার হাস্যকর প্রচেষ্টার কথাও শুনেছিলাম। শোনা কথা, কতোদূর সত্য-মিথ্যা জানি না। তবে ইদানীংকালে অনেককেই মাআকোভস্কির সঙ্গে সুকান্তর তুলনা করতে দেখেছি। আমি কিন্তু তাকে কোনদিনই 'অস্ফুট রবীন্দ্রনাথ' কিংবা 'ভারতীয় মাআকোভস্কি' হিসাবে দেখি নি। আমি সুকান্তর কবিতাকে ভালোবেসেছি অতি সরল ও অত্যন্ত সাধারণ কারণে। প্রথম যেদিন 'ছাড়পত্র' পড়ি, সেদিন মনে হয়েছিলো: এই তো সেই কবি যে-কবি আমার কথা

আমার ভাষায় আমার জন্য বলতে পারে। সে-বলা কার মতো কিংবা কার চেয়ে ভালো অথবা মন্দ, সে-হিসাবের হিসাব মেলাতে মন সায় দেয় নি।

সুকান্ত ভাবের ধূসর আকাশে কথার ফুলঝুরি ছড়ায় নি। কাস্তের মতো শানিত তার কবিতা। হাতুড়ির মতো কঠিন তার কবিতা। কারাগারে বিনিদ্র রাতে সুকান্তর কবিতা আমার সঙ্গী হয়েছে। রক্ত-ঝরা ক্ষুধার মিছিলে সুকান্তর কবিতা আমার হাতে হাত রেখেছে।

অতীন্দ্রিয় দার্শনিকতার মোহ থেকে সুকান্তর কবিতা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। সে গোছানো ড্রইং-রুমের সাজানো কবি ছিলো না। 'ধরি মাছ না-ছুঁই পানি'-র অপকৌশলে সে রপ্ত ছিলো না। তার কবিতার বিষয়বস্তুও কথা-কথা খেলার নামান্তর ছিলো না। সুকান্তর কাব্যে রাজনৈতিক স্পষ্টতা অনেকের কাছে অসহ্য। অনেক তথাকথিত 'সখী-কবি'দের কাছেই তার কবিতা 'অপরিণত'। সুকান্তর মৃত্যু হয়েছে প্রায় পঁচিশ বছর আগে। তার সমকালীন ক'জন কবি মৃত্যুর পঁচিশ বছর পরেও বেঁচে আছেন বা থাকবেন? বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে সে-সব 'মৃত-কবি'দের 'মৃত-কবিতা'র মৃত-ইতিহাস হয়তো লিপিবদ্ধ থাকবে। কিন্তু আমার মতো সাধারণ মানুষের চোখে তাঁদের ছবি কোনোদিনই সুকান্তর ছবির মতো উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে না।

সুকান্ত মানুষকে নিয়ে কবিতা লিখেছে, মানুষের জন্য কবিতা লিখেছে, মানুষের নামে কবিতা লিখেছে। ধনবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তার কবিতা আপোসহীন। সুকান্ত সখের সাম্যবাদী ছিলো না। আদর্শের জন্য মৃত্যুপণের ঔদ্ধত্যে উদ্ধত তার কবিতা।

ব্যক্তি-জীবনে সুকান্তর বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা ছিলো। মাতৃহীন সুকান্ত মমতাহীন সংসারে ছিলো অবহেলিত। আর্থিক অনটনে প্রায়ই তার অবস্থা হয়েছে করুণ থেকে করুণতর। কানে কম

শুনতো সে। অঙ্কে কাঁচা সুকান্ত দু-দুবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না-পেরে স্কুলের গণ্ডী কোনোদিন পেরুতে পারে নি। ব্যক্তি-জীবনের এইসব অভাববোধ হয়তো সমষ্টি-জীবনের অভাব, অনাহার আর অনিশ্চয়তাকে তার মনে প্রকট করে তুলেছিলো। কোনো কিছুই পারিপার্শ্বিকতা-বিচ্ছিন্ন নয়। কবি নয়, কবিতাও নয়। কিন্তু সুকান্তর ক্ষোভ শূন্যমার্গ নয়। তার অভিমান একক নয়। স্থির প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত তার বিক্ষোভ। সংগ্রামে বিশ্বাসী সুকান্ত। হতাশায় পথ হারায় নি তার কবিতা। আশায় উদ্বেলিত তার ছন্দ।

সুকান্ত যদি এতো সক্রিয়ভাবে দলীয় আদর্শ ও কাজকর্মে নিজেকে এবং নিজের কবিতাকে যুক্ত না করতো, যদি তার কবিতার অক্ষরে অক্ষরে মালিক আর মজুতদারদের বিরুদ্ধে ঘৃণার আগুন ছড়িয়ে না দিতো, তাহলে হয়তো বাংলার তথাকথিত বিদগ্ধ সমাজে তার সমদার হতো। কিন্তু সুকান্ত সে-লোভের মাথায় পদাঘাত হেনে শোষণ আর শাসনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে। সুকান্ত দগ্ধপ্রায় সমাজের কবি। খেটে-খাওয়া আর খেতে-না-পাওয়া মানুষের বোবা মনের রূপকার সে।

আমার চোখে সুকান্তর ছবিকে আমার চোখ দিয়েই দেখতে চাইছি। সে-দেখাকে কেন্দ্র করে কিছু প্রশ্নও দেখা দিচ্ছে। এ-প্রশ্ন সুকান্তকে ছোটো করে দেখা বা দেখানোর অপচেষ্টা নয়। কিন্তু তবু প্রশ্ন আছে। ছবি আর ছবি দেখার মাঝে প্রশ্নগুলো ছড়িয়ে আছে। সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থেকে, কবিতাকে শ্রমজীবী মানুষের হাতিয়ারে পরিণত করে, একদিকে যেমন বিদগ্ধ সমাজের কাছে সুকান্ত পেয়েছে তাচ্ছিল্য, অন্যদিকে তেমনি বিশেষ রাজনৈতিক মহলে তাকে নিয়ে বড় বেশী হৈ-হল্লাও হয়েছে। অথচ মৃত্যুর পূর্বে এই 'বীর পূজা'-র কিছুটা পেলেও হয়তো সুকান্তকে এতো তাড়াতাড়ি পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হতো না।

সুকান্তর অকাল-মৃত্যু, বিশেষ করে প্রায় বিনা চিকিৎসায় (একেবারে শেষ সময়টুকু ছাড়া) মৃত্যু নিশ্চয়ই বেদনাদায়ক। কিন্তু বেঁচে থাকলে সুকান্ত আরো কতো বড় কবি হতে পারতো—এ অঙ্ক কষাও ভুল। ইতিহাসের প্রবাহমান গতিধারায় অনেক মিছিলের কবিকেই তো আমরা মিছিল থেকে সরে যেতে দেখেছি। অজস্র সম্ভাবনাকে হঠাৎ ফুরিয়ে যেতে দেখেছি। বিপ্লবের বীজমন্ত্রকে শূন্যতার রাহুগ্রাসে আচ্ছন্ন হতে দেখেছি। সমাজতন্ত্রের জন্য সারাজীবন সংগ্রাম করে অবশেষে সমাজতান্ত্রিক শিবিরে পৌঁছে সংগ্রামী কবি মায়াকোভস্কিকে আত্মহননের কলঙ্কে লিপ্ত হতেও দেখেছি।

অনেকেই মনে করতে পারেন যে, আমি বোধহয় এ-সব প্রশ্ন অকারণে ও অবান্তরভাবে উপস্থিত করছি, সুকান্তর বিপ্লবী ভাবমূর্তিকে প্রশ্নের ধূম্রজালে মসীলিপ্ত করার চেষ্টা করছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি আমার চোখে সুকান্তর ছবিটাকে সবদিক থেকে ও সবরকম ভাবে দেখার চেষ্টা করছি মাত্র।

একুশ বছরের একটি কিশোর-মনে অনেক প্রশ্ন, অনেক দ্বন্দ্ব, আবেগ আর উচ্ছ্বাস চাপা থাকে। তবু সুকান্তর মৃত্যুর পর বন্ধুদের কাছে লেখা তার ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের যে-সামান্য অংশ প্রকাশিত হয়েছে—সেখানে দ্বিধা আছে, প্রশ্নও আছে। সুকান্তর প্রতি তার 'পার্টিকর্তাদের' হৃদয়হীন আচরণে সুকান্তকে কি প্রচণ্ড-ভাবেই না বিক্ষুব্ধ হতে দেখেছি। তার মনে 'কবি' ও 'কর্মী'র সংঘাত দেখেছি। সময় পেলে সুকান্তর সংগ্রামী কবিতা আরো শাণিত, আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠার যেমন সম্ভাবনা ছিলো—তেমনি এইসব আত্মদ্বন্দ্বের আরও তীব্র, আরো ভয়াবহ হয়ে ওঠার সুযোগও ছিলো সুকান্ত নিজের সব দ্বন্দ্ব আর প্রশ্নকে চাপা দেবার চেষ্টা করেছে 'আমি কমিউনিস্ট' এই বিশ্বাসে। কিন্তু আজ যদি সুকান্ত বেঁচে থাকতো, তবে কোন্ কমিউনিজম এ সে বিশ্বাসী হতো ? বর্তমানে ত্রিধা-বিভক্ত

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কোন্ অংশে সে নিজের বিশ্বাসকে ন্যস্ত রাখতো? বিপ্লবী সুকান্তকে তার একদা-কমরেডরাই হয়তো আজ 'অতিবিপ্লবী' বা 'প্রতিবিপ্লবী' আখ্যায় ভূষিত করতেন। বেঁচে না-থেকে সুকান্ত আজ যেটুকু পাচ্ছে, বেঁচে থাকলে সে সেটুকু পেতো কিনা সন্দেহ আছে, অন্তত আমার কাছে।

আমার চোখে সুকান্তর ছবি কোন মৃত কবির ছবি নয়। সে-ছবির গলায় কোনো ফুলের মালা নেই। রাজনৈতিক ভুলের পালাগান গাইবার কোন প্রয়োজনও নেই সে-ছবির।

মানুষ আজ চাঁদে পৌঁছে গেছে। তবু আজও 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় / পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি'।

আমার চোখে সুকান্তর ছবি সেই রুটির লড়াইয়ের একজন বিশ্বস্ত সৈনিকের প্রতিচ্ছবি মাত্র। তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। কম তো নয়ই।

সুকান্তর ছাড়পত্র

সুখরঞ্জন চক্রবর্তী

বাংলা কবিতার অসংখ্য গ্রন্থের মেলায় সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা ছাড়পত্র একটি ক্ষীণ কলেবর গ্রন্থমাত্র। কিন্তু ক্ষীণকলেবর গ্রন্থখানি কণ্ঠস্বরে যে কী প্রচণ্ড রকমের সোচ্চার, তা ছাড়পত্রের পাঠকমাত্রেই অকপটে স্বীকার করবেন। মনে হয় ইতিপূর্বে নজরুল ছাড়া অন্য কোন কবির হাত থেকে আমরা এইরকম একটি বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের কাব্যগ্রন্থ লাভ করি নি। নজরুলের সর্বহারার গানের মধ্যে যে সর্বহারা ব্রাত্যদের কলকণ্ঠ প্রথম কূজন করে উঠে তারপর বহুদিন স্তব্ধ ছিল; সুকান্তর ছাড়পত্রের মধ্যে তা আবার মুখর হয়ে উঠল। ছাড়পত্র বাংলা কাব্যের পাঠকের মনোলোকের পরিশীলিত পাঠ্যক্রমে নতুন ভাবনা ও চিন্তার ফসল আমদানী করল। ছাড়পত্র বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে একটি নতুন নাম, একটি নতুন অঙ্গীকার, একটি নতুন ইতিহাস। এই অঙ্গীকার ছাড়পত্রের প্রথম কবিতাটিতেই এক অভ্রান্ত প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সুকান্ত :

> এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান ;
> জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে
> চলে যেতে হবে আমাদের।
> চলে যাব—তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
> প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
> এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি।
> নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।
> অবশেষে সব কাজ সেরে,
> আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
> করে যাব আশীর্বাদ,
> তারপর হব ইতিহাস। (ছাড়পত্র)

ছাড়পত্র এই বিশ্বাসেরই বলিষ্ঠতায় মুখর প্রাণবন্ত। জীর্ণ বর্তমান পেরিয়ে তাই আগামীতে কবি সাফল্যের স্বপ্নে বিশ্বাসী কণ্ঠ মেলে উচ্চারণ করে :

> ক্ষুদ্র আমি তুচ্ছ নই—জানি আমি ভাবী বনস্পতি,
> বৃষ্টির, মাটির রসে পাই আমি তারি তো সম্মতি। (আগামী)

এই বিশ্বাস ছাড়পত্রের সিঁড়ি, লেনিন, খবর, কাশ্মীর-২, সিগারেট, চিল, সেপ্টেম্বর '৪৬, ঐতিহাসিক, শত্রু এক, মৃত্যুঞ্জয়ী গান, কৃষকের গান, আঠারো বছর বয়স ইত্যাদি কবিতার মধ্যেই শনৈঃ শনৈঃ দৃঢ়তর হয়েছে। এই বিশ্বাসের বলেই কবি জেনেছেন যে সর্বহারারা আগামী দিনে সমাজে সকলের সামনে তাদের মাথাকে উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে। সুকান্তর ছাড়পত্রের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এই আশাবাদের বলিষ্ঠ উচ্চারণে। ছাড়পত্র বাংলাসাহিত্যের দীর্ঘকালীন ভাববাদের গুমোট আকাশে বহন করে এনেছে উজ্জ্বল আশাবাদের বাসন্তী বাতাস। কী দীপ্ত প্রত্যয়ে ঘোষণা করেছে :

> পৃথিবী মুক্ত—জনগণ চূড়ান্ত সংক্রামে জয়ী।
> তোমাদের ঘরে আজো অন্ধকার, চোখে আজো স্বপ্ন।
> কিন্তু জানি একদিন সে সকাল আসবেই
> যেইদিন এই খবর পাবে প্রত্যেকের চোখে মুখে
> সকালের আলোয়, ঘাসে ঘাসে, পাতায় পাতায়। (খবর)

কিংবা : মৃত্যুর সমুদ্র শেষ ; পালে লাগে উদ্দাম বাতাস
মুক্তির শ্যামল তীর চোখে পড়ে, আন্দোলিত ঘাস।
(লেনিন)

নতুবা : ক্ষুব্ধ হাওয়ায় উদ্দাম উঁচু কাশ্মীর
কালবোশেখির পতাকা উড়ছে নভে
দুলে দুলে ওঠে ঘুমন্ত হিমালয়
বহু যুগ পরে বুঝি জাগ্রত হবে॥ (কাশ্মীর-২)

ছাড়পত্রের কবি তাঁর বিশ্বাসের দুর্গে আরোহণ করবেন কেবলমাত্র অলীক-কল্পনার ডানায় ভর করে নয়; তার জন্য অনেক সংগ্রাম, অনেক বিপ্লবের প্রয়োজন হবে। কবি তাই স্পষ্টই বলেছেন :

তাই আজ আমারও বিশ্বাস,
"শান্তির ললিতবাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।"
তাই আমি চেয়ে দেখি প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত ঘরে ঘরে
দানবের সাথে সংগ্রামের তরে॥ (রবীন্দ্রনাথের প্রতি)

চারাগাছের মধ্যে কবি লক্ষ্য করেছেন তাই আগামীতে এক মহীরুহ-সম্ভাবনা। লক্ষ্য করেছেন :

মনে হয়, এই সব অস্বাস্থ্য-শিশুর
রক্তের, ঘামের আর চোখের জলের
ধারায় ধারায় জন্ম,
ওরা তাই বিদ্রোহের দূত॥ (চারাগাছ)

কবির এই বিপ্লব-চেতনা, বিদ্রোহী মনোভাব ক্রমশ স্পষ্ট হয়েছে পরবর্তী রচনাগুলিতে। কবি যখন বলেছেন :

অসংখ্য দিন কেটেছে প্রাণের বৃথা রোদনে
নরম সোফায় বিপ্লবী মন উদ্বোধনে;
আজকে কিন্তু জনতা-জোয়ারে দোলে প্লাবন,
নিরন্ন মনে রক্তিম পথ অনুধাবন
করছে পৃথিবী পূর্ব-পন্থা সংশোধনে।
অস্ত্র ধরেছি এখন সমুখে শত্রু চাই,
মহামরণের নিষ্ঠুর ব্রত নিয়েছি তাই;
পৃথিবী জটিল, জটিল মনের সম্ভাষণ
তাদের প্রভাবে রাখি নি মনেতে কোন আসন
ভুল হবে জানি তাদের আজকে মনে করাই॥ (প্রস্তুত)

কিংবা নীচের এই ছত্রগুলি :

কলম ! বিদ্রোহ আজ, ধর্মঘট হোক অবশেষে ;
আর কালো কালি নয়, রক্তে আজ ইতিহাস লিখে
দেওয়ালে দেওয়ালে এঁটে, হে কলম, আনো দিকে দিকে ॥

(কলম)

তারপর এই ছত্রগুলি, কত স্পষ্টভাবে বিদ্রোহের ঘোষণায় মুখর :

আর,
আমার দিন-পঞ্জিকায় আসন্ন হোক
বিস্ফোরণের চরম, পবিত্র তিথি ॥ (আগ্নেয়গিরি)

অতঃপর প্রত্যক্ষেই ঘটলো বিদ্রোহ ঘোষণা :

প্রত্যহ যারা ঘৃণিত ও পদানত,
দেখ আজ তারা সবেগে সমুদ্যত ;
তাদেরই দলের পিছনে আমিও আছি,
তাদের মধ্যে আমিও যে মরি বাঁচি।
তাইতো চলেছি দিনপঞ্জিকা লিখে—
বিদ্রোহ আজ ! বিপ্লব চারিদিকে ॥ (অনুভব ॥ ১৯৪৬)

এই বিদ্রোহের চেতনাই সিগারেট, দেশলাই কাঠি, বিবৃতি, চিল, চট্টগ্রাম : ১৯৪৩, মজুরদের ঝড়, বিবিধ, আঠারো বছর বয়স ও হে মহাজীবন কবিতায় বিভিন্নরূপে রসমূর্তি পরিগ্রহ করেছে। সুকান্তর অগ্রজ কবি নজরুল ইসলামের মধ্যেও আমরা বিদ্রোহের চেতনা দেখেছি। কিন্তু সেখানে কবির বিদ্রোহ ছিল অনেকটাই নিজের সঙ্গে নিজের। আত্মসমীক্ষ-কবি সেখানে তাঁর বিদ্রোহকে কোন সামাজিক প্রয়োজনে বা শ্রেণীসংগ্রামের দিকে পরিচালিত করেছেন বলে মনে করবার কোন সঙ্গত কারণ বোধহয় খুব একটা নেই। কিন্তু ছাড়পত্রের কবিতার মধ্য দিয়েই আমরা বাংলাসাহিত্যে প্রথম সামাজিক বিদ্রোহ ঘোষিত হতে দেখলাম।

ছাড়পত্রের কবির মধ্যে সর্বহারা, ব্যথাহত, হতাশাজর্জর মেহনতী মানুষগুলির জন্য সর্বত্র এক গভীর মমতা স্ফুরিত হয়েছে। খেতে-খামারে, কলে-কারখানায় সেই সব মানুষ দিনরাত পরিশ্রম করে ক্লান্ত, সুকান্ত তাদেরই কবি। তাদের মূক ব্যথা প্রিয়হীন ঘরে বহুকাল নিষ্ফল মাথা ঠুকরে মরবার পর কবি সুকান্তর লেখায় আবার নতুন করে জেগে উঠেছে। যে সব মানুষদের কথা এতকাল আমাদের দেশের লেখকরা লিখতে চাননি বা লেখেননি—সেইসব পংক্তিহীন ব্রাত্যদের কথাই ছাড়পত্রের একাধিক কবিতার বিষয়বস্তু হয়েছে। পুরানো ভাঙা চশমা চোখে ছাপাখানার কম্পোজিটর (খবর), রাস্তার ধারে উলঙ্গ ছেলে (প্রার্থী), একটি অবহেলিত মোরগ (একটি মোরগের কাহিনী), বিপন্ন মজুর (মজুরদের ঝড়), খবরের বোঝা বহনকারী গ্রামের রানার (রানার), উপবাসী কৃষাণ (ফসলের ডাক ১৩৫১), আঠারো বছর বয়সের কিশোর (আঠারো বছর বয়স) ইত্যাদি নিতান্ত অনুল্লেখ্য বিষয়বস্তুকে নিয়ে সব আশ্চর্য কবিতা রচনা করেছেন কিশোর কবি সুকান্ত।

অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ কাকভূষণ্ডী হবার মতন মনোভাব সুকান্তর ছিল। কিন্তু অকাল মৃত্যু তাঁর সেই মনোভাবকে চরিতার্থ করবার সময় দিল না। দিলে যে সুকান্ত আমাদের হতাশ করতেন না, সে প্রতিশ্রুতি আমরা ছাড়পত্রে বেশ স্পষ্ট করেই পেয়েছি বলে আমার ধারণা।

ছাড়পত্রের কবিতাগুলির অধিকাংশই শ্লোগানধর্মী, প্রচারপন্থী—এ অভিযোগ হয়তো অনেকে করে থাকেন। কিন্তু পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত এমন কোন লেখা, বাস্তবিকই কোন লেখক লিখেছেন বলে আমার মনে হয় না, যা কোন-না-কোন মতবাদকে প্রচার না করেছে। বার্ণাডশ' বলেছেন যে, কেবলমাত্র লেখার আনন্দেই যদি তাঁকে লিখতে হতো তবে একছত্রও তিনি লিখতেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু সে কথা আপাততঃ স্থগিত থাক।

ছাড়পত্র শ্রেণীসংগ্রামের মতবাদকে তুলে ধরেছে সত্য, সে জন্য ঘোষণাও করেছে; কিন্তু ছাড়পত্রের কবিতাগুলি কবিতা হয় নি— এমন অপবাদ অন্ততঃ মানতে পারা যায় না! কবিতার যে বিশিষ্ট ধর্ম তা যেদিক থেকেই বলি না কেন, সব দিক থেকেই বিচার করে এ গ্রন্থকে খারিজ করা যায় না। যাঁরা তা' করতে চান করুন। কিন্তু ছাড়পত্র বেঁচে থাকবে, বেঁচে আছে, এবং ক্রমে আরো ঘরে ঘরে তা সমাদরে পুষ্ট হয়ে বারবার নবজীবন লাভ করবে।

সুকান্ত মোটামুটিভাবে রিয়ালিষ্ট কবি হলেও ছাড়পত্রের একাধিক পংক্তিতে রোমান্টিক সুকান্তকে আবিষ্কার করা খুবই সহজ মনে হয়। নীচের এই পংক্তিগুলি লক্ষ্য করা যাক :

(ক) তোমাদের ঘুমের অন্ধকার পথ বেয়ে
খবর-পরীরা এখানে আসে তোমাদের আগে,
তাদের পেয়ে কখনো কণ্ঠে নামে ব্যথা,
কখনো বা আসে গান ;
সকালে দিনের আলোয় যখন তোমাদের কাছে
তারা পৌঁছয়
তখন আমাদের চোখে তাদের ডানা ঝরে গেছে।
(খবর)

(খ) হে সূর্য!
তুমি আমাদের উত্তাপ দিও—
শুনেছি, তুমি এক জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড,
তোমার কাছে উত্তাপ পেয়ে পেয়ে
একদিন হয়তো আমরা প্রত্যেকেই
এক একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হব! (প্রার্থী)

(গ) বুনো পাহাড়ে মৃত্যু-ধোঁয়ার অবগুণ্ঠন
ও কিছু নয় হয়তো নোতুন এক মেঘদূত।
(আগ্নেয়গিরি)

(ঘ) ………………জানি অস্থির

রক্ত, নদীর জল,

নীড়ে পাখী আর সমুদ্র চঞ্চল। (ঠিকানা)

তা ছাড়া কাশ্মীর, চিল, ঐতিহাসিক, বোধন ইত্যাদি কবিতাতে কবির এই রোমান্টিক কবিমনের আভাস মেলে। কিন্তু রোমান্টিকতার সীমাস্বর্গ স্পর্শ করেছে সম্ভবতঃ রানার কবিতাটিই। রানারের এই নীচের ছত্রগুলি কী আশ্চর্য রোমান্টিক :

অবাক রাতের তারারা আকাশে

মিট্ মিট্ করে চায় ঃ

কেমন করে রাণার সবেগে হরিণের মত যায় !

কত গ্রাম, কত পথ যায় সরে সরে

শহরে রাণার যাবেই পৌঁছে ভোরে ;

হাতে লণ্ঠন করে ঠন্‌ঠন্, জোনাকিরা

দেয় আলো

মাভৈঃ, রাণার ! এখনো রাতের কালো (রাণার)

ছাড়পত্রের সুষমা বেড়েছে তা ছাড়া কবির অলঙ্কার প্রয়োগে। কবিতাকে প্রয়োজনীয় অলঙ্কারে শোভিত করে সুকান্ত আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। উপমা, উৎপ্রেক্ষা আর সমাসোক্তি অলঙ্কারের একটি মনোমুগ্ধকর বিপনী হলো ছাড়পত্র। এই অলঙ্কার পরে সুকান্তর কবিতা কোথাও আড়ষ্ট বা পীড়িত নয়। ম্যাথু আর্নল্ড কিশোর কবি শেলীর কবিতা পড়ে বলেছিলে an ineffectual angel beating on his luminlous wings in vain—কিন্তু সুকান্ত দেবদূত নন, মানবসন্তান। ছাড়পত্রের কবিতায় তাঁর অশ্রান্ত পক্ষ বিধুনন কোথাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় নি। আগামী দিনের শ্রেণী-সংগ্রামকে ছাড়পত্রের কবি তাঁর প্রখর ইতিহাস চেতনার দ্বারা বেশ কয়েক ধাপ অগ্রগমন করিয়ে দিয়েছেন।

দারিদ্র্য যে কবিকে মহান করেছে

নীহার দাশগুপ্ত

সুকান্ত সম্পর্কে কিছু না লিখতে হলেই আমি সুখী হতাম। বস্তুতঃ, সুকান্তর মৃত্যুর পর এই দীর্ঘ ২৪ বছর তার সম্বন্ধে আমি এক লাইনও কোথাও লিখিনি। মনের মণি-কোঠায় যে স্মৃতিকে একান্ত-ভাবে ধরে রাখতে ইচ্ছে করে পাঁচজনের কাছে তা প্রকাশ করতে ব্যথা পেতুম।

সুকান্তর উপর আমার অভিমান আকাশস্পর্শী। হাসপাতালে যাবার আগে শ্যামবাজার অঞ্চলে রামধন মিত্র লেনের এক বাড়িতে রোগশয্যায় তার সঙ্গে আমার শেষ দেখা। এক নির্জন দুপুরে ঠিকানা দেখে বাড়িটি খুঁজে নিয়ে বাইরের ঘরে পা দিতেই দেখি বিছানার উপর প্রায় লাফিয়ে উঠে বসেছে সুকান্ত। সারা মুখে সেই পরিচিত মিষ্টি হাসি। মাথাটি দোলাচ্ছিল, যেমন চিরকার দুলিয়ে এসেছে। যেন বলতে চাইছিল: আশ্চর্য, তুমিও তাহলে কথা রাখলে। অনেকক্ষণ ধরে আমরা কথা বলেছিলাম। ওর শরীরের কথা, কবিতার কথা। বিশেষ করে ওর একটা ছড়ার বই ছাপানো সম্বন্ধে কথা। সেই সম্পর্কেই আমি বলেছিলাম: তুমি হাসপাতাল থেকে ফিরে এসো; তারপর ছড়াগুলি বেছে নিয়ে ছাপানোর ব্যবস্থা করব।

সুকান্ত আবার তেমনি মাথা দুলিয়ে হেসেছিল।

আজ মনে হয়, ও বলতে চেয়েছিল: দেখো, কেমন ফিরে আসি।

সুকান্ত আমাকে ফাঁকি দিয়েছিল।

সুকান্তর 'জনযুদ্ধের গান' নামে একটি কবিতা প্রথম আমি পড়ি। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, কবিতাটি তখন আমার একেবারেই ভাল লাগেনি। মিছিলের স্লোগান যদি হঠাৎ কবিতা হয়ে ওঠে, কবিতা হিসাবে স্বভাবতঃই তা ভাল লাগবার কথা নয়। নিতান্তই

অনধিকার চর্চা হিসাবে তখন আমিও কিছু-কিছু কবিতা লিখবার চেষ্টা করেছি, অরণি ইত্যাদি কয়েকটি কাগজে তা প্রকাশিতও হয়েছে। নিজের ব্যক্তিগত অনুভূতিতে যে প্রশ্ন তখন বারবার আমায় ক্লিষ্ট করেছে তা হল, রাজনৈতিক জিজ্ঞাসা যদি জীবন জিজ্ঞাসায় রূপান্তরিত না হয় তাহলে আমি সার্থক রাজনৈতিক কবিতা লিখব কি করে। কবিতার উৎস তো জীবন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, ১৯৩৭ অথবা ১৯৩৮ সাল হবে, আনন্দবাজার পূজা সংখ্যায় সুভাষের একটি কবিতা আমি পড়ি :

জাপ পুষ্পকে জ্বলে ফুলঝুড়ি, জ্বলে হাংকাও,
কমরেড আজ বজ্র কঠিন বন্ধুতা চাও।

বয়সে সুভাষও তখন কিশোর। সেই কিশোরের কবিতা আর এক কিশোর-পাঠককে সেদিন পাগল করে দিয়েছিল। উত্তর-কুড়িতে আমি সেই ধরনের কবিতার স্বপ্ন দেখছিলাম!

এরপর হঠাৎ একদিন সুকান্তর দেখা পেলাম। ভবানী দত্ত লেনের ছাত্র-ফেডারেশন অফিসে বসে আছি। এমন সময়ে আশে-পাশের কয়েকজন ফিসফিসিয়ে বলল ঃ সুকান্ত এসেছে!

তাকিয়ে দেখলাম, এক ভীরু লাজুক কিশোর অত্যন্ত সন্তর্পণে ঘরে ঢুকছে। আস্তে আস্তে এক কোণে চুপচাপ সে বসে রইল।

সুকান্তর সঙ্গে সেদিনই আমার প্রথম আলাপ। অসম্ভব রকমের লাজুক, শান্ত, কথার বিনীত ভঙ্গিতে মনে হচ্ছিল, জ্ঞানে ও গুণে সবাইকেই যেন সে তার চাইতে বড় বলে মনে করে। তার যে কবিতা কিছুদিন আগে আমার কাছে অত্যন্ত স্থূল বলে মনে হয়েছিল, কেন জানিনা তা এক ভিন্নতর ব্যঞ্জনায় ভিন্নতর বোধে আমার কাছে প্রতিভাত হয়ে উঠল। আমার মনে হল, এক ইস্পাত-কঠিন ঋজুতা সমর-সঙ্গীতে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল :

জনগণশক্তির ক্ষয় নেই
ভয় নেই আমাদের ভয় নেই।

সেদিনের সেই আলাপ আরও নিবিড় হোল। তারপর আমরা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। ক্রীক রো-র বাড়ীতে প্রায়ই দুপুর বেলা সে উপস্থিত হতো আমার স্বল্প-অবসরের মুহূর্তে। মাটিতে বিছানো আমার বিছানার পাশে উপুর হয়ে বসে থাকত। চোখ মেলে যখন ওকে দেখতাম, জিজ্ঞাসা করতাম : কখন এলে ?

প্রতিবারই উত্তর দিত : একটু আগে।

আমার জন্য অনেকক্ষণ ধরে বসে আছে—এই কথাটুকু বলে কোনদিনও আমাকে অপ্রস্তুত করতে চায়নি।

কবিতা লেখা থেকে আমি তখন শতহস্ত দূরে। পারতপক্ষে ও পথ মাড়াবোনা বলে ইতিমধ্যেই স্থির করে ফেলেছি। কিন্তু সুকান্ত আমাকে বারে বারেই প্রশ্ন করেছে : তুমি কবিতা লিখবেনা কেন ? অনেকের চাইতেই তুমি ভাল কবিতা লেখো।

সুকান্তকে বারবার আমার সীমাবদ্ধতার কথা বলেছি। বলেছি, যে লেখা একান্তভাবে আমার বলে চিহ্নিত করা যাবেনা, যে কবিতাকে অন্য কোন-কোন কবিতা থেকে আলাদা করা যাবেনা, এক কথায় যে কবিতা অনন্য হবেনা, সে কবিতা লেখার সার্থকতা কি ?

সুকান্ত কি বুঝত জানিনা। তবে মুখের ভাবে বোঝা যেত এ যুক্তি তার মনঃপুত হোত না। ওকে আমি বলতাম : তার চাইতে কবিতা লেখার থেকেও বড় কাজ আমায় করতে দাও। তুমি কবিতা লিখছ, কিন্তু যাদের জন্য লিখছ, তাদের সকলের কাছে তো তোমার সে কবিতা পৌঁছচ্ছেনা। পৌঁছে দেবার সে দায়িত্ব কিছুটা আমাকে পালন করতে দাও। আমি তোমার চারণ হবো! তুমি কবিতা লিখবে। সেই কবিতা আমি হাজারো মানুষের সামনে আবৃত্তি করবো।

একগাল হেসে মাথা দুলিয়েছিল সুকান্ত।

মনে পড়ে, 'লেনিন' কবিতাটি লেখার পর তার একটি 'নকল' সে আমাকে দিয়েছিল। কোন কথা বলেনি। বুঝতে পেরেছিলাম,

সেদিন যে দায়িত্ব ওর কাছ থেকে যেচে নিয়েছিলাম, সেই দায়িত্ব প্রতিপালনেরই নির্দেশনামা এটি।

ট্রাম শ্রমিকদের ইতিহাস সৃষ্টিকারী সুদীর্ঘ ধর্মঘটের শেষদিন। সন্ধ্যায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বিরাট জনসমাবেশ। আজকের দিনের মতো প্যারেড গ্রাউণ্ড-এর লাখো লাখো লোকের জমায়েত তখন হোতনা। বড় বড় সভার জন্য ওয়েলিংটন স্কোয়ার বা শ্রদ্ধানন্দ পার্কই ছিল যথেষ্ট।
ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সেই সমাবেশে পরদিন থেকে ধর্মঘট তুলে নেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। জং-ধরা ট্রামের লাইনের উপর দিয়ে কয়েকমাস পর আবার ট্রাম চলবে কিনা আট হাজার ট্রাম শ্রমিক সেই সমাবেশে তা স্থির করবে। আমাকে বলা হল সভার সুরুতে একটি কবিতা আবৃত্তি করতে।
সভামঞ্চে উঠে দেখলাম সামনে অগুণতি সংগ্রামরুক্ষ প্রতিজ্ঞা-কঠোর মুখ। সত্যিকথা বলতে কি, নিজেকে বুঝি হারিয়ে ফেললাম। মাইকের ভেতর দিয়ে প্রতিধ্বনিত হল আমার গলা: 'লেনিন ভেঙ্গেছে রুশে জনস্রোতে অন্যায়ের বাঁধ'। বেশ অনুভব করছি, সামনে দশহাজার মানুষের সমুদ্র স্তব্ধ ও নিঃশব্দ। তারপর শেষে যখন আমার সমস্ত আবেগ ফেটে চৌচির হয়ে দশহাজারের সমাবেশে একটি ঘোষণার মতো উচ্চারিত হলঃ 'মনে হয় আমিই লেনিন', তখন দশহাজার লোকের বিপুল অভিনন্দনে আমি অভিভূত। মঞ্চে ছিলেন প্রখ্যাত-নেতা নৃপেন চক্রবর্তী। উচ্ছ্বসিত হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, দশহাজার মেহনতী মানুষের কাছে কী প্রতিশ্রুতি তুমি দিয়ে গেলে, মনে রেখো। কিন্তু এ প্রতিশ্রুতি তো আমার নয়। এই প্রতিশ্রুতিতে যে আবদ্ধ, এই দশহাজার মানুষের ভীড়ে সেও তো আছে। মঞ্চ থেকে নেমে আমি তখন সুকান্তকে খুঁজছি। লোকের ভীড় পেরিয়ে পার্কের একান্তে সুকান্তকে পেলাম। মুখে

সেই হাসি আর মাথা দোলানো। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের অস্পষ্ট আলোয় সুকান্তর চোখের দিকে তাকালাম। সে চোখে লেনিনের স্বপ্নকেই যেন আমি প্রত্যক্ষ করলাম।

মনে পড়ে 'রানার' কবিতাটি লেখবার পর ছেচল্লিশ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রীটের প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের সভায় সুকান্ত সেটি পাঠ করেছিল। সুকান্তর কাছে সে এক অগ্নিপরীক্ষা। সে কোনদিনই নায়ক হতে চায়নি, নিজেকে জাহির করায় তার ছিল অপরিসীম লজ্জা। অনন্য হতে তার ছিল ভয়ানক আপত্তি। সে ছিল তার 'অনুভব' কবিতার পংক্তি দুটির মতো :

তাদেরই দলের পিছনে আমিও আছে,
তাদেরই মধ্যে আমিও যে মরি-বাঁচি।

তবুও সুকান্তকে পড়তে হয়েছিল তার সদ্য-রচিত 'রানার' কবিতাটি। আজও মনে পড়ে নরম ভীরু গলায় সেই কবিতাপাঠ কী উন্মাদনাময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। সুকান্তর সেই ছন্দোময় কণ্ঠ এখনও আমার কানে লেগে আছে :

এর দুঃখের চিঠি পড়বেনা জানি কেউ কোনোদিনও,
এর জীবনের দুঃখ কেবল জানবে পথের তৃণ,
এর দুঃখের কথা জানাবেনা কেউ শহরে ও গ্রামে,
এর কথা ঢাকা পড়ে থাকবেই কালো রাত্রির খামে।
... ...
রানার! রানার! কি হবে এ বোঝা বয়ে?
কি হবে ক্ষুধার ক্লান্তিতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে?
... ...
রানার! গ্রামের রানার!
সময় হয়েছে নতুন খবর আনার;

সুকান্তরও ব্যক্তিগত জীবনে দুঃখের অন্ত ছিলনা। কিন্তু ওই

কিশোর বয়সেই তার ব্যক্তিগত দুঃখকে লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত মানুষের দুঃখের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল। তাই চরম দুঃখেও সে কোনদিন ভেঙে পড়েনি, জীবন সম্বন্ধে হতাশ হয়নি। তার ওই কোমল হৃদয়ে বজ্রের মতো কঠিন এক শপথকে সে আজীবন লালন করে গিয়েছে। সে শপথ হল দেশের সমস্ত নিঃস্ব মানুষের দুঃখকে দূর করার শপথ। এই শানিত শপথেরই প্রকাশ তার কবিতার প্রতিটি ছত্রে। অনেক দুঃখে তাকে বলতে হয়েছে : 'এ দেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম।' কিন্তু সেই পদাঘাতের লাঞ্ছনাকেই জীবনের একমাত্র পাওনা বলে সে মেনে নেয়নি ; পরমুহূর্তেই সগর্বে সে ঘোষণা করেছে :

বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে
আমি যাই তারি দিন-পঞ্জিকা লিখে।

নতুন খবর আনার দায়িত্ব সে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিল। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সেই দায়িত্ব থেকে সে বিচ্যুত হয়নি।

আশ্চর্য, দলমতনির্বিশেষে সমস্ত মানুষের অকাতর স্নেহ সুকান্ত পেয়েছে। অথচ, দুঃখের বিষয় সেই স্নেহ তার মুখে ক্ষুধার অন্ন তুলে দিতে পারেনি, তার দুরারোগ্য ব্যধি দূর করতে পারেনি। বাংলা-দেশের সবচাইতে প্রতিশ্রুতিবান কবিকে যে প্রায় শৈশব-মৃত্যু বরণ করতে হল তার পাপ সকলের, বিশেষ করে আমাদের, যারা তার খুব কাছাকাছি ছিলাম বলে আজ সোচ্চার দাবী করছি।

লেনিন ভূমিষ্ঠ রক্তে   হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

তের শ' পঞ্চাশের প্রথম দিনে, জানি না শুভ না অশুভ পয়লা বৈশাখে—তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। ভারত সভা হলে কিশোর বাহিনীর সভা। সেই আমার কিশোর বাহিনীর সভায় প্রথম উপস্থিতি। কেন জানি না ক্লাস টেন-এ পড়া আমাকেই সেদিনের সভার সভাপতি করা হয়েছিল। ঐ সভার আর কিছু আজ আর আমার মনে নেই, শুধু মনে আছে ছু'জনের কথা। সভার শেষে একজনের দাক্ষিণ্যে আমাদের সমস্ত কিশোরদের সেদিন মধুরেণ সমাপয়েৎ ঘটেছিল। তাঁর কথা মনে থাকাই স্বাভাবিক। তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের তৎকালীন কাউন্সিলার সোমনাথ লাহিড়ী; আর একজন অতি ধীরভাষী, কোটরে বসা চোখ, শীর্ণ চেহারা, চোখে মুখে অস্বাস্থ্যের ছাপ কিন্তু ক্লীবতার চিহ্ন মাত্র বর্জিত বিপ্লব স্পন্দিত প্রায় আমারই সমবয়স্ক সুকান্ত।

সভার শেষে সে-ই এসে আলাপ করল আমার সঙ্গে। 'যে আমাকে কাছে টানে তাকে কাছে টানি'—সেই বয়স তখন আমাদের ছু'জনের। আলাপ নিবিড় হতে তাই দেরী হয়নি। তবে বন্ধুত্ব হয়েছিল এ দাবী করব না। কারণ, বাংলা দেশের ছুর্ভিক্ষে হয়ত কিছুদিন একসঙ্গে কাজ করেছি, ১৯৪৬ সালের রাষ্ট্রবিপ্লবে হয়ত কিছু অংশও নিয়েছি একসঙ্গে। সুকান্তর মৃত্যুদিনে কাশী মিত্র ঘাটের শ্মশানেও উপস্থিত থেকেছি, কিন্তু সুকান্তর উৎসবে ব্যসনে আমার কোন অংশ নেওয়া হয়ে ওঠেনি।

১৯৪৫ সালের শেষদিক পর্যন্ত আমি ছিলাম নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অন্ধ ভক্ত, আর আমাদের আলাপের প্রথম দিন থেকেই সুকান্ত ছিল কমিউনিস্ট—আচারে ও বিশ্বাসে। লেনিন তার রক্তে

ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। মার্কসবাদ লেনিনবাদ তথা এদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে বাদ দিয়ে সুকান্তকে ভাববার কোন সুযোগই তাই আমার হয়নি। বোধ হয় কমিউনিস্ট আন্দোলনকে বাদ দিয়ে সুকান্তকে ভাবাই যায় না, যেমন গোর্কিকে ভাবা যায় না রুশ বিপ্লবকে বাদ দিয়ে।

প্রথম দিকে আমাদের পথের ও মতের তফাৎ ছিল অনেক। কিন্তু আমাদের পরস্পর সম্পর্কে সেজন্য শ্রদ্ধার অভাব ছিল না। তারপর তার পথের সঙ্গে যখন আমার পথেরও মিল ঘটেছিল আরো কাছাকাছি আসতে দেরী হয়নি আমাদের।

১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরে 'স্বাধীনতা' পত্রিকা প্রকাশের পর সুকান্ত দায়িত্ব নিয়েছিল কিশোর পাতার। প্রিয় পার্টির পত্রিকায় এ কাজটি যে তার কাছে কতটা বাঞ্ছিত ছিল সে বিষয়ে আমার মনে কোন অস্পষ্টতা নেই। খুবই শান্তভাবে কথা বলত সে। একদিন সেই রকমই শান্তভাবে আমাকে বলল, খবরের কাগজে কেন কাজ করি জানো? খবর-পরীরা আমাদের কাছে সব থেকে আগে আসে। আর সবাই যখন ঘুমে অচেতন আমরা যে তখনই খবর পাই: পৃথিবী মুক্ত, জনগণ চূড়ান্ত সংগ্রামে জয়ী।

এর কিছুদিনের মধ্যেই বোধহয় 'খবর' কবিতাটা সুকান্ত লিখেছিল। 'স্বাধীনতা'র কাজে সুকান্তর এই চরিতার্থ রূপটা আমাকে এত আনন্দ দিত যে আমারও সাংবাদিক হতে ইচ্ছা করত।

সুকান্ত ডেকার্স লেনের 'স্বাধীনতা' অফিসে কাজ করত। আমরা ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা 'বন্দীমুক্তি' আন্দোলন নিয়ে মেতে উঠেছি। আমাদের দেখা-শোনাও কমে এসেছে। একদিন সুকান্ত এসে হাজির হল ছাত্র ফেডারেশন অফিসে। একে একে প্রায় সবাই যখন বিদায় নিয়েছে, চিরকালীন লাজুক ছেলেটি পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে বলল, একটা কবিতা লিখেছি, দেখো তো

তোমাদের এটা কাজে লাগে কিনা! তারপর খুব আস্তে আস্তে শোনাল :

কত যুগ কত বর্ষান্তের শেষে
জনতার মুখে ফোটে বিদ্যুৎবাণী—
আকাশে মেঘের তাড়াহুড়ো দিকে দিকে
বজ্রের কানাকানি।

পঁচিশ বছর পার হয়ে গেছে তারপর। আমার স্মৃতি প্রবল নয়। তবু আজো বোধ হয় সম্পূর্ণ কবিতাটাই স্মৃতি থেকে উদ্ধার করতে পারি। এমনিভাবেই উদ্দীপ্ত করত সুকান্ত আমাদের। সুধী সমালোচকরা বিচার করবেন, সুকান্ত সমকালের না চিরকালের, সুকান্ত প্রথম সারির কবিদের একজন না আধুনিক যুগের কবিদের প্রথম জন, একই কবিতার মধ্যে ছন্দের পরিবর্তন—তার ছন্দ বোধের অভাব না প্রচলিত থেকে শৃঙ্খল মুক্তি—আমাদের কাছে ওসব কোন প্রশ্ন হয়েই উঠতে পারেনি। আমরা যারা আন্দোলনের অংশী ছিলাম, তারা বুঝতাম, সুকান্ত আমাদের। আমাদের কাছে অপরিহার্য—ওকে না হলে আমাদের সব আয়োজন অসফল হয়ে যায়।

নিজের প্রতিভার ওপর ভরসার অভাব থেকে নয়, বৈষ্ণব সুলভ নম্রতায় সুকান্ত কিছুতেই নিজেকে প্রকাশ্যে আনতে চাইত না। মনে আছে, বলেছিলাম তাকে একটু রুষ্টভাবে, 'এতক্ষণ এতজন অফিসে ছিল তুমি কেন পড়লে না এমন কবিতা তাদের সামনে?' খুশীর সুরেই সুকান্ত বলেছিল, 'না, না, ছোড়দা বলেছিলেন বন্দীমুক্তির ওপর একটা কবিতা লিখতে। তাই লিখেছি। কেমন হয়েছে না জেনে কি করে পড়ি বলো তো।'

সুকান্তর কথা বলতে গেলেই অনিবার্যভাবে এই 'ছোড়দা' অর্থাৎ বাংলাদেশের তৎকালীন অনন্য ছাত্র-নেতা অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্যের কথা এসে যায়। সুকান্তর যাঁরা জীবনীকার বা সুকান্ত-প্রতিভার

যাঁরা ভাষ্যকার তাঁরা এঁর কথা উল্লেখ করবেন কিনা জানি না। ছাত্র আন্দোলনে আর কোন স্থায়ী অবদান যদি তিনি না-ও রেখে থাকেন সুকান্ত-প্রতিভার উন্মোচনের জন্য আমি তাঁর কাছে চিরঋণী হয়েই থাকব। আমার তো মনে হয়, অন্নদাশঙ্করের সাহচর্য না পেলে সুকান্ত-প্রতিভার অনেক ফুলই ফুটে উঠত না। কবি বিহারীলালকে বলা হয় রবীন্দ্রনাথের গুরু। অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য কবি নন। কিন্তু এই পঁচিশ বছর পরেও আমার মনে হয় ঐ বেঁটে-খাটো ছোট মানুষটি একাধারে সুকান্তর ফ্রেণ্ড, ফিলজফার ও গাইড ছিলেন। শুধু ঐ একটি কবিতার ক্ষেত্রে নয়, যখনই আমি সুকান্তকে 'ছোড়দা'র সান্নিধ্যে দেখেছি আমার মন আনন্দে নেচে উঠত। আমি জানতাম, সুকান্তর আর একটি অভিনব সৃষ্টি আসন্ন। অন্নদাশঙ্করের সংস্পর্শ মাত্রেই সুকান্তর প্রতিভা-নীহারিকা থেকে এক-একটি বিরাট নক্ষত্র রূপ লাভ করত। ২৫শে বৈশাখ বা ২২শে শ্রাবণের (আজ আর ঠিক মনে নেই) জনযুদ্ধে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে নিবেদিত সুকান্তর 'হে মহামানব' কবিতাটির সৃষ্টি হয় একইভাবে।

গদ্যময় পৃথিবীর ক্ষুধা, অনাহারপুষ্ট সুকান্তের দেহে কালব্যাধির সৃষ্টি করেছিল। যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে তাকে দেখতে গেলে সে খুব খুশী হত। রংপুর সম্মেলনের পর তাকে একটা কলম উপহার দিয়েছিল ছাত্র ফেডারেশনের বন্ধুরা। তুচ্ছ উপহারকে এমন আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছিল সে যে আমরা ধন্য বোধ করেছিলাম।

যাদবপুর হাসপাতালে তাকে মাঝে মাঝে দেখে এসেছি। লাজুক সুকান্ত কিন্তু কোনদিন বলেও নি যে তার প্রথম কবিতার বই ছাপা চলছে।

মৃত্যুর তিন-চারদিন আগে তাকে শেষ দেখি। কলকাতায় তখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছে। ভয়ানক অসুস্থ। জীবনে কোন কিছু চাইতে তাকে এই প্রথম দেখেছিলাম। বলল; 'কাল রাতে

খাট থেকে পড়ে গিয়েছিলাম। সারারাত ঘুমোতে পারিনি। গরমে বড় কষ্ট হয়। দম নিতে পারি না। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। একটা টেবিল-পাখা জোগাড় করে দিতে পার?'

টেবিল-পাখা নিয়ে যেতে পারিনি। সুকান্তর সঙ্গে আর দেখাও হয়নি। যে বনস্পতি আগামী দিনে সকলকে ছায়া দিতে চেয়েছিল, দিতে চেয়েছিল আন্দোলিত শাখার বাতাস, তার এই শেষ ইচ্ছাটুকু কেউ পূর্ণ করেছিলেন কিনা জানি না। আমি পারিনি। এ অক্ষমতা আমাকে আজও পীড়া দেয়।

পনের বছর বয়সেই সুকান্ত আঠারো বছর বয়সের স্বপ্ন দেখত— যে বয়স পথ চলতে থেমে যায় না। সেই আঠারো বছর বয়সের পরেই সুকান্ত চলে গেল। তারপর দীর্ঘ অবিশ্বাসী পঁচিশটা বছর ধীরে ধীরে অনেক পদচিহ্ন মুছে দিয়ে গেছে। সুকান্তকে এখন আমার মনে পড়ে কখনও মাসান্তে, কখনও বৎসরান্তে। কিন্তু সুকান্তর ভাষাতেই শেষ কথাটা বলে নিই:

এখনো প্রাণের স্তরে স্তরে
তোমার দানের মাটি সোনার ফসল তুলে ধরে
এখনো স্বগত ভাবাবেগে
মনের গভীর অন্ধকারে তোমার সৃষ্টিরা থাকে জেগে।

তেরশো তেত্রিশে যার জন্ম, তেরশো আটচল্লিশে তার বয়স তো মাত্র পনেরো। ভাবতে অবাক লাগে, সুকান্ত এ-বয়সেই 'সূর্যপ্রণাম' লিখেছে! রবীন্দ্র-রচনার গভীরে অবগাহন না-হলে যে-লেখা আদৌ সম্ভব নয়।

'সূর্যপ্রণাম'কে কি বলবো, সঙ্গীতালেখ্য? যাই বলিনা কেন, কাব্য তো বটেই। সুকান্তর 'অভিযান' ও 'সূর্যপ্রণাম' একত্রে গ্রথিত হয়েছে একটি গ্রন্থে—কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকায় যাকে কাব্যগ্রন্থ বলেই উল্লেখ করা হয়েছে।

'সূর্যপ্রণাম'-এর দু'টি পর্ব: উদয়াচল ও অস্তাচল। দু'টি পর্বে রবীন্দ্র-জীবনের সমগ্রতাকে যেন উপলব্ধির স্তরে আনা হয়েছে—কবিতা ও গানের সুন্দর মালা গেঁথে।

রবীন্দ্রনাথ সূর্যের মতই। 'পূর্বসাগরের পার হতে ভুবন-মোহন আলো'র স্পর্শে সহস্র সূর্যমুখীকে বিকশিত করে, সূর্যের মতই রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। অবিরাম আলোকসম্পাত করে, বেলাশেষে অস্ত-দিগন্তের পথে সূর্যের মতই তাঁর মহৎ প্রয়াণ। মুগ্ধ এক কবি-কিশোর তার প্রাণের প্রণতি জানিয়েছে সূর্যের মত ভাস্বর এই মহাজীবনের জ্যোতির্ময় যাত্রাপথের উদ্দেশ্যে।

সুকান্ত সেই ভাবী বনস্পতি—ঐতিহ্যের উর্বর মাটিতে শিকড় সঞ্চারিত করে যার পুষ্টি, বৃদ্ধি ও বিস্তার দ্রুততর হচ্ছিল। 'অভিযান'-এর ভূমিকায় যথার্থ কারণেই বলা হয়েছে—'অনুরাগী পাঠকেরা এই কাব্যগ্রন্থে সুকান্তের ক্রমপরিণতির ধারা খুঁজে পাবেন।'

'সূর্যপ্রণাম'-এর কবিতা ও গানের ভাষা-ভঙ্গী পাঠককে রীতিমত বিস্মিত করবে। গদ্য-কবিতাগুলি পড়তে পড়তে কখনো কখনো মনে

হবে যেন রবীন্দ্রনাথের কবিতাই পড়ছি। কিন্তু অক্ষম অনুকরণের আড়ষ্টতা তিলমাত্র কোথাও নেই, বরং সশ্রদ্ধ অনুসরণের গুণে প্রতিটি পঙ্‌ক্তি, প্রতিটি শব্দ যেন 'সূর্যপ্রণাম'-এর উপযুক্তই হয়েছে। নিপুণ শব্দচয়নে, শব্দের আশ্চর্য ধ্বনিতরঙ্গে প্রকাশভঙ্গী যেন এক ভাবগম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণ হয়ে উঠেছে।

সুকান্ত রবীন্দ্রনাথ থেকেই সুরু করেছে। আর, একথাও নির্দ্বিধায় বলা যায়—রবীন্দ্রনাথ থেকেই বাংলা কবিতার আধুনিকতার সুরু। 'সূর্যপ্রণাম' রচনাকালে, সুকান্তর সেই প্রথম কৈশোরে, রবীন্দ্রপ্রভাব তার নির্মীয়মান কাব্য-সৌধের ভিত্তিভূমি গঠনে সাহায্য করেছে। তিরিশের কবিরা বাংলা কবিতার আঙ্গিক-প্রকরণ নিয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু করেছিলেন, তাতে শীতলতাবর্জিত কাব্যশরীর কঠিন ও জটিল হয়ে সাধারণ পাঠকের নাগালের বাইরে চলে যাওয়ায়, আধুনিক বাংলা কবিতাকে যেন নির্বাসনদণ্ডই দেওয়া হয়েছিলো। সুকান্ত যদিও সম্ভাবনা, তবু আধুনিক কবিতাকে দুর্বোধ্যতা ও জটিলতা থেকে সে মুক্ত করেছে। এবং যোগ্য উত্তরসাধকের মতো রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেও বাংলা কাব্যে সে স্বকীয়তার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছে।

'সূর্যপ্রণাম'-এর কোনো কোনো অংশে ছাড়পত্রের কবিকণ্ঠস্বর পাঠককে চমকিত করবে। যেমন :

> বিশ্বের অজ শান্তিতে অনাসক্তি,
> সভ্য মানুষ যোদ্ধা,
> চলেছে যখন বিপুল রক্তারক্তি
> তোমারে জানাই শ্রদ্ধা।

রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে, সেই বয়সেও জীবন ও জগৎ থেকে মুখ ফেরায়নি সুকান্ত। তখন তার চেতনার দিগন্তরেখায় যে অস্ফুট আলোর উদ্ভাস, অতিভক্তির আতিশয্যে তা এতটুকু ম্লান হতে পারেনি।

অস্তাচলপর্বের 'আয়োজন' শীর্ষক বর্ণনায় সুকান্ত বলেছে :

দেউলের ফাটল

দিয়ে কোন্ অশত্থ-তরু চাইবে আকাশ, চাইবে তোমার
মন্দিরে তার প্রতিষ্ঠা, জানিনা। তবু একদিন তা
সম্ভব, তুমিও জানো।'

সুকান্ত-প্রতিভা রবীন্দ্র-পরবর্তীকালের সেই অশত্থ-তরুর সম্ভাবনা, ক্ষয়িষ্ণু সমাজ-ব্যবস্থার ফাটল দিয়ে যে শিশুতরুটি অবারিত আকাশের স্বপ্ন দেখেছিল।

'সূর্যপ্রণাম'-এ গান আছে। একালের আধুনিক কবিরা গান লেখেন না। সুকান্ত বেঁচে থাকলে হয়তো লিখতো। রবীন্দ্রসঙ্গীত সুকান্তর খুবই প্রিয় ছিল। 'সূর্যপ্রণাম'-এর জন্য গান লিখতে গিয়ে সে রবীন্দ্রনাথকেই অনুসরণ করেছে। গানের কথাগুলিতে, যতদূর মনে হয়, সুরারোপ করা হলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মতই মনে হবে। অকালমৃত্যু সুকান্তকে ছিনিয়ে না-নিলে, সে হয়তো ভালো গীতিকার হতে পারতো। সুকান্ত-প্রতিভার অজস্র সম্ভাবনার এও একটা দিক।

সুকান্তর 'অভিযান' একখানি ক্ষুদ্র নাটিকা। রূপকনাট্য বলা যেতে পারে। তেরশো পঞ্চাশে এখানি লেখা হয়েছে।

বাংলাদেশের মহামন্বন্তরের কাল সেই তেরশো পঞ্চাশ। 'চালের সারিতে দুর্ভিক্ষে' যখন সুকান্তরও বসন্ত কাটছে। 'অভিযান'-এ সেই কালের কথাই রূপকের আশ্রয়ে বলা হয়েছে।

বৈজয়ন্তীনগর। আর্ত-ত্রাণের আকুল আহ্বান নিয়ে দ্বারে দ্বারে বিবেক জাগ্রত করে ফিরছে বিদেশিনী সংকলিতা। দুর্ভিক্ষের মর্মস্পর্শী বর্ণনা তার সংলাপে :

লাখে লাখে তারা আজ পথের দু'ধার থেকে
মৃত্যু-দলিত শবে পথকে ফেলেছে ঢেকে।
চাষী ভুলে গেছে চাষ মা তার ভুলেছে স্নেহ,
কুটিরে কুটিরে জমে গলিত মৃতের দেহ;

উজাড় নগর গ্রাম কোথাও জ্বলে না বাতি,
হাজার শিশুরা মরে, দেশের আগামী জাতি।

সংকলিতার আহ্বানে ছেলের দল সাড়া দিয়ে বলেছে :

শোনো শোনো বিদেশের কন্যা,
ব্যাধি দুর্ভিক্ষের বন্যা
আমরাই প্রাণ দিয়ে বাঁধবো—
তোমাদের কান্নায় আমরাও
যোগ দিয়ে কাঁদবো।

কিন্তু এমন সময় বাঁকা তলোয়ার হাতে রাজ্যের কোতোয়ালের আবির্ভাব। দুর্ভিক্ষসৃষ্টিকারী শোষকশ্রেণীর রক্ষাকারী সে। দেশের জাগ্রত তারুণ্যশক্তিকে তাই সে ভয় করে। রাজদূতের মারফৎ রাজার কানে খবর গেল। রাজা এলো, তার পিছনে এলো ধনিক-বণিক সমাজের প্রতিনিধি কুবের শেঠ। কিশোর-কবির চোখে তাদের শ্রেণী-চরিত্র চমৎকার ধরা পড়েছে। বিভ্রান্ত ও অসহায় রাজা দুর্ভিক্ষ-নিবারণের ভার দিল কুবের শেঠকেই। যে কুবের শেঠদের লোভ ও লালসা থেকেই দুর্ভিক্ষের জন্ম। তখন কোতোয়ালকে লক্ষ্য করে ইন্দ্রসেনের শ্লেষোক্তি :

বাঘকে দেওয়া হলো ছাগ পালনের ভার,
কোতোয়াল হে! তোমাদের যে ব্যাপার চমৎকার!

'নগরে এসেছে অদ্ভুত মেয়ে' সংকলিতা। তার প্রাণের ছোঁয়া লেগে জেগে উঠেছে প্রজাপুঞ্জ; 'সহসা ক্ষিপ্ত হয়ে' রাজপ্রাসাদের পাশে তারা আজ ভীড় করেছে। সপারিষদ রাজা তাই ভীত সন্ত্রস্ত। নগরীর রাজপথে কোতোয়ালকে তবু আস্ফালন করতে দেখে সংকলিতা তীব্র ভাষায় তাকে ভর্ৎসনা করে :

দারিদ্রের রক্ত করে শোষণ
বিরাট অহংকারকে করো পোষণ

তুমি পশু, পাষণ্ড, বর্বর
অত্যাচারী, তোমার ও হাত কাঁপেনা থরথর !

এই ভর্ৎসনা কোতোয়াল সহ্য করতে পারেনা, সংকলিতাকে সে হত্যা করে।

অপরূপকান্তি এক কন্যাকে তখন বরণ করতে এসেছে জনতার মিছিল :

দেশে আজ জাগরণ সঙ্গীতে
আমরা যে উৎসুক তাকে ঘরে নিতে।

কিন্তু হায়! সংকলিতার প্রাণহীন দেহ তখন পড়ে আছে পথের ধূলায়। মৃত্যুকে জয় করে সে তখন বিজয়িনী;—প্রাণ দিয়ে অযুত প্রাণকে তখন জাগিয়ে দিয়েছে।

জনতার আদালতে অভিযুক্ত হয় কোতোয়াল :

কল্যাণীকে হেনে আজ তোর আর
পৃথিবীতে বাঁচবার নেই অধিকার।

বজ্রকণ্ঠে প্রজাদল রায় ঘোষণা করে :

চলবে না অন্যায়, খাটবে না ফন্দি,
আমাদের আদালতে তুই আজ বন্দী।

সুকান্ত 'অভিযান' রচনা করেছে 'সূর্যপ্রণাম'-এর পরে। সমসাময়িক কাল সম্বন্ধে তার যে চেতনা, তা প্রখরতর হচ্ছে এ সময়ে। একটা সুস্পষ্ট আদর্শবোধ ও বলিষ্ঠ ভাবধারার প্রতিফলন ঘটেছে 'অভিযান'-এ। সঙ্গে সঙ্গে তার কবিতার বহিরঙ্গেও যে দ্রুত পরিবর্তন আসছিল, অনুসন্ধিৎসু পাঠক সাগ্রহে তা লক্ষ্য করবেন।

সুকান্তর 'আগামী' কবিতা ও একাত্মবোধ

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

নিতান্ত ব্যক্তিগত ভালো-লাগা বোধ আছে বলেই আমাদের মতো সাধারণ পাঠক, যদিও অতীব সাধু পাঠক সন্দেহ নেই, কোন কবি বা তাঁর কাব্য সম্পর্কে নিজের মতামত প্রকাশে এমন দুঃসাহসী হতে পারে। কারণ কাব্যবিচারে নানা কঠিন যে সব বিচারদণ্ড তাদের মানে কোন কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব বা উৎকর্ষতা বিষয়ে কিছু বলতে পারা অত্যবশ্যই পণ্ডিত পাঠক বা সাহিত্যের সেই বিশেষ ধুরন্ধর পাঠক, যাঁর নাম সমালোচক, তাঁরই কাজ। খুশিমতো ভালো-লাগা বা নেহাতই খুশিমতো তেমনটি না-লাগা, সাহিত্য সম্পর্কে এমন সোজা সরল সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমালোচক রাজী হবেন না। তৎসত্ত্বেও সাহিত্যে এই ব্যক্তিগত ভালো-লাগা বোধ ছিল, আছে আর থাকবেও। সাহিত্যের সেই কমন্ রিডার তার মতামত জাহির করবেই, এবং করবে একেবারে আপন ভালো-লাগা বোধের ভিত্তিতে। আর এই ভালো-লাগার পেছনে কোন association কাজ করে। যেমন কোন কবির কোন প্রিয় উল্লেখযোগ্য চিত্রকল্পের সার্থকতার সঙ্গে এই associationকে যুক্ত করা যায়, তেমনই কোন সাধারণ পাঠকের নিতান্ত ব্যক্তিগত ভালো-লাগা বোধের পিছনেও সেই association সম্ভবত, অনেক সময়েই।

সুকান্ত ভট্টাচার্যের কোন বিশেষ একটি কবিতা ভালো-লাগার ব্যাপারে আমার ক্ষেত্রে এমনটাই হয়েছিল, আমি অন্তত মনে করি। যা ঘটেছিল তা এ রকম।

সুকান্ত ভট্চাজের মৃত্যুর খবর পেয়েছিলাম যেদিন, তার পরদিন সকালে এক কপি 'স্বাধীনতা' সংগ্রহের জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলাম।

যোগাড় করার পর কাগজ হাতে নিয়ে চোখ রেখেছি স্বভাবতই প্রথম পৃষ্ঠায়। এবং সেই পৃষ্ঠায় সর্বাগ্রে চোখে পড়েছে সুকান্তর মুখ—সুকান্তর অন্তিম নিদ্রার হৃদয়দীর্ণ ছবি। সেদিনের না তারপর 'স্বাধীনতা'র কোন বিশেষ সংখ্যায় (সুকান্ত সম্পর্কেই) শেষ পৃষ্ঠায় এরপরেই পড়েছিলাম অপ্রকাশিত 'আগামী' কবিতা ; সুকান্তর চোখ-বোজা মুখ আর তার অপ্রকাশিত কবিতা, যার সুরুতেই আছে

জড় নই, মৃত নই, নই অন্ধকারের খনিজ,
আমি তো জীবন্ত-প্রাণ, আমি এক অঙ্কুরিত বীজ

আমায় সেই থেকে বহুদিন 'আগামী' কবিতাটি নানাভাবে ভাবিয়েছে। আমার নিতান্ত ব্যক্তিগত ভালো-লাগার অনেক কিছুর তালিকায় সুকান্তর 'আগামী' কবিতার নামও তাই একদিন নিজেরই আজ্ঞাতে উঠেছে। 'স্বাধীনতা'র সেই বিশেষ সংখ্যাখানা হারিয়ে গেছে, কিন্তু সুকান্তর শেষ-নিদ্রার মস্ত ফটোখানা আমি স্মৃতি থেকে reprint করতে পারি। সেই রকম সুকান্তর আরও অনেক কবিতা পড়েছি। তাদের অনেক তলায় চাপা পড়ে থেকেও 'আগামী' বিশেষ একটা ভালোলাগার কবিতা হয়ে আমার স্মৃতিতে আশ্চর্য সজীব হয়ে ফিরে আসে। কারণটা আমি অনুমান করতে পারি।

সুকান্তর জীবন তার কবিতার চেয়ে আমার কাছে বেশি তীব্র মনে হয়েছে কত বার ; তার মৃত্যুর পর দুটি যুগ গেছে প্রায়, এখনও তবু মাঝে মাঝে মনে হয়। সুকান্ত বাঁচতে চেয়েছিল নিশ্চয়, কবিতা লেখার আনন্দে, নিঃশঙ্ক ভবিষ্যতের উন্মুখ প্রতীক্ষায়। রবীন্দ্রনাথের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের নির্ঝরের জলস্রোতে যেমন রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-কণ্ঠ স্পষ্ট শ্রবণগ্রাহ্য, তেমনি সুকান্তর আগামী কবিতার 'আমি এক অঙ্কুরিত বীজ' এই উচ্চারণে তার ক্রমস্ফুট কবি-কণ্ঠে নির্ভুল কান পাতা যায়। রবীন্দ্রনাথের অত্যাশ্চর্য জীবনের বিস্ময়কর কবি-প্রতিভার ইতিহাসে নির্ঝর দূর থেকে শুধু মহাসাগরের গানই শোনে

না, সে শেষাবধি মহাসাগরের বিপুল বারিধির উপকূলে এসে তার তীর্থযাত্রা সমাপন করে। আর সুকান্তর অকালমৃত্যু-খণ্ডিত নিদারুণ বিয়োগান্তিক জীবনের স্বল্প পরিধির হিসাব নিকাশে পাই শুধু ভীরু এক অঙ্কুরিত বীজের সন্দিগ্ধ চোখ-মেলা। সুকান্তর 'আগামী' কবিতার লাজুক ভীরু অঙ্কুরিত বীজের, যাকে ঘিরে হাজারো ভবিষ্যৎ-স্বপ্ন, আত্মপ্রত্যয়ের সংকল্প রীতিমত ঘোষণার প্রায় :

বিদীর্ণ করেছি মাটি, দেখেছি আলোর আনাগোনা
শিকড়ে আমার তাই অরণ্যের বিশাল চেতনা।
আজ শুধু অঙ্কুরিত, জানি কাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতা
উদ্দাম হাওয়ার তালে তাল রেখে নেড়ে যাবে মাথা,
তারপর দৃপ্ত শাখা মেলে দেব সবার সম্মুখে,
ফোটাব বিস্মিত ফুল প্রতিবেশী গাছেদের মুখে।
সংহত কঠিন ঝড়ে দৃঢ়প্রাণ প্রত্যেক শিকড় ঃ
শাখায় শাখায় বাধা, প্রত্যাহত হবে জানি ঝড় ;
অঙ্কুরিত বন্ধু যত মাথা তুলে আমারি আহ্বানে
জানি তারা মুখরিত হবে নব অরণ্যের গানে।

তবু 'আগামী' কবিতার লাজুক ভীরু অঙ্কুরিত বীজের কথা পড়লেই, সুকান্তর জীবনই কেন জানি আমার কাছে একটি মুহূর্ত অস্বাভাবিক তীব্র হয়ে ওঠে। সুকান্তর শেষ-নিদ্রার মস্ত ফটোখানা আমি স্মৃতি থেকে reprint করতে পারি ; তার কবিতার চেয়ে সুকান্ত ভট্চাজ নিজে আমার কাছে অতর্কিতে তীব্র হয়ে ফেটে পড়ে।

দুরাশার মৃত্যু : সুকান্ত ভট্টাচার্য　　　　শংকর চট্টোপাধ্যায়

পশ্চাৎপট

গালে একটা হাত রেখে অস্ফুট কৌতুকে (সম্ভবত ক্যামেরার লেন্সের দিকে) তাকিয়ে বসে আছে এক কোটি পরিহিত কিশোরপ্রতিম যুবা যার ছাপা ছবিটি আমি বহুবার দেখেছি কিন্তু মানুষটিকে কখনই নয়। ব্লকের কারুকার্য কিনা জানি না, যুবাটির চোখ আমার বরাবরই দীর্ঘ ও গভীর বলেই মনে হয়েছে। না, তার সেই সুকুমার মুখমণ্ডলে আমি কোনো সুতীব্র জ্বালা বা ক্রোধ দেখতে পাইনি বরং কষ্ট করে চেপে রাখা ওষ্ঠদ্বয়ে যেন-বা এক নির্মল কৌতুকপ্রবাহ বন্দী হয়ে আছে বলেই মনে হয়েছে আমার সব সময়। যেন ক্যামেরার চোখটি নিভে গেলেই হা হা করে হেসে উঠবে যুবাটি, হয়ত বলবে—
'জানিস এমন হাসি পাচ্ছিল আমার, আর একটু হলেই···।' না, সুকান্ত ভট্টাচার্যকে কখনও চোখে দেখা হয়নি আমার। সে ছিল এক সর্বনাশা শৈশব আমাদের, ভোররাত্রি থেকে চালের দোকানে লাইন লাগাতে হতো—জীপগাড়ী ছুটিয়ে লাল নিগ্রোদের হু-হু ছুটে বেড়াতে দেখা যেত পূর্ববঙ্গের সেই আধা-শহরে রাস্তায় আর ছিল বোমারু বিমানের আতঙ্কিত গুঞ্জন আকাশে, দিন-রাত্রি ভরে। সুকান্ত ভট্টাচার্যকে আবিষ্কার করতে তাই কিছু সময় লেগেছিল আমার।

ভূমিকা

সাহিত্যের ইতিহাসে বহুবার এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখা গেছে যে সময় তার নিজের প্রয়োজনে এক বা একাধিক কবিকে বিশেষভাবে বেছে নিয়েছে। সেই কবির রচনার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে সময়ের যাবতীয় বিশেষ চরিত্র, তার জ্বালা বা অসহায়

রূপটি। এভাবেই একদা সময়ের বিশেষ প্রয়োজনে বাংলা কবিতায় নজরুল ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছিল, এসেছিলেন সমর সেন, ঠিক তেমনিভাবেই দেখা পাওয়া গিয়েছিল সুকান্ত ভট্টাচার্যের। সেই অশুভ, বিশৃঙ্খল, নিরন্ন বাংলাদেশের জন্য সুকান্তর মত একজন সমর্থ কবির বড় প্রয়োজন ছিল সেদিন। এবং এ প্রসঙ্গে এ-কথাটিও স্মর্তব্য যে, সমর সেনের মত সুকান্তও চিরকালীন কবিতার সেই সুমহান মহিমাকে স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছিলেন যা কিনা অনেক কবির ভাগ্যেই ঘটে না।

আসলে সুকান্তর বিশ্বাস এবং বোধ এমনভাবে মিশে গিয়েছিল যে, তাঁর যে কোনো অক্ষম পংক্তিরও কবিতা হয়ে উঠতে বাধা হয়নি। ফলত সময় পেরিয়েও সুকান্তর কবিতা তাই এক বিশেষ কাব্য-ভাবনার বিশিষ্টতা পেয়েছে। যেহেতু তাঁর কবিতা সরাসরি বুক থেকে উঠে আসা কবিতা বলেই সুভাষের মত তিনিও যে কোনো চীৎকৃত ধ্বনিকেও কবিতা করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

সাধু অর্থেই সুকান্তর কবিতা রোমান্টিক অর্থাৎ যে অর্থে মায়াকভস্কি ছিলেন রাশিয়ায় ফিউচারিস্ট আন্দোলনের প্রবক্তা।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ছাড়া সুকান্তর মত কোনো কবিই ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যানের বাকভঙ্গীকে সার্থকভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হননি, যদিও অনেকেই সে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

দুরাশার মৃত্যু

বর্ণলিপি বা মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কারের ঊষাকাল থেকেই যে অমোঘ বিষয়টি কবিদের সর্বাধিক পীড়ন করে এসেছে আলোচ্য কবিতার মৌল ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুটি হল তাই অর্থাৎ মৃত। অথচ প্রকাশ-ভঙ্গির সারল্য ও চিত্র-রচনার দক্ষতা কবিতাকে দিয়েছে এক দীপ্তি। 'দুরাশার মৃত্যু'তে কবির কোনো ভাণ নেই, বালাই নেই অহেতুক বর্ণলেপনের, যেভাবে সরাসরি বুক থেকে উঠে এসেছে কবিতাটি

তেমনিভাবেই পরিবেশিত হয়েছে। কিঞ্চিৎ রহস্যময়তার প্রলেপ দেওয়ার কোনো প্রয়োজনীয়তা সুকান্ত অনুভব করেননি। আসলে তাঁর কবিস্বভাবে কোনো ভাণ বা অহেতুক চাতুরীর অপচেষ্টা কখনই দেখা যায়নি। বাকভঙ্গীর চাতুর্য প্রদর্শন নয়, বিষয়ের সত্যটির পরিবেশন-ই ছিল সুকান্তর লক্ষ্য। আন্তরিক নিষ্ঠা ও শুদ্ধ বিষয়জ্ঞান ছিল বলেই প্রায় প্রতিটি রচনায় সুকান্ত লক্ষ্যভেদ করতে সমর্থ হয়েছেন।

স্বচ্ছ ও ঋজু কবিতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবেই এই 'দুরাশার মৃত্যু' কবিতাটি চিরকাল আমার মনোহরণ করেছে। সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিসত্তার যাবতীয় গুণাগুণ এই কবিতাটিতে যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে অন্য কবিতায় তেমনভাবে উপস্থিত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ বর্তমান। পৃথিবীর তাবৎ সাহিত্য-পাঠে এ সত্যই বার বার প্রমাণিত হয়েছে যে একটি সাধু অর্থে রোমান্টিক কবিসত্তা চিরকাল বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্লিন নৈরাজ্যেই নিমজ্জিত হয়। এভাবেই একজন সৎ কবির দৃষ্টিতে এই বিশ্বপ্রকৃতিতে প্রতি পলকে 'নির্মূল বনানী' বা 'প্রস্থানের চেষ্টা হলো মিছে' জাতীয় অমোঘ সত্য প্রতিভাত হয়—অন্য কিছু নয়।

উপসংহার

হাসপাতালের বেডে দীর্ঘ আর গভীর হয়ে খুলে আছে একজোড়া চোখ—ত্রিশূলের মত একটি আলোকরশ্মি এসে বিঁধেছে হৃৎপিণ্ডে—অরণ্যের বিশাল চেতনা তবু তার শিকড়ে স্পন্দিত—সুদীর্ঘকাল পরেও আমি তা দেখতে পাই।

স্বাভাবিকভাবে সব কিছু হয় না বলেই লড়াই। অনিচ্ছুক পাথুরে মাটিকে ধর্ষণ করে ফসল ও উদ্ভিদ আদায় করতে দেখেছি আমি পাহাড়তলীর অন্যথায় শান্ত আদিবাসীদের। সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রণীত 'এই নবান্নে' পড়তে পড়তে খুব মনে হচ্ছিল এ দেশের ঋণে জন্মানো, ঋণে বাঁচা, ঋণে মরা কৃষক ঈপ্সিত শান্তি পায় নি বলেই এত পল্‌তের থেকে আগুনের ছুট্ বারুদের দিকে—এত কাকদ্বীপ, তেলেঙ্গানা, সোনারপুর, নকশালবাড়ী।

যারা লড়াই করতে গিয়ে মরেছিল আর যারা সেই লড়াই-এর থেকে অর্জিত অধিকার নিয়ে বেঁচে আছে—উভেয়ের মাঝখানে একটি আতুর প্রবাহ বহে যায়। সে প্রবাহটি স্মৃতির, গর্ভিনী মাঠে স্বজনের লাশ দেখার দুঃস্বপ্নের। 'এই হেমন্তে কাটা হবে ধান' এ হেন আশাব্যাঞ্জক উচ্চারণকে ম্লান করে দিয়ে অনিবার্যভাবে উস্‌কে ওঠে দ্বিতীয় অনুভব :

তবুও এ হাতে কাস্তে তুলতে কান্না ঘনায়
হালকা হাওয়ায় বিগত স্মৃতিকে ভুলে থাকা দায়।

জয়োৎসবের বুকের ওপরই গম্ভীর দাঁড়িয়ে ওঠে শহীদ-স্তম্ভ।

তবু কবিতাটির নাম 'এই নবান্নে'। 'গত হেমন্তে' নয়। সুকান্ত তাঁর 'প্রিয়তমাসু' কবিতায় 'সীমান্তে প্রহরী আমি আজ' বলেও দুর্বার গোলা-ফাটার মুহূর্তের ফাঁকে ফাঁকে কোনো ব্যক্তিগত সময়ে অনুভব করেছিলেন, 'শ্লথ হয়ে আসে হাতের রাইফেল', কখনো বা অপ্রতিরোধ্যভাবে রোমান্টিক হয়ে উঠেছেন, 'রাত্রে চাঁদ ওঠে/ আমার চোখে ঘুম নেই।' অস্বীকৃতির ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে চাওয়ার মূর্খতা সুকান্তর কবি-স্বভাবকে হঠকারী করেনি। মানুষের বিজয়ে তাঁর বিশ্বাস অভিজ্ঞতায় বয়স্ক। বার বার আক্রান্ত মানুষ

পিছিয়ে পড়ে। তারপর এক ঐতিহাসিক লগ্নে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের অনেক ঘোরালো পথে হেঁটে সে সেই আক্রান্ত চেতনাকে আক্রমণে নিযুক্ত করে। 'এই নবান্নে প্রতারিতদের হবে না নিমন্ত্রণ ?' সংশয়-পর্ব অতিক্রম করে অবশেষে সংহতির শক্তিতে আস্থা পায়, 'এবার নতুন জোরালো বাতাসে/ জয়যাত্রার ধ্বনি ভেসে আসে।'

'এই নবান্নে' কবিতাটি চড়া মেজাজের নয়। গত হেমন্তে মরে যাওয়া ভাই ও ছেড়ে যাওয়া বোনদের স্মৃতি কবিতাটিকে ক্রোধে চণ্ডাল হয়ে যেতে দিচ্ছে না। সুকান্ত-কবি-চরিত্রের পক্ষেও বেশ একটু আলাদা জাতের লেখা এটি। সংশয়-স্বপ্ন-প্রতীতি, প্রতীতি-স্বপ্ন-সংশয়—ঘুরে ঘুরে এই নানামাত্রিক ভাবনা কবিতাটির বলয় রচনা করেছে, কোনোটিই বাদী সুর নয়, কোনোটি সম্বাদী-ও নয়। অর্থাৎ কেউ কাউকে ছাপিয়ে ওঠেনি। তাই দ্বিতীয় পংক্তির 'আবার শূন্য গোলায় ডাকবে ফসলের বান'-এর শপথ আট ও নয় পংক্তি-যুগলে দীর্ঘশ্বাসে কেমন মেদুর হয়ে ওঠে, 'নিজের হাতের জমি ধান-বোনা/ বৃথাই ধুলোতে ছড়িয়েছি সোনা।' অথচ কবি নিশ্চিত-ই জানেন বর্গাদার চাষীর ও জমির অশ্রু ঘাম রক্তের সম্পর্ক, জানেন, 'তোমার আমার ক্ষেত ফসলের অতি ঘনিষ্ঠজন।'

প্রচুর সংখ্যক সুবিধাবাদীর অক্ষমতার গ্লানিকে ঢেকে যে জঙ্গী কিষাণেরা জোতদার-ইজারাদারদের গুলি-বল্লমের সামনে প্রাণের বদলে প্রতিবাদ উচ্চারণ করেছিল, তারাই 'এই নবান্নে'-র ফসলের আপনজন। পরবর্তী প্রজন্ম তাদের আত্মদানের পুণ্য ভোগ করবে, অথচ তাদের হয়তো ভুলে যাবে। সুকান্ত-র গলা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে 'তারা কি কেবল লুকোনো থাকবে।'

সুকান্ত বিজয়ে বিশ্বাসী, অথচ অবোধ সারল্যে নিশ্চিন্ত নন। উলটো-পালটা বাতাসের মত এদিক-ওদিক ফিরছে কর্ষণজীবী সমাজের সাফল্য সম্পর্কে আশা-নিরাশা। 'পথে প্রান্তরে খামারে' পড়ে থাকা পরিজনের মৃতদেহের বন্ধনী তাঁর ভাবনাকে সংযম ও

শ্লোক দিয়ে শাসন করেছে, কবিতাটির শেষ ছ'টি পংক্তি তিন-তিনবার মারাত্মক সংশয়ের প্রশ্ন-বোধক চিহ্নে দুলে উঠেছে, এবং এত খুন এত বীরত্বের পরও কবিতাটির শেষ পংক্তিটি আলো-অন্ধকারের দু'মুখো টানে টলছে, 'এই নবান্নে প্রতারিতদের হবে না নিমন্ত্রণ?' আলোচনার এ পর্যায়টুকু পড়ে মনে হতে পারে, কবির এককালীন উজ্জীবিত মানসকে অনিশ্চয়তা পদে পদে কাটছে, তার লক্ষ্যকে কুয়াশাকঠিন করে তুলছে। তা নয়। একটু ভালোভাবে কবিতাটির শরীরে ঢুকে গেলে বোঝা যাবে, সেখানে সর্বত্র এক চাপা আণ্ডারটোন কাজ করছে। সে সুর সতর্কতার। সে বলছে, অনর্থক মূল্য দেয়া আর নয়, সংহতির মূল্যে অর্জিত সম্পদ রক্ষা করো। অবশ্যই সে ভাষণ শ্লোগানে নয়, কবিতায়। আত্মীয় হারানোর বেদনা পরবর্তী যুগের সৈনিককে একটি গুলিও বেহিসাবী-ভাবে খরচ করতে বাধা দেয়, তাকে অভ্রান্ত, নিশ্চিত করে তোলে। 'এই নবান্নে' এইভাবে পা টিপে টিপে 'গ্রামের নীরব শ্মশান' পেরিয়ে দৃঢ়ভাবে 'পৌষ-পার্বণে প্রাণ কোলাহলে'-র দিকে চলেছে। গত হেমন্তে 'কারোরই ঘরেতে ধান তোলবার আসেনি শুভক্ষণ'—এ ভয়ঙ্কর সত্য মাথায় রেখে।

অসম্ভব, মাত্র একটি কবিতাকেই 'সবচেয়ে ভালো লাগে' বলে বেছে নেওয়া অসম্ভব আমার পক্ষে, বিশেষত এক্ষেত্রে কবি যখন আর কেউ নন, সুকান্ত ভট্টাচার্য। অনেক অনেক কবিতা তাঁর আমাকে আজও বশীভূত করে, রোমাঞ্চিত করে। আজও, অর্থাৎ এখন যে আমি মধ্য-তিরিশ-পেরোনো জীবন ও সময় সম্পর্কিত নানান চিন্তায় উদাসীনতায় মর্মান্তিকভাবে দ্বিধাগ্রস্ত একজন সামান্য কবিতা লেখক ও অসামান্য ব্যর্থতায় খিন্ন, পলায়নকেই পরিত্রাণ ভেবে যে' আমি সন্ধ্যার রঙচঙে চৌরঙ্গিতে নিরুদিষ্ট, এবং পলায়নকে ক্লীবত্ব ভেবে যে আমি নিজেকে শিক্ষক মিছিলে মুঠো-পাকানো হাত তুলে ইনকিলাবি শ্লোগানে গলা মেলাতে দেখি, সেই স্ববিরোধী আমার কাছে আজও সুকান্ত একই রকম দ্যুতিময়। বয়সের দোষে, ক্রমান্বিত তিক্ত অভিজ্ঞতায় অনেক কিছু আমি খুইয়েছি ; একরোখা বিশ্বাস, বাঁধভাঙা তারুণ্য, উদ্দীপনা। অথচ সবই ছিল আমার উত্তর-কৈশোর প্রথম যৌবনে, '৫০-এর গোড়ার দিকে যখন মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতুম, সাহিত্য মানেই বাঁচার জন্যে লড়াই আর লড়াইয়ের জন্য বাঁচার রক্তাক্ত ইশতেহার, সাহিত্য মানেই ব্যাধিমুক্ত ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি। সুকান্ত ছিলেন এই বিশ্বাসের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা। চতুর্দিক দিয়ে তখন আমাদের ঘিরেছিল ফ্যাসিবিরোধী সাম্যবাদী আন্দোলনের গরম হাওয়া, গণনাট্য সঙ্ঘের গ্রামে-নগরে ছড়িয়ে যাওয়া স্কোয়াড, প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের গমগমে অধিবেশন, এক কথায় প্রখর ও ব্যাপক রাজনীতিমনস্কতা। তখন সুকান্ত ছাড়া বাংলাদেশে যেন কোন কবিই ছিলেন না। কিন্তু তারপর ? তারপর অনেক কিছু ঘটে গেছে ; আর এখন আমি গুটিয়ে গেছি, নিজের মধ্যে থিতিয়ে

গেছি। জনসাধারণের একজন হয়েও আমার লেখায় তাদের ভাত-কাপড়ের সমস্যা আর সংগ্রাম ততটা ছায়া ফেলেনি, যতটা আমারই অসহায় অথচ অনিবার্য বিশ্বাস-অবিশ্বাস, ইনট্রোভারসান; একে জনবিরোধী কী করে বলব, কিন্তু সহযোগী কতখানি তাও বলতে পারছি না। আসলে কবিতায় নিজেকেই মেলে দিতে চাইছি আজকাল, নিজের কাছে বিশ্বস্ত হওয়া:ছাড়া সাহিত্যের অন্য কোন সংবিধানে, শর্তে উৎসাহী হতে পারি না। সুকান্ত কি তাহলে নিজের কাছে বিশ্বস্ত নন? অবশ্যই। কিন্তু তাঁর ব্যক্তি-চেতনা আমার মতো ব্যক্তিগত দ্বৈপায়ন আলো-অন্ধকারে নয়, বহু মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার যৌথ রণক্ষেত্রের মধ্যেই শেকড় গেড়েছে। সুকান্ত আমার আত্মসর্বস্বতা থেকে অনেক দূরে।

দূরে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সুকান্তর কবিতার তেজালো সংক্রামে এখনও যে আচ্ছন্ন হতে পারছি তার সবচেয়ে বড় কারণ তাঁর কবিতাগুলো অক্ষরে অক্ষরে আমর্মমূল সত্য, গাছ যেমন, ফুল যেমন, শিশুর চোখ যেমন, নিষ্পিষ্ট মানবসমাজের বেদনা যেমন্। উদাহরণ হিসেবে তাঁর যে কোন একটি কবিতা (না, 'সবচেয়ে ভালো' নয়, সবচেয়ে—এই তুলনামূলক বিশেষণে একটা অপ্রীতিকর ইঙ্গিত থাকে: অন্যান্য লেখাগুলো যেন তত ভালো নয় যতটা কোন একটি, একটিই মাত্র, বিশেষ লেখা। আর আগেই বলেছি সুকান্তর ক্ষেত্রে এই নির্বাচন আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব) ধরা যাক, 'ছাড়পত্র'-কে আপনাদের সামনে রাখতে চাই।

কী আছে এই কবিতায়? সুকান্তর শব্দগুলিকেই মোটামুটি গদ্যে সাজিয়ে বলা যায়, সদ্যোজাত একটি শিশুর অস্পষ্ট কুয়াশাভরা চোখে আসন্ন যুগের নতুন চিঠি কবি পড়তে পেরেছেন, নতুন চিঠি অথবা নতুন বিশ্বের ছাড়পত্র। জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ মৃত ধ্বংসস্তূপ পিঠে তাঁদের চলে যেতে হবে, কিন্তু চলে যাবার আগে তাঁর

দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে, প্রাণপণে পৃথিবীর জঞ্জাল সরিয়ে এ বিশ্বকে নবজাতকের বাসযোগ্য করে যাবার দৃঢ় অঙ্গীকার তিনি ব্যক্ত করেছেন। অবশেষে সব কাজ সেরে তাঁর দেহের রক্তে নতুন শিশুকে তিনি আশীর্বাদ করে যাবেন। তারপর—তাঁর ভাষাতেই বলি—
'তারপর হব ইতিহাস।'
অত্যন্ত স্পষ্ট সোজা কবিতা। সহজ ও স্বচ্ছন্দ পারম্পর্যে শব্দের পর শব্দ, লাইনের পর লাইন বয়ে বয়ে এক সুসঙ্গত ও অনিবার্য উপসংহারে মিশে গেছে। হৃদয় থেকে এসে হারিয়ে গেছে হৃদয়ে। সহজ কবিতা; শুধু একটি জায়গাই, শেষতম লাইনটি—যা বেশ সংকেতময়, অ্যাব্‌সট্রাকট, নিমজ্জনসাপেক্ষ—একটু ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে। এখানে সুকান্ত একটি বিমূর্ত শব্দ বা ধারণা, 'ইতিহাস' —তাকে মূর্ত করে তুলতে চেয়েছেন তাঁর মধ্যে। ইতিহাস হচ্ছে তাঁর কাছে ক্ষমতালোভী প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির বিরুদ্ধে, যাকে তিনি 'পৃথিবীর জঞ্জাল'স্বরূপ মনে করেছেন, তার বিরুদ্ধে প্রবঞ্চিত গণশক্তির দ্বন্দ্বের সমার্থক। দ্বন্দ্ব; এবং এর স্পর্শগ্রাহ্য প্রতিরূপ হিসেবে ইতিহাস অর্থে সংগ্রামী খেটে খাওয়া মানুষ, সুকান্ত যাদের একজন, আবেগের শীর্ষে যিনি দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করেছেন: 'বিপ্লব-স্পন্দিত বক্ষে মনে হয় আমিই লেনিন।' ভাবতে ইচ্ছে হয়, আমি এই সত্তরের কলকাতায় বিপুল আত্মঘাতী নির্বোধ জিঘাংসার নরককুণ্ডে বিমূঢ় বিমর্ষ আমি আমার পরবর্তী প্রবংশের জন্যে কী উত্তরাধিকার রেখে যাচ্ছি? রাশি রাশি দ্বিধা, আপোষ, নির্বিবেক স্বার্থপরতা, কাপুরুষ, উচ্চাশাহীন অথবা কেরিয়ারভিক্ষু শহুরেপনা? বস্তুত উত্তরকালের কাছ থেকে ঘৃণা আর করুণা ছাড়া আমার কপালে মনে হয় কিছুই জুটবেনা যদি না নিজেকে শুধরে, ভেঙে, প্রতিবাদে সক্রিয় করি এবং সক্রিয়তার বিকল্পহীন উপায় হিসেবে বেছে নিই সংগ্রামের রাজনৈতিক ময়দান। পারছি না। পারলে উদ্ধার হতুম, বাঁচতে পারতুম ইতিহাস-নিয়ন্তা মানুষের উজ্জ্বল সমাজে। আমিই আমার

দুর্লঙ্ঘ্য কাঁটাতারের বেড়া। অথচ সুকান্ত বলতে পেরেছেন, শৌখিন প্রগতিশীলতায় নয়, গাঢ় আত্মবিশ্বাসে : 'যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ/প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,/এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি—/নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।' ঘোষণার মতো মনে হচ্ছে, হোক। কিন্তু সেটা পেশাদারি জননেতার আস্ফালনের বাহারি ফুলকি নয়, একজন দরদী ও সত্যবদ্ধ কবির ব্যক্তিগত জীবনচর্যার সঙ্গে কবিতার অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কের আত্মিক উচ্চারণ। এবং সেই জন্যেই ঘোষণা পালটে গেছে কবিতায়। উক্তি আর প্রযুক্তির দুর্লভ সাযুজ্যের এ এক চিন্ময় দৃষ্টান্ত। সেই জন্যেই সুকান্ত এত সাবলীল, দীক্ষিত-অদীক্ষিত নির্বিশেষে সমস্ত পাঠকের কাছে তাঁর কবিতার এত প্রাণবন্ত অভ্যর্থনা ॥

না মেজাজে, না কবিতার ভাষায়—কোন দিক থেকেই আমার সঙ্গে সুকান্তর মিল নেই। আমি পারতুম না 'সুতীব্র চীৎকার', 'মুষ্টিবদ্ধ, হাত উত্তোলিত, উদ্‌ভাসিত' ধরণের শাদা, নির্ব্যঞ্জক শব্দ ব্যবহার করতে। আমি পারতুম না কবিতাকে এতখানি প্রকট, স্বয়ংপ্রকাশ, গদ্যপ্রতিম বাগ্‌বিন্যাসে, অনুক্রমে চরণের পর চরণ সুসংবদ্ধভাবে লিখে যেতে। আমার স্বভাবে গেঁথে গেছে কবিতাকে ঘন, ইঙ্গিতময় প্রতীকি করার আয়াসার্জিত প্রবণতা। শব্দের ব্যাপারে আমি দুর্মরভাবে শুচিবায়ুগ্রস্ত। তাই একমুঠো, মাত্র একমুঠো, কবিতাসজাগ, বিলাসী পাঠকের কাছেই আমার সার্থকতা ও তারচেয়ে হয়তো অনেক বেশি ব্যর্থতা ধরা পড়েছে। অথচ কবিতা জনসাধারণের ভিতরে পৌঁছে যাক, তাদের নাড়া দিক, মনের ভেতর এরকম একটা আশাও থেকে গেছে। কিন্তু এই পর্যন্তই। আশাকে কাজে পরিণত করা আর সম্ভব হয়নি। সেদিক থেকে আমার যাবতীয় অপূর্ণতার পরিপূরক যেন সুকান্ত, আমার অক্ষমতার তীব্রতম প্রত্যুত্তর। বুঝতে পারি কত কঠোর

ক্লান্তিহীন যুদ্ধ করে নিজেকে তিনি মিলিয়ে দিয়েছেন জনতার সাধারণ্যে, চয়ন করে নিয়েছেন জনতারই সুখ-দুঃখের ভাষা, ভেঙে ফেলেছেন কূপমণ্ডুক শিল্পচিন্তার কবোষ্ণ মিনার। সহজ কথাকে সহজ করে বলার কঠিন পরীক্ষায় তিনি অবিস্মরণীয়ভাবে জিতে গেছেন সামান্য একুশ বছরের আয়ুষ্কালের মধ্যেই। 'ছাড়পত্র' কবিতাটি সেই বিজয়েরই অন্যতম অভিজ্ঞান। হেরে গেছি, হেরে তো যাবই জানা কথা, তবুও আনন্দিত আমি সেই হার-মানা-হার সুকান্তর গলায় পরিয়ে দিয়ে কৃতার্থ হতে চাই।

আমি এই পঁয়ত্রিশে পড়লুম, অর্থাৎ সুকান্তর মৃত্যুর সময়ে আমি এগার বছরের বালক, আর ঐ বছরেই একটা কালো রঙের লেজ-ঝোলা পাগলা কুকুর আমার বাঁ-পায়ে কামড়েছিল,—ডাক্তার চোদ্দটা ইঞ্জেকশান দিয়েছিল পেটে।

মন-খারাপ, পেটে ব্যথা—দাঁড়াতে গেলে কুঁজো হয়ে যাই। বারান্দার একধারে বসে পোষা পায়রাগুলোর দিকে চেয়ে থাকি : 'সিরাজ' পায়রাটার তিনটে লাল ছানা উঠেছে, উঠোন আলো করে কাঁকর খুঁটছে,—আর সে-সময়েই আমার জীবনের একমাত্র চিরস্থায়ী ক্রোধের কারণটা এসে গেল। সামনের উঁচু ডাবগাছের উপর থেকে একটা চিল শাঁ করে নেমে এসেই আবার উপরে উঠে গেল, পায়ে একটা লাল ছানা, চিঁ চিঁ করে কাৎরাচ্ছে, আর 'সিরাজ' ছুটো···এর পরে কীই বা আর লেখার থাকে! মুহূর্তের জন্যে পেটের ব্যথা ভুলে গিয়ে একটা ঢিল ছুঁড়লুম, অতো উপরে পৌঁছল না, উপরন্তু পেটে হাত চেপে বসে পড়তে হলো। কিছুক্ষণ পরে চোখের সামনেই বাচ্চাটির দেহের কিছু ছিন্নভিন্ন অংশ ছড়িয়ে পড়তে দেখলুম, আর সেই পাগলা কুকুরের বাচ্চাটা সেগুলো শুঁকছে। না, এখানেই শেষ হয় নি। আরো বছর-তিনেক পরে বন্দুক-ছোঁড়া শিখলুম, একটা মাত্র উদ্দেশ্য—চিল দেখলেই মারা। বুঝতে পারলুম, সব চিলের জাত এক, চরিত্র এক। কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত অন্ততঃ পঞ্চাশটা চিল মেরেছি, আর পারিনি, কারণ এর পরে অন্যরকমের চিলেরা এল।

আমাদের পরিবারের একজন বাদে আমার দুখিনী মা সমেত আমরা ছ'ভাই-বোন বহুদিন ভাত পাইনি। দু'বছরের ছোট

বোনটাকে শুধু পুকুরের জল খাইয়ে রাখতে হয়েছে—এমন দিন গেছে অনেক। যে-লোকটার জন্যে এসব, তাকে মারতে পারলুম না'।

যে-মেয়েটির জন্যে এই পঁয়ত্রিশেও নির্লজ্জের মতো হঠাৎ-হঠাৎ কেঁদে ফেলি, যে-মেয়েটি তার ঈশ্বরকে পর্যন্ত আমার হাতে ছেড়ে দিয়েছিল, তাকে যখন হাতে-পায়ে গামছা বেঁধে কঞ্চি দিয়ে চাব্‌কানো হলো, আমি তার ধব্‌ধবে পিঠের উপর শুধু টক্‌টকে রক্ত গড়িয়ে পড়তে দেখেছি। যে-লোকটার জন্যে এ-সব, তাকে মারতে পারলুম না।

এই যে মাত্র তিন বছর আগে যে-সামান্য জমিটুকু চাষ করেছিলুম—আশা ছিল, মাস-তিনেক ভাই-বোনেরা পেট ভরে দু'মুঠো খাবে—তার ধান জবরদস্তিতে অন্য খামারে চলে গেল। রোগা হাড়গিল্‌-গিলে শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম। যে-লোকটার জন্যে এ-সব, তাকে মারতে পারলুম না।

তাই একটা চিলকে 'শুকনো, শীতল, বিকৃত দেহে' 'ফুটপাতে মুখ গুঁজে প'ড়ে' থাকতে দেখলে সারা শরীর আনন্দে উল্লাসে চন্‌মন্‌ করে ওঠে।

সুকান্ত যে-বছরে জন্মেছেন, সেই বছরে নজরুল ইসলাম জনৈক ইব্রাহিম খান-কে এক চিঠিতে লিখেছেন, 'সত্যসত্যই আমার লেখা দিয়ে যদি আমার মুমূর্ষু সমাজের চেতনাসঞ্চার হয়, তা হলে তার মঙ্গলের জন্য আমি আমার কাব্যের আদর্শকেও না হয় খাটো করতে রাজী আছি…।' এই চিঠিরই অন্যত্র—'তবে এও আমি বিশ্বাস করি, সেই অনাগত পুরুষের, আমাদের যে-কারুর মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করা বিচিত্র নয়।'

এর আঠারো বছর পরে সুকান্ত 'মেজ বৌদি'-কে এক চিঠিতে লিখছেন, 'আমি যে জনতার কবি হতে চাই, জনতা বাদ দিলে

আমার চলবে কি করে? তাছাড়া কবির চেয়ে বড় কথা আমি কমিউনিস্ট, কমিউনিস্টদের কাজ-কারবার সব জনতা নিয়েই।' চিঠির শেষ বাক্যটি সম্পর্কে তর্ক থাকতে পারে, স্বাভাবিক; কিন্তু এমন সময়ও আসে, যখন উক্তিটি অবধারিত হয়ে ওঠে,—তখন সুকান্তকে বলতেই হয়: 'উদ্যমহীন মূঢ় কারায়/পুরোনো বুলির মাছি তাড়ায়/যারা, তারা নিয়ে ফেরে পাড়ায়, স্মৃতির ফেউ।' আর ক্রান্তিকালে কবি উপলব্ধি করেন, '…Poetry's borders are charted/As surely as on a map./It is not a charade, with players/Parading in bells and cap.' (NIKOLAI ZABOLTSKY) তখন কবিতার ভাষা হওয়া উচিত শাণিত, তীক্ষ্ণ —যা সরাসরি শত্রুর দিকে অব্যর্থ তীরের ফলার মতো ছুটে যায়; এবং জনগণকেও বৃহত্তর সুখের সন্ধানে উৎসাহ দেয়।

আমি এ-রকম কবিতা লিখতে পারি না, কিন্তু জানি, এ-রকম একটা কবিতা লিখতে পারলে বর্তে যেতুম, কারণ হয়তো আমার সে-কবিতা মানুষের মনে এ-রকম আশা জাগাতো: 'অনেকে আজ নিরাপদ;/নিরাপদ ইঁদুর ছানারা আর খাদ্য হাতে ত্রস্ত পথচারী,/ নিরাপদ—কারণ আজ সে [চিলটা] মৃত।' তখন 'বুকের কাছে সযত্নে চেপে ধরা—' 'প্রাণধারণের খাদ্য' নিয়ে কোনো মানুষ আর কুঁকড়ে না গিয়ে 'তারা আজ এগিয়ে গেল নির্ভয়ে।'

একটা কথা বলা ভালো, আমি বিশ্বাস করি—মিছিলের শ্লোগান, মনুমেন্টের নিচে বক্তৃতা আর কবিতা এক জিনিস নয়,—যদিও দুটোর মূল বিষয়বস্তু এক হতে পারে। কবিতায় রসের ধ্বনিই মুখ্য,— এ-কথা কমিউনিস্ট কবিরাও মানেন। তাই এক সময় 'কবিতাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে আমাদের [সুভাষ মুখোপাধ্যায়-দের]… রাজনীতির আসরে ঢুকতে হয়েছিল।' কিন্তু 'সুকান্তর বেলায় তা হয় নি।…কবিতাকে সে সহজেই রাজনীতির সঙ্গে মেলাতে পেরেছিল।'

অর্থাৎ রসের ধ্বনি ও রাজনীতির ধ্বনি—দুটোকে মেলাতে পেরেছিলেন সুকান্ত ; নতুবা কবি হিসেবে সুকান্তর কোনো মূল্য থাকতো না ; আর 'চিল' পড়ে আমি কবি-সুকান্ত ও রাজনীতির সুকান্তকে এক করতে পারি।

যে-ভাবে নিবন্ধটি স্নুরু করেছিলুম, সে-রকম একটা উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করি : 'আমার নিজের গান গাই/সাধারণ স্বতন্ত্র এক সত্তার।/ তবু আমার কণ্ঠে গণতান্ত্রিক এই শব্দ উচ্চারিত,/উচ্চারিত জনগণের নাম।' (হুইট্‌ম্যান)।

সুকান্তকে এরকম ভাবে দেখি

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

প্রাকযৌবন পর্বে যে সব কবির কবিতা কণ্ঠস্থ না করে উপায় নেই, একাদিক্রমে কয়েকটি কবিতা বা তার উল্লেখ্য পংক্তি স্মৃতি থেকে অনায়াসে উদ্ধার করে দিতে পারে উদ্ভাসিত কিশোর, সেই কবি হলেন সুকান্ত,—একটি অনন্য নাম যাকে ওই বয়সে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। একা, পথে চলতে চলতে ১৭।১৮'র উদ্দীপ্ত দিনগুলোতে আমিও আবৃত্তি করেছি ছাড়পত্র, ঘুম নেই-এর প্রবচনচরিত্র পংক্তি কিংবা নৃত্যমান স্তবক; ত্রিশে পা রেখে যখন সহজে সাড়া দিতে পারিনা সহজেই এমন কবিতার আমন্ত্রণে যা আমার সমস্যাকীর্ণ অন্তর্গত ক্ষতগুলোকে স্পর্শ করে যায় না, কোনো একজন কবির সব দেখা ও দগ্ধতা আমার গোপন অভাব ভরে দিতে পারছে না, তখন সুকান্ত সেই কিশোর বেলার ভাবমূর্তিতে অবিচল আছেন তা বলা সত্যের অপলাপ, তথাপি এমন কিছু প্রশ্ন এবং তার সরল উত্তর ঐ অকাল পলাতক কবি রেখে গেছেন যা মাঝে মাঝে অন্তরঙ্গ হতে যায়, সমাধান করে দিতে চায়, ফলে—সুকান্তকে এড়িয়ে থাকা সম্ভব হয় না এখানো।

সুকান্ত বস্তুত উৎকণ্ঠা ও আবেগের কবি, পরিমিত যন্ত্রণা ও তার নিরাময়ের কবি, এবং যে লোকায়ত অভাব মানুষকে অস্থির ও সোচ্চার করে তোলে সুকান্ত তারই সরল ভাষ্যকার। অতৃপ্তি নয়, অভাব; নৈরাশ্য নয়, নির্দিধ বিশ্বাসের কবি, কবি কিশোর সুকান্ত, তাঁর দুটো ডানা এবং দুটো চোখই মাটির উপরে, মানুষের প্রতিদিনের সংসারের কাছে ঘুরে বেড়ায়; যা কিছু অসঙ্গত ও নৈরাশ্যকর মনে হয় তারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহে জ্বলে ওঠে, সেই বিদ্রোহের প্রশ্ন ও উত্তর সরলভাবে ঘোষণা করে, ফলত ছন্দ তাঁর কাছে স্বাভাবিক মাধ্যমরূপে আসে,

নিয়ন্ত্রিত বোধের সহচর হয়ে নয়, তাঁর জ্বালা এতই অনাবৃত ও স্বাভাবিক যে তাকে শিল্পীত করে তোলার জন্য যে প্রস্তুতি ও প্রয়াসের প্রয়োজন সুকান্ত সে সময়টুকুও অপেক্ষা করতে রাঁজি নন ; পূর্ব নির্ধারিত মতবাদকে যান্ত্রিকভাবে শব্দবদ্ধ করেন না সুকান্ত, তাঁর গভীরে প্রোথিত হয়েছিল যে প্রশ্ন এবং সমাধানের সংকেত তাই উপলব্ধির রসে জারিত হয় গন্ধবন্ধে। স্মরণে রাখি, সুকান্ত সেই বয়সে কবিতা লিখেছেন এবং সেই বয়স পার হবার আগেই তাঁর নারব হতে হয়েছে, সেই কৈশোর ও যৌবন সঙ্গমের বয়স যখন পৃথিবীর দিকে অনাবিল একটি স্বচ্ছ দৃষ্টি মেলে ধরে মানুষ, যখন সব নিরাশাব্যঞ্জক অনুভূতিকে সূর্যকরোজ্জ্বল পৃথিবীর দিকে চালিত করে মানুষ, যখন সমবেদনা ও প্রতিকারের আশায় উদ্বেলিত হয় কিশোর-মন, সব বঞ্চনাই বুকে বাজে, সব দুঃখই প্রতিকারের পথ খুঁজে পেতে চায়। সুকান্তর কবিতা রচনার বয়স অতি সংবেদনশীল সহানুভূতিতে দ্রব বলেই এক অকৃত্রিম অনুভূতি ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটে তাঁর কবিতায় ; যে অলৌকিক প্রক্রিয়াবলে স্বভাবকে শিল্পের স্তরে নিয়ে যেতে হয়—সেই প্রক্রিয়ার নামই অনুশীলন, সুকান্তর পক্ষে নিদারুণ ঘটনা হল সেই অনুশীলনপর্বেই তাঁর সৃজনকর্ম সীমিত হয়ে রইলো, পর্বে পর্বে নানা আবর্তন ও প্রবাহ রচনা করে নিজের স্বভাবকে স্বাভাবিকতার পথে চালিত করে দেখার সময় হয়নি তাঁর, ফলে অভিমানী কিশোর, যৌবন-সন্ধির যুবক পৃথিবীর রূঢ়তা ও অসঙ্গতির যেসব চিত্র প্রত্যক্ষ করেছেন তার চিত্রণ ও সমাধানের জন্য অধীর হয়ে পড়েছেন—নিজের নাভিপদ্মে পঞ্চেইন্দ্রিয় স্থাপন করে বেদনা ও বিস্ময়ের উৎসে অবগাহন করতে পারেননি, সুকান্তর কবিতা পরিশীলিত হবার দিকে যখন যাচ্ছিল তখনই তাঁর মৃত্যু হয়েছে, অসম্পূর্ণতার কারণ পূর্বাহ্নেই জেনে নিতে পারলে তাঁর সার্থকতা ও অসম্পূর্ণতার জন্য আমাদের ক্ষোভ করতে হবে না।

কিশোর র‍্যাঁবো কিংবা কীট্‌স্ সুকান্তর প্রায় সমবয়সী হয়েও যে

পরিণত শিল্পবোধের অধিকারী হয়েছিলেন, সুকান্তে তার অভাব অজানা নয়; এর মূলে হয়তো সন্ধানের চাইতে প্রতিকারের প্রশ্ন, হয়তো প্রতিভার স্তর—যা-ই হোক সুকান্তর যা কিছু সাফল্য তা হলো, তাঁর কবিতা পড়ে মনে হয় না, একটি বিশেষ দর্শনের তিনি বলিষ্ঠ প্রবক্তা, উপরন্তু কবিতাগুলির রচনামুহূর্তে যে তপ্ত আবেগ কাজ করেছে তাকে অকৃত্রিম বলে বুঝে উঠতে সময় লাগে না, এই অকৃত্রিমতাই সুকান্ত,—তাঁর শিল্পসিদ্ধির সহায় ও অন্তরায়; জানতেন না, শিল্প অকৃত্রিম হলেই সার্থক হয় না, তার সার্থকতা নির্মাণে, ঐ নির্মাণই প্রকাশ, আর প্রকাশের জন্য চাই অনুশীলন; অতএব উপাদান অকৃত্রিম হলেই চলবে না, কৃত্রিমতার দ্বারস্থ হতে হবে নির্মাণলগ্নে,—জানতেন না, জানার সময়ও পান নি, তাতে সুকান্তর খুব যায় আসেনি, এ বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন, কবিতার সার্থকতার চেয়ে অনেক জরুরী প্রশ্ন আছে যাকে এ মুহূর্তে জেনে নিতে হবে, সমাধানে তৎপর হতে হবে, এই প্রয়োজনে সাড়া দেওয়া তাঁর কাছে অনেক বেশি জরুরী মনে হয়েছিল, তাই নির্মাণের চেয়েও ঘোষণায় তাঁর প্রয়োজন, শ্রোতা কে পূর্বাহ্নেই জানা :

ইতিহাস! নেই অমরত্বের লোভ,
আজ রেখে যাই আজকের বিক্ষোভ॥

কি লিখবেন আর কার জন্য লিখবেন সুকান্ত তা জানতেন, তাই কবিতাগুলিতে বিক্ষুব্ধ কিশোরের পরিণতিমুখিন প্রশ্ন আর তার সমাধানের ইংগিতে কোথায় যেন এক সরল বিশ্বাসের জোড় আছে, সেই বিশ্বাস তাকে করে তুলেছে অস্থির, তাই প্রতিবাদ অনেক সোচ্চার; ঘটমান জীবনের দাবি তাঁর কাছে অনেক বেশী জীবন্ত, তাই ধ্যানস্থ হতে পারেননি, শিল্পীত প্রকাশ নিয়ে ভাবিত হননি, যতটা ভাবিত হয়েছেন বিষয়ের স্বরূপ উন্মোচনে, যথার্থ ছবি উদ্ঘাটনে। অবশ্য অবসরও মেলেনি, সুতরাং কি হতে পারতো সে প্রশ্ন অবান্তর, যা

পেয়েছি তাই নিয়ে সুকান্তর পাঠককে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। বলতে বাধা নেই, বাংলাভাষায় বামপন্থী-সাহিত্য (যদিও সাহিত্যের এরকম বিশেষণ উদার দৃষ্টির সহায়ক নয়) যে আজ পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট চরিত্র অর্জন করতে পারেনি, অনেকটাই উপরিতলের ভার নিয়ে তৃপ্ত তার কারণ হয়তো সুকান্তর অকালমৃত্যু। বলছি এই জন্য, কোনো শিল্পই সিদ্ধ হতে পারে না যেখানে ব্যক্তিগত উপলব্ধি জরুরী হয়ে দেখা না দেয়, কোনো দর্শন—সে যতই জরুরী ও মান্য হোক না কেন যদি স্রষ্টার অন্তর্গাঢ় বোধে লীন হয়ে যেতে না পারে তবে তার পক্ষে স্বাভাবিক উচ্চারণ সম্ভব নয়। সুকান্তর মধ্যে এই নতুন যুগের নানা প্রশ্ন আর ব্যক্তিগত নানান জিজ্ঞাসা এক উৎসে মিলিত হয়েছিল, জীবনের মৌল প্রশ্ন আর পরিণত দর্শনের সমন্বয় ঘটেছিল বলেই তার ব্যক্তিগত সংরক্ত বিক্ষোভ গণনাতীত মানুষের বিক্ষুব্ধির সংগে একাত্ম হতে পেরেছিল, ফলে কবিতার পংক্তিতে যে রক্তসঞ্চালন শুরু হলো পাঠ মাত্রই তায় স্পন্দন পাঠকের শরীরে সঞ্চারিত হয়—ফলে যে অনিবার্য শরীর গ্রহণে প্রতিবাদ পেলো কাব্যিক চেহারা তা প্রায় ক্ষেত্রেই শিল্পের অভিমুখিন হতে পেরেছে, অনেক রচক যে মেলবন্ধন ঘটাতে পারেন নি, সুকান্ত তা অনায়াসেই পেরেছেন বলেই এক্ষেত্রে এই স্বভাবকবি অননুকরণীয় সিদ্ধি অর্জন করতে পেরেছিলেন। সুকান্তর অমরত্বের লোভ ছিল কি না বলা কঠিন, কিন্তু আজকের পৃথিবীর বিক্ষুব্ধ যুব-মানসের নিপুণ প্রতিনিধিত্ব যে তিনি করছেন তা হয়তো তাঁর পক্ষে বুঝে নিতে সময় লাগেনি, তাই বক্তব্য পূর্বাহ্নেই স্থির বলে উচ্চারণে দ্বিধা প্রশ্রয় পায়নি, টান টান গদ্যের মর্জিকে স্বরবৃত্তে মাত্রাবৃত্তে অক্ষরবৃত্তে অবহেলে চালনা করেছেন ; কোথাও অসঙ্গত মনে হয়না—বিষয়ের গুরুত্ব অন্তর্জাত বিশ্বাসের সঙ্গে মিলনই এর কারণ, ফলে একবার শোনা মাত্রই মিত উচ্চারিত পংক্তিগুলি অব্যর্থ প্রবচনের মতন ঝলসে ওঠে ; এও সম্ভব হয়েছিল বিষয়ের সঙ্গে বিশ্বাসের স্বাভাবিক মিলনের ফলে, বহু মানুষের

লোকায়ত দুঃখ-যন্ত্রণা, আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপনার সঙ্গে নিজের ব্যক্তিগত প্রশ্নগুলিকে মিলিয়ে দেখতে পেরেছিলেন বলেই অকৃত্রিম সারল্য তাঁকে একধরনের সিদ্ধির দিকে নিয়ে গেছে। তাঁর কাছে কবিতা শুধু ব্যক্তির অস্তিত্ব ও তার পরিত্রাণের পারগেটিভ নয়, অসহায় মানুষের আত্মরক্ষার অস্ত্র, ফলে এক ধরণের সার্থকতা তিনি অবশ্যই অর্জন করেছেন যা বহু মানুষের প্রয়োজনে নিত্য ব্যবহার্য হতে পারার গৌরবে গৌরবান্বিত।

সুকান্তর অনেক কবিতাই কিশোর বয়সে যে রকম অমোঘ মনে হতো আজ আর তেমন নয়, এখন শিল্পে এক স্তর নয়, বহুস্তরের সন্ধান করি, অনেক জটিল অরণ্যে হারিয়ে গিয়ে নিজের স্বরূপে ফিরে আসতে চাই, আর সুকান্ত লক্ষ্যভেদে অর্জুন জেনেও লক্ষ্যচ্যুত এই আমি চেনা-পথে বাড়ী ফিরতে পারি না। সুকান্তকে বড় বেশি জেনে গেছি, তাই আকর্ষণের ক্ষেত্র স্বাভাবিক কারণেই বদল হয়েছে, তথাপি যখনই চলমান জনতার দিকে তাকাই তখন মনে হয় ওই ভিড়ের হৃদয়ে হয়তো সুকান্তই সাম্রাজ্য মেলেছেন। আমার মনে পড়ে সেই ছোট্ট কবিতাটি যেখানে সমাহিত হতে চেয়ে সুকান্ত তাঁর পরিচিত পৃথিবীকে, প্রিয় শব্দগুলিকে অবহেলে শিল্পীত স্বীকারোক্তির পর্যায়ে নিয়ে গেলেন ; উত্তাপ নয়, তাপিত ব্যক্তিত্ব পরিপার্শ্বে স্থাপন করে জীবনের অন্তর্গত অসহায়তা উপলব্ধি করে, বেরিয়ে আসে সেই অমোঘ পংক্তি যা যে কোনো মানুষের, আজকের সমস্যাকীর্ণ অসহায় আত্মার কাছে অনাবৃত উপলব্ধির মর্যাদা পায়, ছোট্ট কবিতাটির কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করলাম :

> ব্যর্থতা বুকে, অক্ষম দেহ, বহু অভিযোগ আমার ঘাড়ে
> দিনরাত শুধু চেতনা আমাকে নির্দয় হাতে চাবুক মারে।
> এখানে ওখানে, পথে চলতেও বিপদকে দেখি সমুদ্যত,
> মনে হয় যেন জীবন ধারণ বুঝি খানিকটা অসঙ্গত।
>
> (অসহ্য দিন)

‘বোধন’ আনন্দ বাগচী

কবিতা হচ্ছে সৃষ্টির জগতে ফুল, অকাজের কোজাগরী অস্তিত্ব। বিচ্ছেদে-বিলাসে-মৃত্যুতে-পূজোয় ফুল তার জায়গা ক’রে নিয়েছে সকলের আগে। শ্রুতির আগে, প্রতিশ্রুতির আগে, ব্যবহারের আগে। কবিতাও ফুলের মতই বৃন্তের বিন্দুতে সম্পূর্ণ রূপরসরঙের সমাস। ফুল কোমলতার দ্যোতক, তবু ফুলের ঘায়ে মুর্ছা যাই, ফুলশরে বিদ্ধ হই। নিস্ফল জীবন যদিবা ভাবতে পারি, নিস্ফুল জীবন পারিনে। তাই কথাটা নেই সংসারের অভিধানে। ফুল কেবল বিমূর্ত অনুভবের আদল নয়, তার মধ্যেই আছে গদ্যময় জীবনের নান্দীপাঠ, বাস্তব জীবনের পাঠান্তর প্রচ্ছন্ন কালিতে লেখা। ‘প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য’ একথা সেই হাতে-কলমে কবিই বলতে পারেন যিনি জানেন, ফুলের মধ্যে ফলতা আছে—কোনো ফুলই নিস্ফল নয়, প্রত্যেক ফুলেরই যোগ ফলে। ‘জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দিকে বাহিরায় ফল’।

কবিতা কুসুমের এই আলোচনা সুকান্তর কবিতা সম্পর্কে অবান্তর নয়। সুকান্তর কবিতা আকাশ কুসুম নয়, অগ্নি কুসুম। একুশ বছরের সেই সদ্য কিশোরান্ত যুবা, যে কবি হিসেবে আমার অগ্রজ হয়েও বয়সে আমার অনুজ। কারণ সেই বয়সে আজও সে স্থির আছে—সেই প্রথম যৌবনে এবং চিরযৌবনে—যে বয়স, যে যৌবন আমি অনেককাল পার হয়ে এসেছি, হারিয়েছি; কিংবা বলা ভাল যে-বয়সের কাছে আমার আজকের এই বয়স হেরে গিয়েছে।

তবু একদিন আমারও আঠার বছর বয়স ছিল—এমন কি আঠার বছরের চেয়ে অনেক কম বয়সও। দেশের মরা গাঙ জুড়ে সে সময় নানা ভাবের বন্যা এসেছিল। সেদিন আমরা সুকান্তর কবিতাকে

নিজেদের কণ্ঠস্বরে শুনতে পেতাম। সুকান্ত কবিতায় লিখেছিল আমাদেরই প্রাণের কথা। তাই সেই অনতি কিশোর বয়সে—সেই চদ্দো-পনের বছরে—যখন ধমনীতে বইছে রক্তের বদলে রক্তের বাষ্প, দেহ বাতাসের মতন যখন হাল্কা, মন জলের মত স্বচ্ছ,—কিন্তু মানুষটা আমরা আকাশেরই মত নীরব এবং একলা, তখন হাতে এসেছিল সুকান্ত, মানে সুকান্তর এই কবিতাটি বিশেষ ক'রে, বোধন।

কবিতা হিসেবে আরও ভাল কবিতা সুকান্তর নিশ্চয়ই আছে—অন্ততঃ আরও বেশী ক'রে কবিতা হয়ে উঠেছে এমন কবিতা। কিন্তু সব কবিতা সব মানুষকে, কিংবা কোনো কবিতাই একই মানুষকে সব সময় কিছু নাড়া দেয় না। একই ফুল এক এক অবস্থায় মানুষের যেমন এক এক রকম লাগে, কবিতা সেরকম তো বটেই, তার চেয়ে অনেকগুণ বেশীই মনের মধ্যে রঙ্ বদল করে। অনেক নিস্পন্দ মুহূর্তকে কবিতা স্পন্দমান ক'রে তোলে আবার অনেক স্পন্দিত মুহূর্তকেও নিস্পন্দ ক'রে দেয়। কবিতার তেমন যাদু আছে। কিন্তু স্থানকালপাত্র এবং আবহাওয়ার চতুর্মিলন ঘটা চাই সেই সঙ্গে। সকলের হাতে এবং সকলের কানে যেমন সেব ছেলেবেলার মাটির বেহালা বাজেনি—তেমনি ছেলেবয়সের পদ্য, উঠতি বয়সের কবিতা মূল্য এবং মানের ধার ধারে না, মানেও চাইনে সব সময়, শুধু রক্ত-কল্পনার মধ্যে নাড়া দেওয়া চাই।

আমার স্কুল জীবনের উঁচুতলা নীচুতলা জুড়ে, উত্তর কলকাতার যে প্রভাব, উত্তরোত্তর কলকাতার যে প্রতিক্রিয়া, তারই আবহ সঙ্গীত হয়ে কিছু গদ্য কিছু পদ্য তখনকার জাগ্রত দিনরজনীর মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতো। সামান্য কয়েকজন বন্ধু মিলে এমন এক সর্বক্ষণের মুক্তাঙ্গন রঙ্গমঞ্চে বাস করতাম আমরা, এমন এক ধারাবাহিক, অনবরত স্ত্রীভূমিকা বর্জিত নাটকে কুশীলব হয়ে উঠতাম—আমাদের মনের দুর্বোধ আকুতি, অমীমাংসিত ঝোঁক, নিঃসঙ্গ বয়োসন্ধির বাষ্প যেন আপাত-অসংলগ্ন অথচ পরিণামে সুগ্রন্থিত সংলাপের মধ্য দিয়ে

নিষ্কাষিত হতো। সেই নিকাশী ব্যবস্থাপনায় গদ্যের বহু কোটেশান, গানের অনেক তাজা কলি এবং কবিতার রাংতামোড়া স্তবকের পর স্তবক নিযুক্ত ছিল। সুকান্তর বোধন তেমনি এক কবিতা, যা আমাদের অনেক দুর্লভ মুহূর্তের নির্বাক মানসিকতাকে রূপ দিয়েছে। আমার দুই বা ততোধিক বন্ধু দেখা হবার সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত কোরাসে আবৃত্তি করেছি এবং তারপর হয়ত কোনো কথা না বলেই যে যার গন্তব্যে চলে গেছি। আমাদের কথা বলার কাজ অনেক সময়ই এমনিভাবে কবিতায় চালিয়ে দেওয়া গেছে। কথার যা আমাদের কাছে স্পষ্ট ছিল না, বরঞ্চ যে মনোভাব কথায় অনেক সময়ই অকথ্য ছিল বলা চলে—সেই অব্যক্তপ্রায় নিরুদ্দেশ তরুণ বেদনাকে এই কবিতায় এবং আরও অনেক কবিতায় ফোটানো গিয়েছে।

তবু এই কবিতার একটা নিজস্ব মাদকতা ছিলই, এখন যেন পিছন ফিরে তাকালে স্পষ্ট দেখতে পাই। বুদ্ধিমান, যুক্তবাদী মন সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করবে, কি সেই মাদকতা? এমন কি ঐশ্বর্য, এমন কি কারিগরী এর মধ্যে ছিল যা অন্যত্র ছিল না, এবং যার ফলে অন্য অনেক রচনার মধ্যে এই কবিতাটিই বিশেষ ক'রে তোমার মন-প্রাণ-কানকে টেনেছে? তোমার ওপরে মাদক প্রয়োগ করেছে?

প্রশ্নটা একবাক্যের, কিন্তু উত্তরটা এক কথায় সারা যাবে না। বিশ্লেষণ ক'য়ে দেখতে হবে। কিন্তু রসিকজনমাত্রেই জানেন, সে বিশ্লেষণেরই আর এক নাম শব-ব্যবচ্ছেদ। তাতে আমরা প্যাথলজি রিপোর্টের মতই ছন্দ পাবো, শব্দ পাবো, পাবো অলঙ্কার-চিত্রকল্প-অবয়ব সংস্থান, কিন্তু কবিতাকে পাবো না। অনেক তত্ত্ব জানতে পারবো, কিন্তু তৎক্ষণের পাঠক-মনের সঙ্গে কবিতাটির গূঢ় সম্পর্কের গোপন রহস্যটিই ধরতে পারবো না। আমার সেই বয়সে, সুদূরকালের সেই বাসস্থানে, সেই অভূতপর জলবায়ুতে ফিরে যেতে না পারলে কবিতাটির সম্পূর্ণ মূল্য যাচাই হবে না। কথায় আছে, যার সাথে

যার মজে মন, কবিতার ক্ষেত্রে তার সঙ্গে একটা 'যখন' যোগ হওয়া চাই। কোন্ কবিতায়, এমনকি কবিতার কোন্ লাইনে কখন যে আপনি মনেপ্রাণে জখম হবেন, কোন্ কবিতা যে কখন আপনাকে মজাবে—সেকথা বোধহয় আপনি নিজেও জানেন না।

পুরনো কথায় ফিরে আসি, Nostalgic Parabola-য়, সেই আমার কিশোর বয়সে। যুদ্ধ-শেষের কলকাতার কানাগলিতে সে যে কিসের বোধন হলো, কোন্ বোধের জাগরণ, বলতে পারি না। তবে সেই প্রথম এক অজ্ঞাত সূক্ষ্ম যন্ত্রণা জাগলো আমার ভেতরে। সেই প্রথম, সঙ্কীর্ণ, ক্ষুদ্র অসচ্ছল গণ্ডীকে অতিক্রম করার দুর্দমনীয় ইচ্ছা, স্বার্থ-লোভ-ভালবাসায় খণ্ডিত নিজেকে বৃহতের পদতলে বিসর্জন করার ইচ্ছা জাগলো। দিনরাত্তির বোধনের কবিতাগুলো আওড়াই আর গায়ে কাঁটা দেয় আমার।—

> হে মহামানব, একবার এসো ফিরে
> শুধু একবার চোখ মেল এই গ্রাম নগরের ভিড়ে
> এখানে মৃত্যু হানা দেয় বারবার ;
> লোকচক্ষুর আড়ালে এখানে জমেছে অন্ধকার।

এই মহাপুরুষের চেহারা সঠিক কি রকম আমাদের জানা ছিল না। কোন্ সূতিকাগারে, কোন্ নিদারুণ লাঞ্ছনার মধ্যে এই মহামানব ভূমিষ্ঠ হতে যাচ্ছেন তখন কি আর ঘুনাক্ষরেও জানতাম? দিকে দিকে রোমাঞ্চ জাগিয়ে যে মহামানব আসবে, ফুটপাত-বস্তী-কুঁড়েঘর তারই তোরণদ্বার—দারিদ্র্য আর অন্ধকার চিরদিনই তার শুশ্রূষায় ন্যস্ত, রক্তক্ষয়-হতাশা-অবিশ্বাস তারই প্রসব বেদনা—সেই যে অযোনিসম্ভূত মহাপ্রকাশ তারই অন্য নাম নতুন কাল, তখন কে জানতো! গ্রামে নগরে বন্দরে লক্ষ লক্ষ বহতা মানুষ, মানুষের বিন্দু বিন্দু নীহারিকা সমবেত হয়ে সেই মহামানবের জন্ম। সুকান্তর কবিতায় তারই অকাল-বোধন হয়েছে।

সেই যুগটাই ছিল গদ্যের সঙ্গে পদ্যের আসন রফার যুগ।

আধুনিক গানে পর্যন্ত গদ্য কবিতা, এমনকি নিছক গদ্য সসম্মানে দলিল রচনা ক'রে চলেছে। শহর-জীবন থেকে এক অভিনব গণনাট্য যেন লোকজীবনের দিকে ঢেউ তুলে ছুটে গিয়েছে। কঠোর-কঠিন গদ্যের সঙ্গে সপ্রতিভ কবিতার কঙ্কন-ঝংকার, পদাতিক গদ্যের মিছিলে উদ্ধত কবিতার পতাকা বহন শুরু হয়েছিল বলেই কবিতা শেষ পর্যন্ত মানুষের মেহনত থেকে ছুটি পায় নি, বরং জুটি বেঁধেছে।

বোধন কবিতাও মূলতঃ চম্পু কবিতা, গদ্যে পদ্যে মিলে এর আঙ্গিক কাঠামোটি তৈরি। মাত্রাবৃত্ত ছন্দ স্তবকে স্তবকে ঘুরতে ঘুরতে শ্লোগানোর মত শ্বাসাঘাতের কিনার ছুঁয়ে ধীর বিলম্বিত লয়ে প্রায় তানপ্রধানের কোটিতে গিয়ে থমকে গেছে। কারণ তখন আর পথ নেই, সামনেই অকস্মাৎ ছিলেছেঁড়া ধনুকের মত খাড়াগদ্য সংযত; আবেগে বর্জিত Matter of fact গদ্য, শপথ উচ্চারণের মত কূটবুদ্ধি-চালিত গদ্য। তারপরেই ফের ছন্দের তালফেরতা। আবৃত্তি-সফল এই কবিতায় আছে স্তবকে স্তবকে ছন্দের বৈচিত্র্য, শব্দের গাম্ভীর্য ও গমক, ভাবে ভাষায় তারুণ্যের স্বপ্ন ও সম্মোহন।

আগেই বলেছি, সুকান্তর কবিতায় আমরা একসময় নিজেদের কণ্ঠ শুনতে পেয়েছিলাম। বর্তমানকালে কবিতা পড়লে সেই বয়সের, সেই দিনকালের, সেই যুগের জলবায়ু, আবহাওয়ার ছায়া ভেসে ওঠে। কবিতা হিসেবে আমাদের কাছে আজ বোধনের যে কাব্যমূল্যই যাচাই হোক, তার যে অপর এক ভাবাবেগের মর্যাদা আছে তা অবশ্যই স্বীকার্য। অন্ততঃ আমার নিজের কাছে তো বটেই। সুকান্তর বোধন কবিতাটির সঙ্গে আমার সেই গ্রাম্যনাগরিক জীবনসন্ধিক্ষণের, উত্তর কলকাতার একটি অন্ধগলি এবং ক্ষতাবরণ ব্যাণ্ডেজের মত ন্যস্ত এক ফালি আকাশ এবং কিছু অবিস্মরণীয় মানুষের প্রদীপ্ত কণ্ঠ মিশে আছে। সেই বাষ্পরুদ্ধ দুরন্ত বয়স, সেই চন্দ্রো পনেরর ক্রসওয়ার্ড, সেই তীব্রতম আত্মাভিমান জড়িয়ে আছে এই কবিতার ছন্দভঙ্গিমায়। এবং সেই সঙ্গে, একটি তরুণ তাজা প্রতিভার

অকাল বিনাশ, আত্মবিলোপের মতই কবিতাটির প্রতি ছত্রাক্ষরে ছড়িয়ে রয়েছে। আজ বোধন আবৃত্তি করে টের পেলাম, নিজের কাছেই নিজের পুনরাবৃত্তি করছি, নিজের কিশোর বেলার অকাল-বোধন ঘটাচ্ছি। পূর্বস্মৃতির উদ্বোধন এবং আত্মবিলাপই এই কবিতার সেই অনন্যসাধারণ ঐশ্বর্য এবং মাদকতা তাতে সন্দেহ নেই।

আজ এই স্মৃতি রোমন্থনঘটিত ক্ষুদ্র নিবন্ধটি শেষ করতে বসে, বাইরে যখন ঘন ঘন বোমা ফাটছে, মনে পড়ছে বোধনের কয়েকটা লাইন। শুধু সেই বয়োসন্ধিতেই নয়, এই যুগসন্ধিতেও তা কত লাগসই।—

……বুঝবো তুমি তো মানুষ নও—
গোপনে গোপনে দেশদ্রোহীর পতাকা বও।
ভারতবর্ষ মাটি দেয়নিকো দেয় নি জল
দেয়নি তোমার মুখেতে অন্ন, বাহুতে বল
পূর্বপুরুষ অনুপস্থিত রক্তে তাই
ভারতবর্ষে আজকে তোমার নেইকো ঠাঁই।

ভোলা সম্ভব নয়

প্রস্যূন বসু

বয়স বাড়বার সংগে-সংগে আমাদের জীবনে অনেক পরিবর্তন আসে। তাজা তরুণ বয়সের অনেক চিন্তা-ভাবনাই আমাদের মন থেকে আস্তে-আস্তে মুছে যায়। আমরা নিস্তেজ হয়ে পড়ি অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়ে পিছনের সিঁড়ির দিকে পা-বাড়ানো বিশেষভাবে আমাদের শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের অভ্যাস। তরুণ বয়সের প্রিয় কবি-সাহিত্যিকরা ধীরে-ধীরে তখন অনেক দূরে সরে যান।

কিন্তু আমাদের বয়সী মানুষ, যারা সবে চল্লিশের কোটায় পা দিতে চলেছি, অনেক অভ্যাসের মতো কিছু কবি-সাহিত্যিককে মনের মাঝে বহন করে জীবনের শেষ ধাপের দিকে এগিয়ে চলেছি, তারা কি কোনমতেই অস্বীকার করতে পারি যে কতিপয় সেই কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে সুকান্ত ভট্টাচার্য অন্যতম।

সুকান্তর মৃত্যুর পর দীর্ঘ তেইশ বছর কেটে গিয়েছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে অসংখ্য পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু এই পরিবর্তন সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের মতোই সুকান্ত বাংলা সাহিত্যের আকাশে উজ্জ্বল তারার মতো জ্বল-জ্বল করছে। আজও সুকান্তর কাব্যগ্রন্থের বিক্রি সংখ্যা অনেককেই হার মানায়। আমাদের পরবর্তী এবং তারও পরবর্তী মানুষের মধ্যে সুকান্তর স্থান যে অম্লান এই কথাই এ-থেকে স্পষ্ট হয়।

সুকান্তকে নিয়ে বিচার বিশ্লেষণেরও যেন শেষ নেই। স্কুল-কলেজের ছাত্র থেকে আরম্ভ করে প্রতিষ্ঠিত সমালোচকেরা পর্যন্ত সুকান্তর মূল্যায়ন করবার চেষ্টা করেছেন ও করছেন। শুধু এ-পারের বাঙলাদেশেই নয়, ও-পারের বাঙলায়ও সুকান্ত-চর্চার শেষ নেই।

বাঙলা সাহিত্য জগতে সুকান্ত বিচরণ করেছিলেন মাত্র সাত বছর। সুকান্তর জীবনের পরিধিও খুব সংক্ষিপ্ত। মাত্র একুশ বছর বয়সে তাঁকে পৃথিবী ত্যাগ করতে হয়েছে। সামান্য এই সাত বছরের মধ্যেই বাঙলা সাহিত্যকে তিনি প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাঙলা সাহিত্যে তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র, অনন্য। তাই আলোড়ন এতো তীব্র, এতো প্রবল।

বাঙলা তথা ভারত তথা পৃথিবীর এক যুগ-সন্ধিক্ষণে সুকান্তর সাহিত্য জীবনের শুরু। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে। ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে জাগ্রত সমগ্র মানব সমাজ। আমাদের পরাধীন দেশে যুদ্ধের পরিণতি অবশ্য হাহাকার, বুভুক্ষা। হতাশায় হতবাক বাঙালী জনমানস। পরবর্তীকালে সেই হতাশা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে পরিণত হলো। সোচ্চার কণ্ঠে ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হলো স্বাধীনতার মর্মবাণী। এবং ১৯৪৭-এ দেশ হলো স্বাধীন। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, তখন সুকান্ত নেই। তার কয়েকমাস আগে তিনি পৃথিবী ত্যাগ করেছেন। স্বাধীন ভারতবর্ষ দেখার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি।

অগ্নিগর্ভ এই সময়ই সুকান্তর কবিতায় পরিস্ফুট।

অগ্নিগর্ভ এই যুগের ইতিহাসই যেন তাঁর কবিতা।

সমাজসচেতনতাই তাঁর সাহিতের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সচেতনতা অর্থাৎ শুধু বর্তমান নয়, ভবিষ্যতের দিক নির্দেশ। প্রথম জীবনের অধিকাংশ কবিতায় লক্ষ্য করা যায় হতাশা। সমান্য তখন বয়স। মাত্র চদ্দো বছর। কৈশোরের শুরু বলা যেতে পারে। জীবন সম্পর্কে ধারণা তখন স্পষ্ট হওয়া সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও যুগযন্ত্রণা তীব্র। এবং প্রথম যুগের কবিতায় সেই যুগযন্ত্রণা প্রতিফলিত। এবং এই সময়ের কবিতাগুলিই তাঁর 'পূর্বাভাস' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত। 'পূর্বাভাস', 'ঘুম নেই' এবং 'ছাড়পত্র' পরপর সাজিয়ে পড়লেই লক্ষ্য করা যায় ক্ষণিক হতাশা কাটিয়ে উঠে বিদ্রোহের আহ্বানে কিভাবে মুখরিত হয়ে উঠলেন কবি।

'পূর্বাভাসে' যা ছিলো অঙ্কুর 'ছাড়পত্রে' তাই মহীরূহের রূপ ধারণ করলো। একদিকে সাম্যবাদী গণআন্দোলনে যোগদান, অন্যদিকে তার অভিজ্ঞতায় নিজেকে শিক্ষিত করে তুলে তিনি হয়ে উঠলেন বিদ্রোহের কবি শুধু নয়, ভবিষ্যতের কবি। ভবিষ্যৎ তাঁর কাছে হয়ে উঠলো স্পষ্ট, জীবনের মতোই স্পষ্ট।

কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের মতো আমারও বলতে ইচ্ছে করে 'বালক বয়সে এই কবি জ্ঞানবৃদ্ধ'। প্রকৃতই তাই। তা না হলে ভাবের গভীরতা কিভাবে এই বয়সে মেলা সম্ভব। তা না হলে কিভাবে এই বয়সেই সাম্যবাদী চিন্তার প্রভাবে এতো গভীরভাবে প্রভাবিত হওয়া সম্ভব।

সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের পরিবর্তন সত্ত্বেও সুকান্ত আজও আমাদের টানছেন। নিরুত্তাপ জীবনে উত্তাপ বিকিরণ করছেন। সুকান্তর কবিতা পড়লে তাই আজও নিজের অজান্তে শিড়দাঁড়া সোজা হয়ে ওঠে। নিজেকে একটা জীবন্ত, তাজা মানুষ মনে হয়। তাই জীবনে অনেক কিছু পরিত্যাগ করলেও সুকান্তকে পরিত্যাগ করতে পারিনি। পারা সম্ভব নয়।

শ্রেণী-চেতনার পারম্পর্য নিরিখে

সুকান্ত এবং রবীন্দ্র-নজরুল

জিয়াদ আলি

প্রাক চল্লিশের বাংলা কবিতার যুগ যখন মূলতঃ কবিতার শিল্পগত উৎকর্ষতার নামে ইলিউশন, সুপার স্ট্রাকচার প্রভৃতি কতকগুলি কথার খোলসে কবিতার চেতনাকে জীবনের নামে জীবন বিমুখ ভাবনার সংশয়-স্বাভাবিকতায় এবং সাহিত্যের বিস্তারণ-সূত্রের নামে শুধুমাত্র প্রকৃতিবাদী রোমান্টিক প্রতিক্রিয়া সঞ্জাত ভাবনার বিলোল বিলাসিতায় ও অহিফেন-অবসাদগ্রস্ততায় ঘুমপাড়ানী দৈন্যের নিদারুণ নির্লিপ্ত প্রক্রিয়া চিত্রায়ত করার অপপ্রয়াস সুচিহ্নিত তখন বাংলা কবিতার অপুষ্ট অবয়বে "গণ" নামের একটা নতুন শব্দ সংযোজনজনিত দূরপণেয় দুঃসাহসিকতায় বাংলা কবিতার আরেক নতুন মানসিকতার জন্মদান ক'রে কবিতাকে নতুন সংজ্ঞায় সুচিহ্নিত করতে পেরেছিলেন যাঁরা, সুকান্ত হলেন সেই কবি চরিত্রেরই একটি সার্থক ও সুপরিণত অবয়ব। বাংলা কবিতার ঐতিহাসিক ক্রম-বিকাশের ধারায় কবিতার এই স্বকীয় আবাসশীর্ষে পৌঁছতে গিয়ে যে পথচলা রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্য-জীবনের শেষ দশকে শুরু করিয়ে দিয়েছিলেন এবং নজরুল-কাব্যের চারণ-কথকতায় যার সুপুষ্ট ব্যাপ্তি-বিস্তারণা বিপুল সার্থকতায় প্রোজ্জ্বল—সেই আদি ও মধ্যধারার পুর্ণাবয়ব এসে শেষ এবং সার্থক প্রতিফলনে সিদ্ধান্ত ঘোষণায় সুচিহ্নিত হয়েছে সুকান্তের কবি-চেতনায়। বাংলা কবিতার এ ধারার নাম যদি বলি কবিতার গণ-চেতনা প্রবাহ তাহলে রবীন্দ্রস্মৃতি বুকে ধরে নজরুল আর সুকান্তকেই বলা যায় এই চেতনার সার্থক উদ্‌গাতা। বাংলা কাব্যধারার এই বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যতার নামই হলো গণচেতনার কবিতা।

তাই রবীন্দ্রকাব্যের শেষ দশককে যদি রবীন্দ্রকাব্য-পরিক্রমার একটা ভিন্নদশক হিসাবে চিহ্নিত করি তাহলে বলা যায় এই গণচেতনামুখীন অভিকর্ষের অদূর অবশ্যম্ভাবিকতা রবীন্দ্রকাব্যের শেষ দশকের দর্পণে প্রোথিত হলেও গণচেতনার তুলনামূলক বিস্তারে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তখন যে স্তরবিন্যাস তার সঙ্গে নজরুলের পার্থক্য, আবার নজরুলের কাব্যচেতনার যে বিকাশ তার সঙ্গে সুকান্তের কবিতা ভাবনার বৈশিষ্ট্যগুলিকে সঠিকভাবে অনুধাবন করলেই বাংলা কবিতার এই গণচেতনামুখীন অভিকর্ষের আদি, মধ্য ও অন্ত প্রকৃতির পটভূমিকায় সুকান্তের যথাযথ মূল্যায়ন সহজসাধ্য হয়ে উঠবে।

যুদ্ধ শুধু মানুষের মুখই বদলায় না, বদলায় মানুষের ইতিহাস-চেতনার আবেগও। আর সাহিত্য-সংস্কৃতি যখন সেই মানবিক চিন্তার পরিবেশজাত ফসলের দর্পণ তখন সেই দর্পণেই সুচিহ্নিত হয় পরিবর্তিত অবস্থায় নতুনতর দিকদর্শন। রবীন্দ্রনাথের কবি অনুভবও তাই স্বাভাবিক কারণেই যুদ্ধোত্তর অনুভবের এক নতুন দর্শনকে প্রতিফলিত করে। নিছক প্রকৃতিতান্ত্রিকতার বেড়া ভেঙে তাই যুদ্ধোত্তর দুনিয়ার দিকে চেয়ে শুরু হয় রবীন্দ্রনাথের এক নতুন পদচারণা। তখন রবীন্দ্রমানসিকতা-প্রবাহী মূল সুরটি সমাজবাস্তবের দ্বান্দ্বিক সংকটজনিত চেতনার অভিজ্ঞ আঁচে সকচিত হয়ে ওঠে। কিন্তু তার মানসিক পরিমণ্ডলটি সামন্তশাহী চেতনা প্রবাহে শুরু থেকেই পরিপুষ্ট থাকায় এবং তার সমাজ-বাস্তবতার উপলব্ধি যতোখানি মানবিক আবেগের মহান অনুভবে অনুরণিত ঠিক ততোখানি সমাজ-বিজ্ঞানের সূত্রানুসারী শ্রেণী-চিন্তার রাজনীতিক ব্যাখ্যার অনুগামী নয় বলেই তার জীবনদর্শনের সামগ্রিক অনুভব শ্রেণীগত ভাবনায় পরিপূর্ণরূপে পরিশোধিত হয়ে উঠতে পারে না। কিছু দ্বন্দ্ব এবং কিছু দ্বিধা সেখানে স্বাভাবিক কারণেই থেকে যায়। তাই তাঁর রাজনীতিক ভাবনার নৈরাজ্যবাদ ও সামাজিক ভাবনার অধ্যাত্মবাদ থেকে তিনি পরিপূর্ণরূপে মুক্ত

হতে পারেন নি। আর এই দ্বন্দ্ব ভাবনা নিয়েই সর্বোপরি একটা মহৎ মানবিক চিন্তার আবেগে তার অনুভবকে অনুরণিত করতে চেয়েছিলেন বলেই তার মহানুভবতা সার্থক, সত্য ও সুন্দর। সি. এফ. এনড্রুজকে লেখা তাঁর এই চিঠিতেই এই মূল সুরের অভিব্যক্তি দেখা যায়।

"To me humanity is rich and large and many-sided. Therefore I feel deeply hurt when I find that for material gain, man's personality is mutilated in the western world and he is reduced to machine." [Letter to C. F. Andrews, New York, January, 14, 1921.]

শুধু ইউরোপের ক্ষেত্রেই নয়, আমাদের দেশের ক্ষেত্রেও তাঁর অনুভব এভাবেই ঐ চিঠিরই পরের অংশে ব্যক্ত হয়েছে:

"The same process of repression and curtailment of humanity is often advocated in our country under the name of patriotism. Such deliberate impoverishment of our nature seems to me a crime."

প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে স্পেনের ওপর ফ্যাসিস্ত ফ্রাঙ্কো বাহিনীর আক্রমণের ঘটনায় [Mr. Tagore's appeal, The Statesman, Calcutta, March 3, 1937] কবির প্রতিবাদের কথা কিংবা চীনের ওপর তিরিশের দশকে জাপানের সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপ দেখে তার নেগুচির লেখা চিঠির প্রত্যুত্তর (সেপ্টেম্বর ১, ১৯৩৮ ও অক্টোবর ১৯৩৮) কিংবা রম্যাঁ রলাঁকে লেখা তাঁর চিঠির কথা (১৯১৯) এবং অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র [কবিতা, চৈত্র, ১৩৪৯] প্রভৃতি। এ সব ঘটনায় একদিকে যেমন তাঁর আন্তর্জাতিক ভাবনার সৎসাহসিক জীবনদর্শন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তেমনি স্বদেশের ক্ষেত্রেও যখন হিজলী জেলের বন্দীদের ওপর সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের

গুপ্তঘাতী গুলি বর্ষণের ঘটনা ঘটে তখন তথাকথিত জাতীয়তাবাদী নেতারা (~~গান্ধী তো বটেই, এমনকি দেশবন্ধু পর্যন্ত~~) সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় ভীত সন্ত্রস্ত হলেও রবীন্দ্রনাথ যে স্বকীয় উপলব্ধিতে মনুমেণ্টের পাদদেশে প্রকাশ্য জনসভার আয়োজনে এসে দাঁড়াতে পেরেছেন তা তাঁর মহান মানব প্রেমের মহানুভবতাকেই সুচিহ্নিত করে। তাঁর সভ্যতার সংকট (১৯৪১) রচনা, তার Messeage to Landon Civil Liberty conference [অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৭ই অক্টোবর, ১৯৩৭] কিংবা হাওড়ার চটকল শ্রমিক ধর্মঘটের সমর্থনে জনসাধারণের কাছে তাঁর অর্থ সংগ্রহের আবেদন [অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৯৩৮] প্রভৃতি ঘটনা থেকে ঠিক অনুরূপ সিদ্ধান্তই করা যায়।

কিন্তু এ সব ঘটনার পেছনে যে শ্রেণী-অর্থনীতির মূল স্বার্থ বর্তমান তার বস্তুবাদী বিশ্লেষণের প্রতিপাদ্যে শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা গঠনের যে বৈপ্লবিক রণনীতি ও রণকৌশল চিরন্তন নিয়মে অবশ্যম্ভাবী তাঁর পথ-পরিক্রমার বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যাকে আন্তরিকতা সত্ত্বেও তিনি স্থির সিদ্ধান্ত হিসাবে খাড়া করতে পারেন নি। সেখানেই তিনি বাঁধা পড়ে গেছেন তাঁর দর্শন-ভাবনার ট্র্যাডিশনগত সূত্র-পন্থায়। কিন্তু তা যে পরবর্তী উত্তরসূরীদের দ্বারা সংগঠিত হবেই এমন আশার আলোক তিনি উপলব্ধি করেছিলেন আত্যন্তিক প্রেরণায়।

তাই রুশ বিপ্লবের ফলে যে নতুন সমাজব্যবস্থা জন্ম নিলো তা দেখে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন এবং তাঁর স্বদেশে সেই সমাজব্যবস্থার সম্ভাবনা দেখার জন্য তিনি ব্যাকুল হলেও তার পথ নির্দেশ অর্থাৎ কিভাবে সেই বিপ্লবমুখীন অভিকর্ষের জোয়ার সৃষ্টি হবে তার ব্যবহারিক কৌশলের কথা বলা তাঁর পক্ষে ছিল সঙ্গতভাবেই অসম্ভব যা পরবর্তীকালে নজরুলের মধ্যে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানে সম্ভব হয়েছে। তাই রুশ বিপ্লবের প্রেরণায় নজরুল যখন তার

আখ্যানবস্তু তৈরী করে ['ব্যাথার দান', 'হেনা', গল্প দ্রষ্টব্য] তখন রুশ বিপ্লবের 'লালফৌজ'ই যে শোষিত জনগণের মুক্তিদাতা ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের মুক্তিদূত সে কথা নজরুল সোজাসুজি ঘোষণা করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, আমাদের দেশে জাতীয়তাবাদী চিন্তার বোনোজলে যখন অনেক রাজনীতিক ও কবিসাহিত্যিক ওয়েদার ককের মতো গা ভাসিয়েছিলেন তখন কবি হিসাবে একমাত্র নজরুলই উপলব্ধি করেছিলেন যে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণী ছাড়া অন্য কোনো শ্রেণী সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারে না। তাই কবিকে বলতে দেখি :

তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর মুটে ও কুলি
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগালো ধূলি
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদের গান
তাদেরই ব্যথিত অঙ্গে পা ফেলে আসে নব উত্থান।

আর এই জনগণউত্থানজনিত ঘটনায় কোনো শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানজনিত আপসমুখী মাঝামাঝি চোরা-পথ নয়—এ বিপ্লব—একেবারে রক্তক্ষয়ী বিপ্লবমুখীন সংঘাতেই শ্রেণী-শত্রুর কবর খুঁড়তে হবে—এই অনুভবের সুর নজরুল তাঁর সমগ্র রচনাতেই প্রতিধ্বনিত করে তুলেছেন সোচ্চারে, অভিজ্ঞ আন্তরিকতার, আন্তর্জাতিক চেতনার অভিঘাতে। তাঁর আন্তর্জাতিক সংগীতের অনুবাদ অনুপ্রেরণা [বাংলা ভাষায় নজরুলই প্রথম] এখান থেকেই।

কিন্তু এ সত্ত্বেও, নজরুলের সমগ্র সাহিত্য-গাথাই নিপীড়িত মানুষের জীবন-বেদাশ্রয়ী হলেও তার মূল সুরটি রাজনীতিক চেতনার পর্যায় বা ক্রম অনুসারী নয়—এমন ঘটনাও কিছু কিছু লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য তাঁকে কোথাও কোথাও বিশেষিত করেছে।

যেমন নজরুল যে বিশের দশকে শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ফসল "বিদ্রোহী" দিয়ে পাঠকের মনে প্লাবন সৃষ্টি করেছিলেন সেই দশকেই হুগলীতে গান্ধীজীর আগমন উপলক্ষে নজরুল গান ও কবিতা রচনা

করেছিলেন। এ সম্পর্কে নজরুলের অকৃত্রিম বন্ধু শ্রদ্ধেয় মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ নজরুল সম্পর্কে তাঁর লেখা শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য গ্রন্থে লিখেছেন "পরে তার মুখে শুনেছি যে গান্ধীজী এই গান ও কবিতায় খুবই খুশী হয়েছিলেন। তিনি নাকি তাকে বলেছিলেন যে রাত্রে তিনি কবিকে স্বপ্নেও দেখেছেন।"

"গান্ধীজীর আগমনে যদিও নজরুল চর্‌খার কবিতা লিখেছিলো তবুও সে স্থির নিশ্চিন্ত হয়েছিল যে চর্‌খা ও খদ্দরের মারফতে দেশে স্বাধীনতা কোনোদিন আসবে না। তাই তার মন জনগণের দিকে ঝুঁকে পড়ে।" [মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ : কাজী নজরুল ইসলাম : : স্মৃতিকথা, পৃঃ ৩৫৩]

প্রকৃতপক্ষে জাতীয়তাবাদী কোনো নেতার প্রতিই তখন নজরুলের শ্রদ্ধা ছিল না। এবং কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেও যে নজরুলের কোনো আস্থা ছিল না তাঁর কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করার পরিকল্পনার মধ্য দিয়েই বোঝা যায়। এ ক্ষেত্রে সুকান্ত যেমন আশৈশব কাল থেকেই গণসংগঠন ও রাজনৈতিক মিটিং-মিছিলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে দিয়েছিলেন নজরুলও তেমনি মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, আবদুল হালীম প্রমুখ কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাদের সঙ্গে সভা-সমিতি সংগঠন করে বেড়িয়েছেন। কিন্তু নজরুল তাঁর স্বভাব চরিত্রের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী একটা সঠিক নিয়মে বাঁধতে পারেন নি। আর এই জন্যই বোধহয় তাঁর হিতৈষীদের নিষেধ সত্ত্বেও কবি পূর্ববঙ্গে গিয়ে হঠাৎ কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে আইন সভার নির্বাচনে দাঁড়িয়ে গেলেন। বলা বাহুল্য কবি সে নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন।

এ সব ঘটনায় নজরুলের স্বভাব বৈপরীত্য এবং তাঁর চরিত্রের পরিমিতি বোধের শৈথিল্য প্রকাশ পায়।

এমন কি বলা যায় 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি তথাকথিত সোশ্যাল ভ্যালুকে একেবারে তুড়ি মেরে নস্যাৎ করে দিতে গিয়ে কবিতায়

ফর্মের দিক থেকে প্রকরণগত বৈশিষ্ট্যে যে প্রচণ্ড গতিময়তা সৃষ্টি করেছেন ঠিক সেই অনুপাতে কনটেন্‌টের বিচারে কোনো কোনো লাইনে তাঁর আপাতঃ বৈপরীত্যও বর্তমান। কিন্তু কবিতার সামগ্রিক আবেগ যেভাবে কবিতাকে রসোত্তীর্ণ করেছে তাতে এই বৈপরীত্যের সেখানে কোনো মূল্যই নেই বলা যায়।

এ ছাড়া নজরুলের জীবন-দর্শন আগাগোড়াই বাস্তব এবং কিছুটা অবাস্তবের দ্বন্দ্বে দোলায়িত যে ছিল না এমন কথাও বলা যায় না। তিনি মুখে নাস্তিকতার কথা ঘোষণা করলেও মূল বিষয় হিসাবে নাস্তিকতাকে তাঁর কোনো প্রবন্ধে আলোচনা করেন নি বলে জানা যায়। এবং কবি যেখানে লেখেন "আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দেব পদচিহ্ন" সেখানে পরবর্তী সময়ে আদালতে তিনি যে "রাজবন্দীর জবানবন্দী" দাখিল করেছিলেন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের ভাষায় "সেটা তো 'ভগবান' চর্চিতই বলা যায়।"

[ঐ, পৃ. ৪৪৮]

নজরুল মূলতঃই সর্বহারা শ্রেণীর রাজনীতিতে আস্থাবান হলেও 'ধূমকেতু'তে তাঁর কিছু কিছু এমন লেখাও তিনি লিখেছেন, যে সব লেখা থেকে সন্ত্রাসবাদী রাজনীতিতে বিশ্বাসী লোকেরাও উৎসাহিত হয়ে উঠতেন। এবং আরও শেষকালে [তাঁর অসুস্থতার কিছু আগে] নজরুল কিছুটা আধ্যাত্মিক ছোঁয়াতেও আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর রচিত শ্যামা-সঙ্গীতগুলির মধ্যেই এই মানসিকতার পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যায়। অনেকে মনে করেন তাঁর এই আধ্যাত্মিকতা অনুসারী মননের সৃষ্টি তাঁর পারিবারিক জীবনের কয়েকটি শোকাবহ ঘটনা-সংঘাতেরই [তাঁর একান্ত প্রিয় পুত্র বুলবুলের মৃত্যু ঘটনা উল্লেখ্য] একটা বিচ্ছিন্ন অভিক্ষেপণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

সে যাই হোক, কবিতার ক্ষেত্রেও যে প্রচণ্ড সমাজ-বাস্তবতা নজরুলের জীবন-দর্শন চিহ্নিত করে সেখানেও পাশাপাশি রোমান-টিকতাবাদও দেখা যায় তাঁর কবিতার আশ্রয়স্থল। তাঁর কবিতা

বা গানের এই বৈপরীত্য দেখেও কিন্তু একটা বিষয়ে অবাক্ হতে হয় যে, যে প্রচণ্ড আবেগ-উচ্ছ্বাসে তাঁর কবিতা সামুদ্রিকতায় প্লাবিত সেখানে সব বৈপরীত্যই যেন ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে গেছে। মায়াকভস্কি বা নাজিম হিকমতকে ধরেও সমগ্র পৃথিবীর সাহিত্যে সাধারণ মানুষের জীবনযন্ত্রণাকে এতো আপন ব্যাথার আবেগে সোচ্চার করে তুলতে নজরুলের মতো আর কেউই পারেন নি। তিনি যেন "বাঁধের আগল খুলে জীবনের মুক্তধারা বইয়ে দিলেন কাব্য ক্ষেত্রের আনাচে কানাচে" [ভাষাটি ফরাসী সাহিত্যিক লুই আরাগঁ-এর]। এদিক থেকে গণচেতনার সার্থক দিশারী হিসাবে তাঁর নাম শীর্ষস্থানীয় হলেও সামাগ্রিকভাবে একটা রাজনীতিক পথপরিক্রমা ও পারম্পর্যের বিচারে তাঁর জীবন-ভাবনার সিদ্ধান্ত-সূত্র কিছুটা পরিমাণে স্ব-বিরোধিতাধর্মী এমন কথাও না বলে পারা যায় না। এখানেই আবার সুকান্তর কাব্যভাবনার অনন্যতা।

১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭—মাত্র এই কয়েকটি বছরই সুকান্তের কবি-ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশের কাল। আর এই স্বল্পকালীন পথচলার মধ্যেই দেখা যায় সুকান্ত অদ্ভুত নিয়মে জীবনের পরিমিতি বোধকে আয়ত্ত করে নিয়েছেন এবং তাঁর কবিতার চেতনা পারস্পরিকভাবে ফুলের মালার মতোই সূত্রানুযায়ী গ্রথিত। 'বোধন' কিংবা 'রানারে' যেখানে তিনি গভীর আবেগে দীপ্যমান সেখানেও যেমন সংযম-স্বাধীন কাব্যভাবনার বিকাশ আবার ঠিক তেমনি 'প্রিয়তমাসু'র মধ্যে যে মানসিক রোমান্‌টিকতাবাদ তা বস্তুতান্ত্রিক মূল্যবোধের সীমানা ছাড়িয়ে অস্থির আবেগে ভেসে যায় নি। তাঁর জীবনের দর্শনবোধ যে প্রচণ্ড রাজনীতি-সচেতনতার কেন্দ্রাতিগ শক্তিতে বাঁধা তা তাঁর এই পরিমিত পথসঞ্চারী ছন্দের মধ্যেই ধরা পড়ে।

তাই সুকান্তের সমগ্র কবিতার দর্শনে একটা মানুষের ছবি ভেসে ওঠে যে মানুষ জোর করে বলতে পারে 'আমাদের পথচলা এমনি করেই, এমনি ভাবেই। এ ভাবেই পথ চলতে হয় এবং হবেই।'

সেই মানুষ তাই শুধু জীবনের চারণ মানুষ নয়। সেই মানুষ বাস্তবতই যেন এক ঋত্বিক। তাই কবি যখন লেখেন :

এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান ;
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ পিঠে
চলে যেতে হবে আমাদের।
চলে যাব—তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি—
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।
অবশেষে সব কাজ সেরে,
আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
করে যাব আশীর্বাদ,
তারপর হব ইতিহাস॥ (ছাড়পত্র)

কিংবা যখন কবি বলেন :

প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা,
ভেঙেছিস ঘরবাড়ি
সে কথা কি আমি জীবনে মরণে
কখনো ভুলিতে পারি ?
আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই
স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের
চিতা আমি তুলবই। (বোধন)

তখন সুকান্তের এ লেখা পড়ে যদি কেউ বলে থাকেন এ লেখা শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ফসল, তবে তা মোটেই অত্যুক্তি নয়। এবং আমারও মনে পড়ে তখন লুই আরাগঁ-এর একটি সমালোচনামূলক মন্তব্য—"এ কথা বলছি না যে, সাহিত্যে কদাচ শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গি থাকা উচিত নয়। সাহিত্যিকদের রচনায় সর্বদাই একটা শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। প্রশ্নটা শুধু এইটুকু যে, শ্রেণীটি কোন্ শ্রেণী ?

কিন্তু লেখকের শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা এমন সব মূল্য সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক যা তাঁর শ্রেণী সীমানার বাইরেও স্বীকৃতি লাভ করবে।" এখানেই সুকান্ত তাঁর সমসাময়িক কবিদের ছাড়িয়ে এমন শীর্ষে পৌঁচেছেন যেখানে শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গিতেই তাঁর সমগ্র কাব্যদর্শন সঞ্জীবিত—কিন্তু কাব্যমূল্য তাতে ব্যাহত নয়—আর এই কাব্যদর্শন কোথাও অস্থির আবেগে খাপছাড়াভাবে চ্যুতও নয়। বরং তা একটা নিটোল বুনোনের মতো জীবনের সমগ্র প্রান্তর ভরে আছে। সুকান্ত তাই একটা সংযত স্থিরচিত্ত অভিজ্ঞান।

রবীন্দ্রনাথ একদা তাঁর জীবন সায়াহ্নে যে পথচলার নতুন বাঁক উপলব্ধি করেছিলেন—যে পথের বিরাট ব্যাপ্তি সুকঠিন শপথে নজরুলের মধ্যে সোচ্চারিত—সেই পথপরিক্রমা একটা সঠিক সিদ্ধান্তের মতো এসে আশ্রয়স্থল খুঁজে নিয়েছে সুকান্তে। তাই অবশ্য নিয়মে সুকান্ত হলো জীবন-দর্শনের সিদ্ধান্ত। বাংলা সাহিত্যে গণচেতনার কবিতাধারা এমনি করেই ধীরে ধীরে পুষ্ট হয়েছে। আর এই ধারায় সুকান্ত একটা উজ্জ্বল উপস্থিতি যা বাংলা কবিতার আত্মায় অঙ্গাঙ্গীভাবে অঙ্গীকৃত।